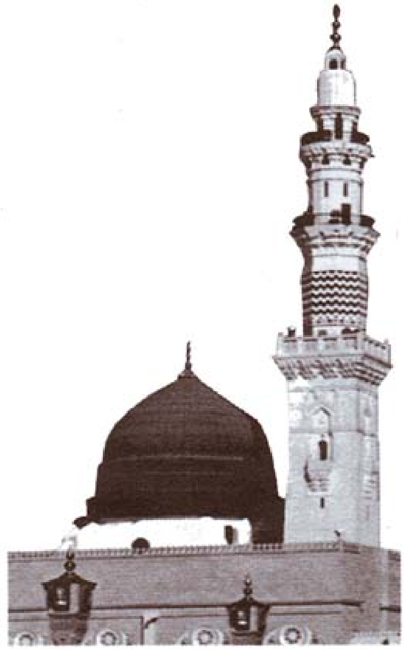
মাদারেজুন্ নবুওয়াত

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে
দেহলভী (রহঃ)



মাদারেজুন্ নবুওয়াত
পঞ্চম খণ্ড

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (র)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মাদারেজুন্ নবুওয়াত
শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র.
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুমিনুল হক

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০৪ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ
জানুয়ারী ২০১০ ইং

প্রচ্ছদ
আব্দুর রোউফ সরকার

মুদ্রকঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,
ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ
১৫০/- টাকা মাত্র

MADAREZUN NABUWAT (Vol. 5): By Shaekh Abdul Haque Muhaddese Dehlabhi (Rh.) translated by Maolana Mominul Haque/ Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigar, Narayangonj, Bangladesh.

Exchange Taka 150.00   US $ 5 only.

ISBN 984-70240-0017-0

نَحمَدُه ونَصَلّى علَى رَسُولِهِ الكريمْ

পৃথিবীবাসী! দাঁড়াও। একটু থামো। ভাবো। ভেবে দ্যাখো। কোথায় দাঁড়িয়ে আছো। কোথা থেকে এসেছো। কোনখানে যেতে চাও। তোমার উদ্দেশ্যবিহীন পদবিক্ষেপ কি কোনো কল্যাণের কথা বলে? কোনো পরিত্রাণের কথা? পরিমার্জনার কথা? পরিশীলনের কথা? পরিশুদ্ধতার কথা?

পাপের এ পারাবার পাড়ি দিতে হবে যে। তুলতে হবে নতুন পাল। নতুন হাওয়ায়। নতুন জোয়ারে। হেলা-ফেলা-অবহেলায় কেটে গেলো কতো মওসুম। মাস। বছর। বছরের পর বছর। প্রবৃত্তির পরিপুষ্টি সাধনে ক্ষয় হয়ে গেলো কতো আবেগ-অনুভব-মেধা-বোধ-বুদ্ধি। ভাবনা-প্রণোদনা-পরিব্রাজনা। কার জন্য? কিসের জন্য?

কতোকাল ধরে পিপাসিত হয়ে আছে আত্মার আলয়। সত্তার সবুজাভিলাষ। সৌন্দর্যাহরণেচ্ছা। এ পিপাসা মেটাতে যে হবেই। পান করতে হবে অবিনাশী শরাব। বিশ্বাসের। ভালোবাসার। পরিশুদ্ধতার। পরিতৃপ্তির। পরিত্রাণের।

পৃথিবীবাসী! এসো আত্মসমর্পণ করি। প্রবৃত্তিকে পরাজিত করে চিরবিজয় ঘোষণা করি— আত্মার। সত্তার। বলি— হে আমাদের পরম প্রেমময় মহাদয়ার্দ্র মহাক্ষমাপরবশ মহাসৃজয়িতা মহাপ্রভুপালক! হে আমাদের আল্লাহ্ ! এবার দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমরা এখন সলজ্জিত ও সানুতপ্ত প্রত্যাবর্তনকারী। আমাদেরকে গ্রহণ করো।

ভূপৃষ্ঠের সকল মানব-মানবী! এসো মুখোমুখি হই। কুশলবিনিময় করি। পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করি— একই জনক-জননীর রক্তস্রোত থেকে কি আমাদের অভ্যুদয় নয়? আমরা কি একই মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতার মহাপরিবারভূত নই? নই কি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর স্বনামধন্য উম্মত? তাহলে অনৈক্যের ও অপ্রেমের অভিঘাতকে এভাবে মান্য করে চলেছি কেনো? এসো— এখনই , এই মুহূর্তে সকলেই একে একে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাই। হয়ে যাই বিলীন এক উচ্ছ্বাসে, এক নিঃশ্বাসে এবং এক বিশ্বাসে। অনুগামী ও অনুরাগী হই কেবল তাঁর— যিনি খ্যাত মহাবিশ্বের মহামমতার মহাসিন্ধু বলে।

তাঁরই পবিত্র নাম— মোহাম্মদ, আহমদ— সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তাঁর অনুগমন ও অনুসরণ ব্যতিরেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় আর নেই। মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত প্রবহমান থাকবে যে কেবল তাঁরই পথপ্রদর্শন। তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনাচরণের কথা প্রচার করা এবং এভাবে কখনো ধীরে, কখনো জোরে একে একে পৃথিবীর সকল পুরুষ ও রমণীকে একই বিশ্বাস, পরিণাম এবং পরিত্রাণের পথে সমবেত করাই এখন একমাত্র কল্যাণকর কর্ম। অবশিষ্ট সকলকিছুই আনুষঙ্গিক। কেবলই প্রয়োজন। উদ্দেশ্য কিছুতেই নয়।

সুতরাং তাঁর জীবনালেখ্যরচয়িতাগণের রচনা আমাদেরকে পাঠ করতেই হবে। নিয়োজিত থাকতে হবে যথাঅনুশীলনে। বলা বাহুল্য, 'মাদারেজুন্ নবুওয়াত' গ্রন্থখানি এক্ষেত্রে আমাদের জন্য, সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য একান্ত ভালোবাসা হয়ে আছে। হয়ে আছে সত্তাসংলগ্ন সমুজ্জ্বল প্রদীপ। এই মহান গ্রন্থনার পঞ্চম খণ্ডের জ্যোতিসম্প্লাতের নিচে এবার দাঁড়াতে পারলাম আমরা। পেলাম নতুনতরো শক্তি-সামর্থ্য ও উদ্যাম। নব অভিজ্ঞান।

গন্তব্য এখনও দূর। পথ ছায়াহীন। এর মধ্যেই সচল, সবল ও সফল রাখতে হবে আমাদের পদযাত্রা, পথযাত্রা। এক্ষণে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই কেবল আমাদের মহামহিম, আনুরূপ্যবিহীন এক আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার প্রতি। কামনা করি অধিকতর উদ্যম ও সামর্থ্য। প্রার্থনা করি— হে আমাদের মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্! এ মহান পুস্তকের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকা এবং সকল শুভানুধ্যায়ীকে অনুগ্রহ করে তুমি ক্ষমা করে দাও। দাও পৃথিবী ও মহাপৃথিবীর অনিঃশেষ কল্যাণ। আমিন।

কাদিয়ানি এবং মওদুদী ফেৎনা এখনো সক্রিয়। এদের অপবিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকতে হবে দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে। এবারও আমরা এদের সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দিতে চাই। বস্তুতঃ এটা আমাদের ইমানী দায়িত্বও বটে।

ওয়াস্সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মন-বনভূমি জাগে মাঝরাতে রোদনের মতো
প্রাণভরে পান করি সুগভীর তোমার জিকির
যদিও পিপাসা বাড়ে জ্বলে ওঠে নিয়মিত ক্ষত
বেদনার বাঁকে, বুকে বিদ্ধ হয় আতরের তীর।

গোপনে গোপনে বলি তোমার সকাশে সেই কথা
আমাদের পৃথিবীতে প্রবৃত্তিরই পীড়িত প্রতাপ
নিরাময় চিনি নাই, সেকারণে সত্তাসংলগ্নতা
মনে হয় মরে গ্যাছে, এ ক্যামন নিরুপায় পাপ?
নিশুতি রাতের গন্ধে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ
যদিও হাজির নাই, তবু দ্যাখো মানুষের ভিড়
আমার স্মৃতিতে তোলে ঝড়ভরা ত্রাণলোভী ঢেউ
আমরা বাঁচিতে চাই, ক্ষমা চাই, ফিরে চাই নীড়—

তোমার আপনতম নবীর গোপনতম ব্যথা
বেদনার চেতনার অগ্নি হয়ে ক'য়ে ওঠে কথা।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্‌সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী-১ম খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া ◆মাআ'রিফে লাদুন্নিয়া
মাব্‌দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্‌বন্দ ◆চেরাগে চিশ্‌তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সুর্যের হাতছানি ◆নুরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহা প্লাবনের কাহিনী
◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্ত প্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী

পঞ্চম বৎসরের ঘটনাসমূহ

দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলী

কেবলা পরিবর্তন

হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে কেবলা পরিবর্তন হয়। রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মদীনা মুনাওয়ারায় পদার্পণ করার পর প্রায় ষোল বা সতেরো মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়া হতো। সেদিকে ফিরে নামাজ পড়ার জন্য তিনি আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। এর মধ্যে ইহুদীদের মনজয় করার বিষয়টিও জড়িত ছিলো। এতদ্সত্ত্বেও তিনি স. আকাংখা করতেন, যেনো কেবলা হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে হারামের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে তিনি ওহী নাযিল হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। একসময় তাঁর অপেক্ষা সফল হলো এই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে—'ক্বাদ নারা তাক্বাল্লুবা ওয়াজ্বহিকা ফিস্সামাই ফালানুওয়াল্লিইয়ান্নাকা ক্বিবলাতান তারদ্বাহা ফাওয়াল্লি ওয়াজ্বহাকা শাত্বরাল মাস্জ্বিদিল হারাম' (আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন ক্বিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি, যাহা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও) (২ঃ১৪৪)। এভাবেই একদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের কেবলার বিধান রহিত হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. যখন মক্কা মুকাররমায় ছিলেন, তখন কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ছিলো, না কাবাগৃহের দিকে ছিলো, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের ধারণা তখনও বায়তুল মুকাদ্দাসই কেবলা ছিলো। তবে তিনি স. তখন নামাজে এমনভাবে দাঁড়াতেন যেনো কাবাগৃহ মাঝখানে পড়ে এবং কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসই থাকে। মদীনা গমনের পূর্ব পর্যন্ত এরকম অবস্থাই ছিলো। পরে মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরানোর হুকুম দেওয়া হয়। অপর এক জামাতের ধারণা এরকম— তাঁর মক্কা মুকাররমায় থাকা অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাস কেবলা ছিলো এবং সেদিকে মুখ করে তিনি স. তিন বৎসর নামাজ পড়েছিলেন। মদীনা শরীফে পদার্পণের সতেরো মাস পর কাবাগৃহের দিকে কেবলা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। এক বর্ণনায় এসেছে— রসুলেপাক স. একবার এক মহিলা সাহাবীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। জোহরের নামাজের সময় হলো। যে সকল সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে তিনি স. নামাজ শুরু করলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে— সেখানে ছিলো বনী সালামার

একটি মসজিদ। তখন তিনি সেখানেই নামাজ পড়ছিলেন। তিনি স. দ্বিতীয় রাকাতের রুকুতে যখন গেলেন, তখনই কেবলা পরিবর্তনের ওহী নাযিল হলো। সঙ্গে সঙ্গে কাবাগৃহের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। মুক্তাদিগণও তাঁর অনুসরণ করলেন। এভাবেই নামাজ সমাপ্ত করলেন। কোনো কোনো গ্রন্থে একরম বিবরণও পাওয়া যায় যে, কেবলা পরিবর্তনের হুকুম এসেছিলো নামাজবহির্ভূত সময়ে। এ বিষয়ে একটি অভিমত এরকম— ওই নামাজ জোহরের নামাজই ছিলো। কিন্তু নামাজের স্থান ছিলো মসজিদে নববী। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সর্বপ্রথম যে নামাজ রসুল স. কাবাগৃহের দিকে ফিরে আদায় করেছিলেন, তা ছিলো আসরের নামাজ। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, পরিপূর্ণভাবে যে নামাজ কাবাগৃহের দিকে ফিরে তিনি পাঠ করেছিলেন, তা ছিলো আসরের নামাজ। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এরকম মন্তব্য করা হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারার আধা মাইল পূর্বে আকীক উপত্যকা এবং বীরে রুমার নিকটবর্তী স্থানের ওই মসজিদ এখনও রয়েছে, যার নাম মসজিদে কেবলাতাইন। আর জীবনালেখ্যরচয়িতাগণ বলেছেন, ওখানেই নাজিল হয়েছিলো কেবলা পরিবর্তনের হুকুম। কথিত মহিলা সাহাবীর গৃহ সম্ভবত সেখানেই ছিলো। বায়তুল মুকাদ্দাস এবং কাবাশরীফ পরস্পর বিপরীত দিকে। তাই সেখানে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করলে কাবা শরীফ পশ্চাতে থাকে, আর কাবা শরীফের দিকে মুখ করলে বায়তুল মুকাদ্দাস থাকে পিছনে।

কেবলা পরিবর্তনের হুকুম যখন হলো, তখন কিছুসংখ্যক ইহুদী এবং মুনাফিকের মনে সৃষ্টি হয় ঘোর সন্দেহ। তখনই নাযিল হয় 'লিল্লাহিল মাশরিক্বু ওয়াল মাগরিবু ইয়াহ্দী মাঁই ইয়াশাউ ইলা সিরাত্বিম মুস্তাক্বীম' (পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহেরই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন) (২ঃ১৪২)। কথাটির অর্থ— ওই নির্দেশ আল্লাহ্তায়ালারই। তিনি যে দিককে ইচ্ছা, সে দিককেই নির্ধারণ করতে পারেন। কেবলা পরিবর্তনের পর কিছুসংখ্যক লোক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, বারা ইবনে মা'রুর এবং আসয়াদ ইবনে যুরারাহ প্রমুখ সাহাবী তো ইতোপূর্বেই পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের নামাজের অবস্থা কী হবে? তাঁদের সকল নামাজ তো ছিলো বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী। তখন নাযিল হলো— 'ওয়ামা কানাল্লাহু লিইউদীআ' ঈমানাকুম' (আল্লাহ্ এইরূপ নহেন যে, তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন) (২ঃ১৪৩)। এ আয়াতে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা নামাজ বুঝানো হয়েছে। কেননা নামাজ হচ্ছে ইমানের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী আমল। কেবলা পরিবর্তনের সময় মসজিদে নববী দ্বিতীয়বার নির্মাণ করা হচ্ছিলো। মসজিদে কুবাও সংস্কার করা হয়েছিলো। তখন রসুলেপাক স. সাহাবায়েকেরামকে সঙ্গে নিয়ে পাথর বহন করার কাজও করেছিলেন।

ফাতেমাতুজ্‌জোহরা রা. এর বিবাহ

দ্বিতীয় হিজরীতে হজরত ফাতেমা রা. এর বিবাহ হয়েছিলো হজরত আলী রা. এর সঙ্গে। সাইয়্যেদা ফাতেমার জন্ম হয়েছিলো বিশুদ্ধ মত অনুসারে নবুওয়াত যাহির হওয়ার পাঁচ বৎসর পূর্বে। কুরায়েশরা তখন কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ করছিলো। শুভবিবাহ সম্পন্ন হয় দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসে। কেউ কেউ বলেন, তাঁদের বিয়ে হয়েছিলো সফর মাসে। আবার কেউ কেউ এমনও বলেন যে, উহুদ যুদ্ধের পর তাঁদের বিয়ে হয়েছিলো। 'জামেউল উসুল' কিতাবে এরকমই বলা হয়েছে। বিয়ের সময় হজরত ফাতেমার বয়স ছিলো ষোল বৎসর। আবার কারও কারও মতে আঠারো বৎসর। আর হজরত আলী তখন ছিলেন একুশ বৎসর পাঁচ মাসের যুবক। বিভিন্ন বিবরণে এসেছে, হজরত ফাতেমাকে প্রথমে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.। রসলেপাক স. তখন বলেছিলেন, এ ব্যাপারে আমি ওহীর অপেক্ষায় আছি। এরপর হজরত ওমর এরকম প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকেও একই জবাব দিয়েছিলেন। মেশকাত শরীফে এসেছে, যখন হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর তাঁকে বিয়ে করার কথা বললেন তখন রসুল স. বললেন, ফাতেমার বয়স তো এখনও কম। এরপর উম্মে আয়মান হজরত আলীকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে বলা হয়েছে, সাহাবীগণ হজরত আলীকে বললেন, আপনি রসুল স. এর পরিবারভুক্ত এবং তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন। আপনিই বিবাহের প্রস্তাব পেশ করুন। হজরত আলী বললেন, এ বিষয়ে কিছু বলতে আমি সংকোচ বোধ করি। তিনি এমনও বললেন, আবু বকর ও ওমরের প্রস্তাব যখন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তখন আমার প্রস্তাবে তিনি সাড়া দিবেন কেনো? সাহাবীগণ বললেন, আপনি রসুল স. এর নৈকট্যভাজন এবং তাঁর পিতৃব্যপুত্র— আবদুল মুত্তালিবের অধঃস্তন পুরুষ। সুতরাং সংকোচ করবেন না। হজরত আলী আর কথা বাড়ালেন না। একদিন তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে সালাম দিলেন। রসুল স. সালামের জবাব দিয়ে বললেন, হে আবু তালিব তনয়! কিছু বলবে কি? তিনি বললেন, আমি ফাতেমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তিনি স. বললেন, 'মারহাবান ওয়া আহ্‌লান।' এর অধিক আর কিছু বললেন না। হজরত আনাস বর্ণনা করেন, সে সময় আমি রসুলুল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তাঁর পবিত্র চেহারায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা। সে অবস্থা ক্রমান্বয়ে প্রকটতর হতে শুরু করলো। নিমগ্ন নবী যখন স্বাভাবিকতায় ফিরে এলেন, তখন বললেন, আনাস! আরশাধিপতির পক্ষ থেকে জিবরাইল আমার নিকট এসে বলে গেলেন, ফাতেমার বিয়ে আলীর সঙ্গে দাও। তুমি যাও। আবু বকর,

ওমর, ওছমান, তালহা, যুবায়ের এবং আনসারদের ডেকে আনো। তাঁর নির্দেশ শুনে যখন সকলে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি স. মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করলেন। বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহব্যাঞ্জক বক্তৃতা দিলেন। তারপর সম্পন্ন করলেন হজরত আলী এবং ফাতেমার শুভবিবাহ। চার শ' মেছকাল রৌপ্যের মহর নির্ধারণ করলেন এবং বললেন, হে আলী! তুমি কি কবুল করেছো এবং রাজী হয়েছো? হজরত আলী বললেন, আমি কবুল করলাম এবং রাজী হলাম। তারপর রসুলেপাক স. একপাত্র খেজুর নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। এজন্যই ফকীহগণের একদল বলেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে চিনি, বাদাম ইত্যাদি ছড়িয়ে দেওয়া মোস্তাহাব। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় উক্ত বিয়ের ভাষণখানি সংকলিত হয়েছে এভাবে—

আলহামদু লিল্লাহিল্ মাহ্মুদু বিনি'মাতিহিল্ মা'বুদু বিক্বুদরাতিহিল মুত্বাউ' বিসুলত্বানিহিল মারহুবি মিন আ'যাবিহী ওয়া সাত্বওয়াতিহিন নাফিযু আমরাহূ ফী সামাইহী ওয়া আরদিহিল লাজী খালাক্বাল খালক্বা বিক্বুদরাতিহী ওয়া মাই্ইয়াযাহুম বিআহ্কামিহী ওয়া আআ'য্যাহুম বিদ্বীনিহী ওয়া আকরামাহুম বিনাবিয়্যিহী মুহাম্মাদান সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামা ইন্নাল্লাহা তাবারাকাস্মুহূ ওয়া তাআ'লা আ'যমাতান জাআ'লাল মুসাহারাহাতা সাবাআল লাহিক্বান ওয়া আমরাম মুফতারদ্বান ওয়া শুব্বাহা বিহিল আরহামা ওয়া আকরামাল আনামা ফাক্বালা আ'য্যা মান ক্বালা ওয়া হুয়াল লাজী খালাক্বা মিনাল মাই বাশারান ফাজ্বাআ'লাহূ নাসাবাঁও ওয়া সিহরাঁও ওয়া কানা রব্বুকা ক্বাদীরান ফাআমারাল্লাহু তাআ'লা ইয়াজ্বরী ইলা ক্বাদায়িহি ওয়া ক্বাদ্বাউন ইয়াজ্বরী ইলা ক্বুদরাতিন ওয়ালিকুল্লি ক্বাদ্বাইন ক্বাদরুওঁ ওয়ালিকুল্লি ক্বাদরিন আজ্বালুঁও ওয়ালিকুল্লি আজ্বালিন কিতাবুহঁ ওয়াম্হুল্লাহা মা ইয়াশাউ ওয়া ইউছ্বিত্ ইনদাহু উম্মুল কিতাবি ছুম্মা ইন্নাল্লাহা আমারালী আন উ-যাওবিজা ফাতিমাতিহী মিন আ'লি ইবনি আবী ত্বালিব।

আল্লামা জুরযী তাঁর 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. হজরত আলী এবং হজরত ফাতেমার বিয়ে পড়াবার পর স্বগৃহে প্রবেশ করলেন। হজরত ফাতেমাকে পানি আনতে বললেন। হজরত ফাতেমা কাঠের পেয়ালাতে পানি নিয়ে এলেন। রসুলেপাক স. ওই পানিতে মিশিয়ে দিলেন তাঁর পবিত্র মুখের লালা। হজরত ফাতেমাকে বললেন, কাছে এসো। তিনি কাছে এলে ওই পানি তিনি স. ছিটিয়ে দিলেন তাঁর পবিত্র বক্ষের মাঝখানে। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি আমার এ কন্যাকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তানের প্রভাব থেকে তোমার আশ্রয়ে দিয়ে দিলাম। তারপর বললেন, পুত্রী! আমার দিকে পিঠ ফেরাও। তিনি পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। রসুলেপাক স. তখন পানি ছিটিয়ে দিলেন তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি একে

এবং এর সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম। তারপর বললেন, আরও কিছু পানি আনো। হজরত আলী রা. বললেন, একথা শুনে আমি বুঝে ফেললাম, এবার তিনি স. কী করবেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং পানি নিয়ে এলাম। তিনি স. ওই পানিতেও তাঁর পবিত্র মুখের লালা মেশালেন। তারপর বললেন, সামনে এসো। আমি তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথায় ও মুখে পানি ছিটিয়ে দিলেন। দোয়া করলেন— 'আল্লাহুম্মা ইন্‌নি আউজুবিকা ওয়া যুররিয়্যাতিহি মিনাশ্ শাইত্বানির রজীম'। তারপর বললেন 'বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিহী'। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বিয়ের দিন রসুলেপাক স. এশার নামাজের পর হজরত ফাতেমাকে নিয়ে হজরত আলীর গৃহে গেলেন। তারপর এক পেয়ালা পানি চেয়ে নিয়ে তাতে মিশিয়ে দিলেন তাঁর পবিত্র মুখের লালা। পাঠ করলেন সূরা নাস, সূরা ফালাক এবং আরও কিছু দোয়া। হজরত আলীকে বললেন, পান করো। তারপর রসুল স. অজু করলেন। হজরত ফাতেমাকে বললেন, তুমি এই পানি পান করো। এরপর তিনি স. পুনরায় অজু করলেন। তারপর বললেন, হে আমার আল্লাহ্! এ দু'টি প্রাণ আমার এবং আমিও তাদের। হে আমার রব! যেভাবে তুমি আমাকে পবিত্র করেছো, সেভাবে তুমি এদেরকেও পবিত্র করো। অতঃপর তিনি দু'জনকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের শয়নকক্ষে যাও। তিনি আরও দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! দু'জনের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। এদের সন্তানদের মধ্যে বরকত দান করো। এদেরকে অস্থিরতামুক্ত করো। এদের বংশধরদেরকে পুণ্যবান করো। এদের উপর বরকত বর্ষণ করো। এদের বংশধারা থেকে অধিকসংখ্যক পবিত্র সন্তান সৃষ্টি কোরো। খতীব বাগদাদী হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করছেন, রসুলুল্লাহ্ স. যখন হজরত ফাতেমাকে হজরত আলীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার কলিজার টুকরা! কাঁদছো কেনো? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি আমাকে এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন, যে বিত্তহীন। তিনি স. বললেন, ফাতেমা! তুমি কি একথা জেনে তুষ্ট হবে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সারা পৃথিবীতে দু'জনকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন? তাদের মধ্যে একজন তোমার পিতা, আর অপর জন তোমার স্বামী। হাকেম হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি স. তখন হজরত ফাতেমাকে বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমি এমন একজনের সাথে তোমাকে পরিণয়াবদ্ধ করেছি, যে সর্বপ্রথম ইসলামগ্রহণকারীদের অন্যতম। আর মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। আর তুমি আমার উম্মতের নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, যেমন শ্রেষ্ঠা ছিলেন মরিয়ম তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে। তিবরানীর বিবরণে এসেছে— রসুল স. তখন বলেছিলেন,

আমি এমন একজনের সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি, যে পৃথিবীতে সৌভাগ্যশালী এবং পরবর্তী পৃথিবীতে পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. হজরত আলী রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? আলী রা. বললেন, আমার একটি ঘোড়া ও একটি বর্ম আছে। তিনি বললেন, ঘোড়াটি তোমার প্রয়োজন। সুতরাং বর্মটি বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমার নিকট নিয়ে এসো। তিনি বর্মটি চারশ' আশি দিরহামে বিক্রি করে দিলেন এবং ওই অর্থ রসুলেপাক স. এর হাতে দিলেন। রসুলেপাক স. তা থেকে কয়েকটি মুদ্রা হজরত বেলালের হাতে দিয়ে আতর ও খুশবু কিনে আনতে বললেন। অবশিষ্ট মুদ্রাগুলো উম্মে সুলায়েমকে দিয়ে তাঁকে কিনে আনতে বললেন বিবাহের সাজসজ্জা, সংসারের কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী। উম্মে সুলায়েম কিনে আনলেন দু'টি চাদর, কাতানের দু'টি নেহালী, চার বিঘত কাপড়, পরিধেয় বস্ত্র, রৌপ্যের দু'টি বায়ুবন্দ, গদী, বালিশ, একটি পেয়ালা, একটি চৌকি, একটি মশক এবং কিছু পানপাত্র। সেগুলোকে রেখে দিলেন স্তরে স্তরে সাজিয়ে। বর্ণিত আছে, রসুল স. তাঁদের সংসারের কাজকর্মের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছিলেন এভাবে— রুটি বানানো, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, যাঁতা পেষা ও গৃহকর্ম সম্পাদন করবেন ফাতেমা। আর বাইরের কাজ, যেমন উটের খাবার পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ করবেন আলী। অথবা ওই কাজগুলো করবেন তাঁর মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদ।

বর্ণিত আছে, হজরত ফাতেমা আগুনের কাছে বসে রুটি সেঁকতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন এবং যাঁতা পিষতেন, যার কারণে তাঁর দেহ বিবর্ণ হয়ে যেতো, হাতে ফোস্‌কা পড়ে যেতো এবং পরিধেয় বস্ত্র হয়ে যেতো মলিন। একবার হজরত ফাতেমা রা. একজন পরিচারিকা পাবার আশায় রসুল স. এর দ্বারস্থ হলেন। তিনি স. বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা বলব না, যা পরিচারিকাপ্রাপ্তি অপেক্ষা উত্তম? তুমি প্রতিদিন শয়ন করার পূর্বে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ কোরো। হজরত আলী রা. বলেন, আমি উক্ত আমল সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের রাত ছাড়া জীবনে আর কখনও বাদ দেইনি।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে রয়েছে, জীবনালেখ্যরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী হজরত ফাতেমাকে বিবাহ করার সময় ওলীমার অনুষ্ঠান করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে ওলীমা করার মতো কোনো কিছু ছিলো না। তিনি তাঁর যুদ্ধবর্ম এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখে ওলীমার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে ওলীমাতে কয়েক সা খেজুর ও হিস (খিচুড়ি জাতীয়) খাবারের ব্যবস্থা ছিলো। ইমাম আহমদ এরকম বলেছেন।

জাকাত, রমজানের রোজা, ঈদুল ফিতরের নামাজ ও সদকায়ে ফিতির।

দ্বিতীয় হিজরীতে রমজানের রোজা ফরজ হয়েছিলো। ঈদুল ফিতরের নামাজ এবং ফিতরা আদায় করার বিধানও চালু হয়েছিলো ওই বৎসরে। এ সব হয়েছিলো হিজরতের আঠারো মাস অতিবাহিত হওয়ার পর। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এরও আগে একই বৎসরে ফরজ করা হয়েছিলো জাকাত। তবে কেউ কেউ বলেন, জাকাত ফরজ হয়েছিলো হিজরতের আগে।

জিহাদের বিধান

দ্বিতীয় হিজরীর অন্যতম ঘটনা হচ্ছে জিহাদের নির্দেশ লাভ। নির্দেশ এসেছিলো এভাবে— 'উযিনা লিল্লাজীনা ইউক্বাতালূনা বিআন্নাহুম যুলিমূ ওয়া ইন্নাল্লাহা আ'লা নাসরিহিম লাক্বাদীর' (যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম) (২২ঃ৩৯)। এছাড়াও জিহাদের নির্দেশসম্বলিত আরো অনেক আয়াত রয়েছে। ইতোপূর্বে রসুলেপাক স.কে যুদ্ধ করতে বারণ করা হয়েছিলো। তখন সাহাবীগণ বিভিন্ন স্থানে পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হলে রসুলেপাক স. বলতেন, আমাকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। জিহাদের অনুমতি তিনি পেলেন হিজরতের পর। জিহাদ বিলম্বিত হওয়ার কারণ ছিলো এই যে, তখন মক্কা মুকাররমায় পৌত্তলিকেরাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। আবার তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সহায়হীন ও দুর্বল। আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার হেকমত ছিলো এই যে, হিজরতের পরে যখন মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ঘটবে এবং তাঁদের অবস্থা হবে স্থিতিশীল, তখনই নির্দেশ দেওয়া হবে জিহাদের। তাই হলো। তিনি স. মদীনায় এলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হলো বিশ্বাসী জনতার এক উল্লেখযোগ্য দল। তাঁদের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা হয়ে গেলো নিরুপদ্রব আশ্রয়স্থল। তখনই দেওয়া হলো সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি।

গজওয়া ও সারিয়ার সংজ্ঞা

জীবনীপ্রণেতাগণের নিকট এই পরিভাষাটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে, যে সৈন্যবাহিনীতে রসুলেপাক স. স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাকে বলা হবে গজওয়া। আর যে সৈন্যবাহিনীতে তিনি স. সশরীরে অংশগ্রহণ করেননি; সেনাবাহিনীকে করে দিয়েছিলেন অন্য সেনাপতির অধীন, তার নাম হবে সারিয়া।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'র গ্রন্থিক বলেছেন, সারিয়া বলা হয় রাতে অভিযানকারী সেনাদলকে। রসুলেপাক স. এর জীবনীকারগণের মতে সারিয়া বলা

হয় বাহিনীর ওই অংশকে, যারা পায় শত্রুসেনাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, সারিয়া বলা হয় বাহিনীর ওই অংশকে, যা মূল বাহিনী থেকে সাময়িকভাবে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। পরবর্তীতে অবশ্য মূল বাহিনীর সঙ্গেই মিলিত হয় তারা। সারিয়া'র সৈন্য সংখ্যা হয় একশ থেকে পাঁচশ পর্যন্ত। পাঁচশ'র অধিক হলে তাকে বলা হয় মিনসার। আটশ'র অধিক হলে তাকে বলে জায়শ। আর চার হাজারের অধিকসংখ্যক বাহিনীর নাম জাহাল। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত সুবিশাল বাহিনীর প্রতিটি অংশকে বলা হয় খামীস। ওগুলোর নাম এরকম— ১. মুকাদ্দামা (অগ্রগামী দল) ২. কলব (মূল দল) ৩. মায়মানা (ডান দিকের দল) ৪. মায়সারা (বাম দিকের দল) এবং ৫. সাকা (পশ্চাৎবর্তী দল)। আর কাতীবা বলা হয় ওই দলকে, যা থাকে সুসংঘবদ্ধ। রসুলে আকরম স. সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন সাতাশটি গজওয়ায়। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবের বর্ণনানুযায়ী সেগুলোর সংখ্যা ছিলো একুশ। আবার আরেক মত অনুসারে চব্বিশ। বর্ণনাবিভিন্নতার সমাধান দিতেও চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। তবে সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে ওই মত, যা সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে হজরত যায়েদ ইবনে আববাস কর্তৃক। তিনি বলেছেন, গজওয়ার সংখ্যা ছিলো ঊনিশটি। তার মধ্যে ন'টি ছিলো এমন, যেগুলোতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। যেমন— ১. বদর ২. উহুদ ৩. আহযাব ৪. বনী কুরায়জা ৫. বনী মুস্তালেক ৬. খায়বর ৭. মক্কাবিজয় ৮. হুনাইন এবং ৯. তায়েফ। সারিয়ার সংখ্যা ছিলো সাতচল্লিশ। কারও কারও মতে ছাপ্পান্ন। সহীহ্ বোখারী শরীফে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. সর্বপ্রথম যে গজওয়া সম্পন্ন করেছিলেন, তার নাম আবওয়া। তারপর বাওয়াত। বাওয়াতের পরে উশায়রা। উশায়রা জুহফার নিকটবর্তী একটি স্থান। আবওয়ার নাম মূলে ছিলো আওবা, যার অর্থ বালা-মসিবত। পরে নামটি পরিবর্তিত হয়ে আবওয়া হয়। আবওয়াকে আবার ওয়াদ্দানও বলা হতো। সে হিসেবে কোনো কোনো পুস্তকে নাম এসেছে গজওয়ায়ে ওয়াদ্দান। 'মাওয়াহেব' প্রণেতা বলেছেন, আবওয়া এবং ওয়াদ্দান পাশাপাশি দু'টি স্থানের নাম। এ দু'টি স্থানের ব্যবধান তিন মাইল মাত্র। 'বাওয়াত' জুহায়না গোত্রের পাহাড়সমূহের মধ্যে একটি পাহাড়ের নাম। বোখারী শরীফে 'উশায়রা'র নাম 'শীন' বর্ণ সহযোগে এসেছে। তবে উসরা নামক যে যুদ্ধ হয়েছিলো তার অর্থ— চরম দুরাবস্থা। গজওয়ায়ে উসরা তবুকের যুদ্ধকে বলা হতো। এ যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন। এক কঠিন সময় তাঁদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিলো তখন। তাই তবুকের যুদ্ধকে গজওয়ায়ে উসরা বলা হতো। এটি ছিলো সর্বশেষ গজওয়া। সামনে পর্যায়ক্রমে উক্ত তিনটি গজওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। তবে মাঝে মধ্যে যে সব সারিয়া সংঘটিত হয়েছিলো সেগুলোর আলোচনাও যথাস্থানে উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহুতায়ালা।

গজওয়ায়ে আবওয়া

এই গজওয়া সর্বপ্রথমে সংঘটিত হয়। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে এসেছে, এই যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজরীর প্রথম দিকে অথবা প্রথম হিজরীর শেষের দিকে সংঘটিত হয়েছিলো। রসুলে আকরম স. হজরত সাআদ ইবনে উবাদাকে মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে নিজে সাহাবীগণকে নিয়ে কুরায়েশদের জনপদ বনী যুমায়রার কাফেলা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মদীনার বাইরে গিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে পতাকাবাহী ছিলেন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা.। রসুলেপাক স. যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন বনী যুমায়রা জনপদের সরদার মুহতাশী ইবনে ওমর যুমায়রী সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। তিনি স. সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর পনের দিন পর তার বাহিনী মক্কায় ফিরে যায়। তারপর উক্ত আবওয়া নামক স্থানেই রসুলে আকরম স. এর চাচাতো ভাই আবু উবায়েদ ইবনুল হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বয়সে রসুল স. এর দশ বছরের বড় ছিলেন।

দারে আরকামের সারিয়া

রসুলে আকরম স. আবওয়ার গজওয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের পূর্বে উবায়েদ ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ষাটজন মুহাজিরকে দারে আরকামের দিকে প্রেরণ করলেন। মক্কা থেকে কুরায়েশদের একটি দল কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেরিয়েছিলো। তাদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিলো বাহিনীটি। শত্রুপক্ষের নেতৃত্বে ছিলো আবু সুফিয়ান ইবনুল হারব। অপর এক বর্ণনামতে নেতৃত্বে ছিলো ইকরামা ইবনে আবু জাহেল। মুসলমান বাহিনীর জন্য একটি শাদা পতাকা প্রস্তুত করা হয়েছিলো, যা বহন করেছিলেন মাসতাহ ইবনে উছাছা। 'রওযাতুল আহবাব' কিতাবে আছে, ওই পতাকাটি ছিলো মুসলিম বাহিনীর জন্য প্রস্তুতকৃত সর্বপ্রথম পতাকা। এমতো মন্তব্যদৃষ্টে একথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, উবায়েদ ইবনুল হারেছের এই সারিয়াটি সম্পন্ন হয়েছিলো গজওয়ায়ে আবওয়ার পূর্বে। আর 'মাওয়াহেব' পুস্তকের লেখক বলেছেন, ইতোপূর্বে সংঘটিত গজওয়ায়ে আবওয়াতেও পতাকা ছিলো, যা বহন করেছিলেন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। অনেকে 'মাওয়াহেব' গ্রন্থকারের মতটিকেই প্রাধান্য প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

যুদ্ধ শুরু হলো। দু'পক্ষ থেকে শুরু হলো তীর বর্ষণ। মুসলিমবাহিনীর মধ্যে ছিলেন হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস। তিনিও তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন আল্লাহ্র রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী। জীবনীপ্রণেতাগণ

বলেছেন, তখন হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের কাছে আটটি তীর ছিলো। সবকটিই তিনি তখন দুশমনদের লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিলেন। একটি তীরও লক্ষভ্রষ্ট হয়নি। কোনোটি ভেদ করেছে কোনো ব্যক্তির গাত্র, আবার কোনোটি শরীর ভেদ করেছে তাদের কোনো পশুর। এ যুদ্ধে দু'পক্ষের কোনো পক্ষই তরবারী ব্যবহার করেনি। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ভেবেছিলো, মুসলিম সেনা হয়তো তাদের পশ্চাতে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেছে । একথা ভেবে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলো। মুসলমানগণ তাদেরকে ধাওয়া না করে ফিরে এসেছিলেন মদীনায়। এ সময় হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং হজরত উতবা ইবনে গাযওয়ান বাণিজ্যসফরে ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে তাঁরাও মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিলেন।

হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সারিয়া

দারে আরকামের সারিয়াতে যখন হজরত উবায়েদ ইবনে হারেছকে পাঠানো হলো, তখন মদীনা মুনাওয়ারায় রটনা হয়ে গেলো যে, কুরায়েশদের একটি বাণিজ্যবহর বাণিজ্যশেষে মক্কা মুকাররমায় ফিরে যাচ্ছে। রসুলেপাক স. তখন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে আশিজন মুহাজিরের একটি বাহিনী তাদের প্রতিহত করার জন্য পাঠালেন। কেউ কেউ বলেন, ওই বাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছিলো আনসার সাহাবীগণকে নিয়ে। তবে সঠিক কথা এই যে, বদর যুদ্ধের পূর্বে আনসারগণকে কোনো যুদ্ধেই পাঠানো হয়নি। এ যুদ্ধেও একটি শাদা পতাকা তৈরী করা হয়েছিলো। আর সে পতাকা বহন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো হজরত আবু মারছাদ গনভীকে। কোনো কোনো জীবনীলেখক বলেছেন, ইসলামীবাহিনীর জন্য ওই পতাকাই প্রথম বানানো হয়েছিলো। অবশ্য অধিকাংশের মত পূর্বানুরূপ। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য যে পতাকা বানানো হয়েছিলো, তার বাহক ছিলেন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। দু'টি বাহিনীই রওয়ানা দিয়েছিলো কাছাকাছি সময়ের ব্যবধানে। এ বিষয়ে মতপ্রভেদের কারণ এটাই। 'মাওয়াহেব' প্রণেতা বলেন, বিষয়টি জটিল। কেননা জীবনীলেখকগণ বলেছেন, হজরত হামযার বাহিনী রওয়ানা দিয়েছিলো সপ্তদশ মাসে। আর হজরত উবায়েদ ইবনে হারেছের বাহিনী বের হয়েছিলো অষ্টাদশ মাসের প্রথম দিকে। তিনি অবশ্য এর সমাধানকল্পে বলেছেন, সম্ভবতঃ উভয় বাহিনীর জন্যই এক সঙ্গে পতাকা প্রস্তুত করা হয়েছিলো। অতঃপর হজরত উবায়েদ ইবনে হারেছের বাহিনীটি বের হতে বিলম্বিত হয়েছিলো অষ্টাদশ মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত। আল্লাহ্পাকের সিদ্ধান্তও ছিলো তাই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বাহিনী সাগরের তীরের কাছাকাছি পৌঁছে কাফেরবাহিনীর দেখা পায়। তাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় তিনশ'। মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিরিশ। কাফেরদের ওই বাহিনীতে আবু জাহেলও ছিলো। দু'পক্ষই যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করলো। কিন্তু মুজাদ্দী ইবনে ওমর ওয়াজহী নামক এক ব্যক্তি, দু'পক্ষের সঙ্গেই যার মিত্রতা ছিলো, সে উভয় পক্ষকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখলো। অবশেষে মালউন আবু জাহেল ও তার বাহিনী মক্কায় চলে যায়। আর হজরত হামযা তাঁর সাথী-সঙ্গীদেরকে নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের সারিয়া

হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে এই সারিয়া খাররার নামক স্থানের দিকে যাত্রা করে। খাররার জুহফার কাছাকাছি একটি পাথুরে উপত্যকা। এ বাহিনীতে বিশজন মুহাজির ছিলেন। তাঁরা ঊনিশতম মাসের প্রথমদিকে কাফেরদের একটি বাহিনীকে উৎখাত করার জন্য বেরিয়েছিলেন। এ বাহিনীর জন্যও শাদা পতাকা প্রস্তুত করা হয়েছিলো। সে পতাকা বহনকারী ছিলেন হজরত মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ। ইসলামীবাহিনী যখন উক্ত স্থানে পৌঁছে, তার একদিন আগেই কাফেরদের কাফেলা সে স্থান অতিক্রম করে চলে যায়। সুতরাং মুসলিমবাহিনীকে যুদ্ধ না করেই মদীনায় ফিরে আসতে হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখিত 'লেওয়া' বা 'আলাম' শব্দদ্বয়ের অর্থ ঝাণ্ডা বা পতাকা, যা যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী ব্যবহার করতেন। পতাকা বহনকারীর মাধ্যমে উক্ত যুদ্ধের সেনাপতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যেতো। বেশীর ভাগ সময় পতাকা বহন করতেন অগ্রবর্তী বাহিনী। অভিধানবিদদের এক দল বলেছেন, লেওয়া এবং রায়াত সমার্থবোধক শব্দ। কিন্তু মসনদে ইমাম আহমদ ও তিরমিজীতে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর রায়াত ছিলো কালো বর্ণের এবং তাঁর লেওয়া ছিলো শাদা বর্ণের। তিবরানীও হজরত জুবায়দা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদী হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, উক্ত পতাকায় কলেমা শরীফ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' লেখা থাকতো। বাহ্যতঃ বিবরণগুলো বিপরীতার্থক। ইসহাক এবং আবুল আসওয়াদও হজরত ওরওয়া থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা ব্যবহৃত হয়েছিলো খায়বরের যুদ্ধে। ইতিপূর্বে কেউ এ সম্বন্ধে জানতো না। এরকম মন্তব্য করেছেন 'মাওয়াহেব' রচয়িতা। তবে তিনি এ সকল বিবরণাদির পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেননি। তবে কোনো কোনো পুস্তকে পাওয়া যায়, লেওয়া বলা হয় ছোটো পতাকাকে, আর রায়াত বলা হয় বড় পতাকাকে।

গজওয়ায়ে বুওয়াত

দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এবং হিজরতের তেরোতম মাসের প্রথম দিকে বুওয়াতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রসুলেপাক স. শাদা পতাকা দান করেন হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে। আর মদীনা মুনাওয়ারার দায়িত্ব প্রদান করেন হজরত সাআদ ইবনে মুআযকে। কেউ কেউ বলেন, তাঁকে দিয়েছিলেন পতাকা। সেনাপতি একশ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে কুরায়েশদের ওই কাফেলাকে খতম করার জন্য বের হলেন, যার মধ্যে ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফ। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে আছে, সেই কাফেলায় কুরায়েশদের একশ লোক এবং আড়াই হাজার উট ছিলো। মুসলিমবাহিনী সেই কুরায়েশ কাফেলার দেখা পায়নি। বুওয়াত পৌঁছে কাউকে না পেয়ে তাঁরা আবার মদীনায় ফিরে আসেন।

গজওয়ায়ে উশায়রা

বুওয়াতের গজওয়ার পর গজওয়ায়ে উশায়রা সংঘটিত হয়। রসুলেপাক স. জমাদিউল উলা, অপর বর্ণনানুসারে জমাদিউল উখরা মাসে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বাইরে যান। ঘটনাটি ঘটেছিলো হিজরতের ষোলতম মাসের শুরুর দিকে। তিনি দেড়শ অথবা মতান্তরে দু'শ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। শাদা পতাকা ঠিক করে হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে পতাকাবাহী বানালেন। আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদকে মদীনার কর্মকর্তা নিযুক্ত করে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হলেন। উদ্দেশ্য ওই বাণিজ্যবহরকে আক্রমণ করা, যার মধ্যে আবু সুফিয়ান ছিলো। উশায়রা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি কয়েক দিন পর্যন্ত সেখানে তাঁর বাহিনীসহ অবস্থান করলেন। যখন জানতে পারলেন, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যবহর পূর্বেই ওই স্থান অতিক্রম করে চলে গিয়েছে, তখন তিনি স. বনী মুদলেজ ও কেনানা গোত্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। 'রওজাতুল আহবাবে' উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে সন্ধিপত্র সম্পাদন করার পর তিনি স. মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন।

'আবু তুরাব' উপাধি প্রদানের কারণ

'রওজাতুল আহবাব' এবং 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থদ্বয়ে রয়েছে, এ সফরেই রসুলেপাক স. হজরত আলীকে 'আবু তুরাব' উপাধি প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, উশায়রার গজওয়ায় আমি এবং আলী এক খেজুর গাছের শিকড়ের কাছে শয়ন করেছিলাম। স্থানটি ছিলো

বালুকাময়, যার কারণে আমাদের শরীরে মাটি লেগে গিয়েছিলো। রসুলেপাক স. আমাদের শিয়রের কাছে এসে আমাদেরকে জাগ্রত করলেন। আলীকে বললেন, আবু তুরাব! তারপর বললেন, আলী! আমি কি তোমাকে ওই সংবাদটি দিবো না যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য কে? আলী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অবশ্যই সে সংবাদ আমাদেরকে জানান। রসুল স. বললেন, মানুষের মধ্যে দু'জন লোক সবচেয়ে হতভাগ্য। একজন ওই ব্যক্তি, যে নবী সালেহের উটনীর পা কর্তন করেছিলো। আর দ্বিতীয় জন হচ্ছে সে, যে তোমার দাড়িকে রক্তে রঞ্জিত করবে। রসুলেপাক স. একথা বলছিলেন, আর তাঁর পবিত্র হস্ত দ্বারা আলীর মাথা ও মুখমণ্ডলের ধূলাবালি ঝেড়ে দিচ্ছিলেন। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ঘটনাটির বিবরণ এসেছে এভাবেই। তবে প্রসিদ্ধ ঘটনা তা-ই, যা হজরত সাহাল ইবনে সাআদ মাআ'দী থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। সেখানে ঘটনাটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে— একবার রসুল স. হজরত ফাতেমা ও হজরত আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁদের গৃহে গেলেন। হজরত আলী তখন ঘরে ছিলেন না। মসজিদে শুয়ে ছিলেন। রসুল স. হজরত ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায়? হজরত ফাতেমা বললেন, আমাদের মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য হয়েছে, তাই রাগ করে তিনি বাইরে চলে গিয়েছেন। দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণের জন্যও আসেননি। তখন রসুলেপাক স. তাঁর এক সহচরকে বললেন, দ্যাখো সে কোথায়? নির্দেশিতজন চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। রসুল স. মসজিদে গেলেন। তাঁর শিয়রের কাছে দাঁড়ালেন। দেখলেন, হজরত আলী কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর পাঁজরে শয়নের দাগ। শরীর ধূলিমলিন। রসুলেপাক স. বললেন, হে আবু তুরাব! ওঠো। সে দিন থেকে তাঁর উপাধি হয়ে গেলো আবু তুরাব। তাঁর আসল উপনাম আবুল হাসান (হাসানের পিতা) এর স্থলে রসুল স. এর রাখা 'আবু তুরাব' (মাটির পিতা) তাঁর নিকট অধিক প্রিয় হয়ে গেলো।

প্রথম বদর বা সাফওয়ানের গজওয়া

এ বৎসরের আরেকটি ঘটনা এরকম— মদীনা শরীফের এক প্রান্তরে কতকগুলি উট ঘাস খাচ্ছিলো। সেগুলির মধ্যে রসুল স. এর উটও ছিলো। কাযার ইবনে জাবের ফাহরী নামক এক ব্যক্তি উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। রসুলেপাক স. যখন একথা জানলেন, তখন একটি নিশান প্রস্তুত করলেন এবং তা অর্পণ করলেন হজরত আলীর হাতে। তারপর হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে সাহাবীগণকে নিয়ে সাফওয়ান নামক উপত্যকায় পৌঁছলেন। এটি ছিলো বদর প্রান্তরের দিকে। তাই এস্থানটিকে মানুষ প্রথম বদর

নামে আখ্যায়িত করে। রসুলেপাক স. যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন জানতে পারলেন যে, কাযার এখান থেকে চলে গেছে। তাকে পাকড়াও করা গেলো না। তিনি স. তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখান থেকেই মদীনায় ফিরে এলেন। যুদ্ধ না হলেও এই অভিযানটিকে গজওয়া হিসাবেই গণ্য করা হয়। কেউ কেউ এ অভিযানকে গজওয়ায়ে বদরে উলা নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। 'রওজাতুল আহবাবে'র পাদটিকায় ঘটনাটিকে বলা হয়েছে তলবে কাযার ইবনে জাবের ফাহরী। আর 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় নাম দেওয়া হয়েছে গজওয়ায়ে বদরে উলা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের সারিয়া

এ বৎসরই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সারিয়া সংঘটিত হয়। রসুলেপাক স. এর ফুফাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতে জাহাশের ভাই হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ। তিনি স. আটজন প্রবীণ সাহাবী, মতান্তরে বারোজন সাহাবীকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা হচ্ছেন— হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত উকাশা ইবনে মুহসেন, হজরত উতবা ইবনে গাযওয়ান, হজরত ওয়াকেদ ইবনে আবদুল্লাহ্ তামিমী প্রমুখ। এ বাহিনীর নামকরণ হয়েছিলো আমীরুল মুমিনীন আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের নামে। জীবনালেখ্যপ্রণেতাগণ বলেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবই সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কথাটির অর্থ— খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে তাঁকেই প্রথম আমীরুল মুমিনীন নামে ডাকা হয়। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. কর্তৃক লিখিত একটি চিঠি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশকে দেওয়া হলো। বলা হলো, দু'দিন পর্যন্ত যেনো এ চিঠি পড়া না হয়। এমতো নির্দেশদানের মধ্যে কী হেকমত যে ছিলো, আল্লাহ্পাকই তা ভালো জানেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ দু'দিন যাত্রা শেষে চিঠিটি খুলে পড়লেন এবং বলাবাহুল্য ওই চিঠিতে যেরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো তা যথাযথভাবে পালন করলেন। চিঠিতে লেখা ছিলো— হে আবদুল্লাহ্! আল্লাহ্তায়ালার নাম ও তাঁর বরকতের সাথে তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে ওই স্থান পর্যন্ত চলে যাও, যার নাম বতনে নাখলা। সেখানে যেয়ে অবস্থান গ্রহণ করো এবং কুরায়েশদের গতিবিধির প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখো। জোর করে কাউকে সঙ্গে না নেওয়াই তোমার জন্য সমীচীন হবে। যার ইচ্ছা সে তোমার সঙ্গে যাবে, আর যার ইচ্ছা সে ফিরে আসতে পারবে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ বতনে নাখলার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর সাথী হলেন হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত উতবা ইবনে গাযওয়ান। দু'জনের জন্য ছিলো একটি উট। তাঁরা পালাক্রমে উটটিতে আরোহণ করতেন। উটটি হঠাৎ হারিয়ে গেলো। তাঁরা তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে

জাহাশের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে উটের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। ফলে পশ্চাতে পড়ে গেলেন তাঁরা। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ যখন বতনে নখলায় পৌঁছলেন এবং তাঁর বাহিনী নিয়ে কুরায়েশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, তখন কুরায়েশবাহিনী পণ্যসামগ্রী ভর্তি উটের কাফেলা নিয়ে তায়েফের দিক থেকে বতনে নখলায় এসে উপস্থিত হলো। তাদের কাছে ছিলো মনাক্কা, শুকনো চামড়া এবং তায়েফের অনেক কিছু। কাফেরদের কাফেলায় ছিলো আমর ইবনে হাযরামী, হাকাম ইবনে কায়সান, ওছমান ইবনে আবদুল্লাহ্ এবং তার ভাই নাওফেল ইবনে আবদুল্লাহ্ মাখযুমী। সেদিন রজবের প্রথম তারিখ ছিলো। কিন্তু মুসলমানদের কাছে মনে হয়েছিলো জমাদিউল উখরার শেষ তারিখ। তারা তাড়াহুড়া করলেন যাতে নিষিদ্ধ মাসের অসম্মান করা না হয়।

মুসলমানগণ কাফেরদের কাফেলার উপর হামলা করে বসলেন। হজরত ওয়াকেদ ইবনে তামিমী আমর ইবনে হাযরামীর দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন। তীর বিদ্ধ হয়েই তার মৃত্যু ঘটলো। তারপর তাঁরা হাকাম ইবনে কায়সান ও ওছমান ইবনে আবদুল্লাহ্কে বন্দী করে ফেললেন। অবশিষ্টরা সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলো। তাদের সকল পণ্যসামগ্রী মুসলমানদের করায়ত্ব হলো। ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিলো মুসলমানদের প্রথম গনিমতের মাল। আর ওছমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইবনে কায়সান ছিলো মুসলমানদের প্রথম বন্দী। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ গনিমতের মাল এবং বন্দীদ্বয়কে নিয়ে রসুলেপাক স. সকাশে উপস্থিত হলেন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে আছে, তিনি উক্ত গনিমতের মাল পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ সাথীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর পঞ্চমাংশ রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য পৃথক করে রাখলেন। কিন্তু তখনও খুমুসের আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।

ওদিকে ইহুদী এবং মুশরিকরা এই মর্মে কুৎসা ছড়াতে লাগলো যে, মোহাম্মদ ও তার সাথীরা হারাম মালকে হালাল বানিয়ে নিয়েছে এবং তারা হারাম মাসে রক্তও প্রবাহিত করেছে। এভাবে অসম্মান করেছে নিষিদ্ধ মাসের। রসুলেপাক স. এর কানে যখন এরকম কথা পৌঁছলো, তখন তিনি গনিমত বন্টন এবং বন্দীদের বিষয়টি স্থগিত করে বললেন, গনিমতের মাল থেকে সবাই হাত গুটিয়ে নাও। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশকে বললেন, আমি কি তোমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেইনি যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা যাবে না। একথা বলে তিনি স. হজরত আবদুল্লাহ ও তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এবং বাহিনীর অন্যান্য সকলেই চিন্তিত ও অনুতপ্ত হলেন। তাঁরা মাস নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে হয়ে পড়লেন সন্ত্রস্ত। তবু আশা করতে লাগলেন যে, আল্লাহপাক হয়তো তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। দয়া করে কবুল করবেন তাঁদের তওবা। তখনই

অবতীর্ণ হলো— 'ইয়াসআলূনাকা আ'নিশ্ শাহরিল হারামি ক্বিতালিন ফীহি ক্কুল ক্বিতালুন ফীহি কাবীর ওয়া সদ্দুন আন সবীলিল্লাহি ওয়া কুফরুম বিহী ওয়াল মাসজিদিল হারামি ওয়া ইখরাজু আহলিহী মিনহু আকবারু ইনদাল্লহি ওয়াল ফিতনাতু আকবারু মিনাল ক্বাতলি' (পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহের পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহের নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়) (২ঃ২১৭)।

এভাবে এখানে এই কথাটিই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, হারাম মাসসমূহে যুদ্ধবিগ্রহ করা শুধু পাপই নয়, বরং বৃহৎ পাপ। কিন্তু হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়! তোমাদের পাপ তো আরো বৃহৎ। মানুষকে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দাও। রুদ্ধ করে রাখো আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য অর্জনের পথ। প্রত্যাখ্যান করো মহাসত্যকে। কুফরী করো মহাপালয়িতা আল্লাহ্‌র সঙ্গে। মানুষকে মসজিদে হারামের কাছে আসতেই দাও না এবং সেখান থেকে বহিষ্কার করে দাও আমার বাণীবাহক ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে। তোমাদের এ সকল পাপ তো সারিয়ার লোকদের পাপ থেকে আরো বেশী জঘন্য। কেননা তারা যা যা করেছে, তা করেছে ভুল করে। আর তোমাদের অপকর্মগুলো ইচ্ছাকৃত এবং অহমিকাসম্ভূত। সুতরাং তোমরা হাযরামী এবং কায়সানের হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় পঞ্চমুখ হচ্ছো কেনো? এরপর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের মনের ভার লাঘব হয়। তাঁর সাথী-সঙ্গীদের মনেও প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। রসুলেপাক স. গনিমত বন্টনের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেন এবং গনিমতের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণও করেন। এক বর্ণনায় এসেছে, ওই গনিমত বদরের যুদ্ধের গনিমতের মালের সঙ্গে মিশিয়ে পরে বন্টন করা হয়। তারা রসুল স. এর কাছে মুক্তিপণসহ লোক পাঠালো। তিনি স. বললেন, ওদেরকে ছাড়া যাবে না, যতক্ষণ না সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং উতবা ইবনে গাযওয়ান নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসে। তাঁরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের হারানো উটের সন্ধানে। কিন্তু পরে যখন তাঁরা দু'জনই মদীনায় ফিরে এলেন, তখন রসুল স. হাকামকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন। এ আহবানে সাড়া দিলেন তিনি। মক্কাতেও আর ফিরে গেলেন না। আত্মনিয়োগ করলেন রসুলেপাক স. এর সেবায়। পরে বিরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তিনি। ওছমান ইবনে আবদুল্লাহ্ মক্কায় চলে গেলো। তার মৃত্যু হয়েছিলো কুফরী অবস্থায়।

গজওয়ায়ে বদর

হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে গজওয়ায়ে বদর সংঘটিত হয়েছিলো। এ গজওয়াকে গজওয়ায়ে বদরে কুবরা এবং বদরে উজমাও বলা হয়। বদর হচ্ছে একটি লোকালয়ের নাম, বা বদর ইবনে মুখাল্লাদ ইবনে নযর ইবনে কেনানার সঙ্গে সম্বন্ধকৃত বলে মনে করা হয়। সে এ স্থানে তাঁবু ফেলে বসতি স্থাপন করেছিলো। অথবা বদর বলতে বদর ইবনে হারেছকে বুঝানো হয়ে থাকে। সে এখানে একটি কূপ খনন করেছিলো। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে এক বৃদ্ধ দীর্ঘদিন পর্যন্ত বসবাস করেছিলো। তার নাম ছিলো বদর। বদর নামকরণের আরও একটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন— স্থানটি খুব প্রশস্ত ছিলো এবং সেখানকার পানি এতো স্বচ্ছ ছিলো যে, বদরে কামেল অর্থাৎ পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ তাতে দৃষ্টিগোচর হতো।

রসুলেপাক স. এর নেতৃত্বাধীন অভিযানসমূহের মধ্যে বদর অভিযান ছিলো সর্ববৃহৎ। এর মাধ্যমেই দ্বীনের সম্মান ও প্রতিপত্তি হয়েছিলো অধিকতর সমুজ্জ্বল। বদর দিবসকে ইয়াওমুল ফুরকান বলেও আখ্যায়িত করা হয়। কেননা এর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয়েছিলো প্রকটভাবে। এ দিবস সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'ইয়াওমালতাকাল জামআন'। কারণ এদিনে মুসলমান ও কাফের দল হয়েছিলো পরস্পরের মুখোমুখি। এ দিনে আল্লাহ্তায়ালা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। কাফেরদের করেছিলেন পর্যুদস্ত ও পরাস্ত। অথচ মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য, আর কাফেররা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাফেররা অস্ত্রশস্ত্রে ও পণ্যসামগ্রীতে পূর্ণরূপে সুসজ্জিত ও ভরপুর হয়ে দম্ভভরে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুল স.কে সম্মান দিলেন, তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করলেন ও ইসলামের মহিমাকে করলেন আলোকজ্জ্বল। শয়তানদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে তাদের চেহারাকে করে দিলেন তমসাচ্ছন্ন। মুসলমানদের উপর তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করলেন এভাবে— 'ওয়ালাক্বাদ নাসারাকুমুল্লহু বিবাদরিন ওয়া আংতুম আযিল্লাতুন' (বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ্ তো তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন) (৩ঃ১২৩)। তিনি আরো বললেন, 'ওয়ামান নাসরু ইল্লা মিন ইংদিল্লাহিল আযীযিল হাকীম' (এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহের নিকট হইতেই হয়) (৩ঃ১২৬)।

রসুলেপাক স. হিজরতের ঊনিশতম মাসের বারই রমজানে বদর অভিমুখে যাত্রা করেন। কেউ কেউ বলেছেন, আটই রমজানে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। আবার কেউ কেউ বলেছেন ১৭ই রমজান শুক্রবার দিনের কথা। কারও কারও মতে সেদিন ছিলো শনিবার। রসুলে আকরম স. বদরযাত্রার পূর্বে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে যান হজরত আবু লুবাবা আনসারীকে। এ যুদ্ধে রসুলেপাক

স. এর সঙ্গে আনসার সাহাবীগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে আনসারগণ কোনো গজওয়া বা সারিয়াতেই সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি। এর কারণ ছিলো এই যে, বায়আতে আকাবাতে তাঁরা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁর শত্রুদেরকে প্রতিহত করবেন তাঁদের আপনাপন বাসস্থান থেকে। এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিলো ৩১৩ জন। ৭৭ জন ছিলেন মুহাজির আর বাকী ২৩৬ জন ছিলেন আনসার। রসুল স. এর সঙ্গে ছিলেন মাত্র তিনশ পাঁচ জন সাহাবী। আশিজন মুহাজির আর বাকীরা ছিলেন আনসার। বাকী আটজন সাহাবী এমন ছিলেন, যাঁরা সঙ্গত কোনো কারণে যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তবে গণিমতের মাল থেকে তাঁদেরকেও অংশ দেওয়া হয়েছিলো। জীবনালেখ্যপ্রণেতাগণ তাঁদেরকেও আসহাবে বদর হিসেবেই গণ্য করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন মুহাজির, যার মধ্যে একজন ছিলেন হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফান। তিনি রসুল স. এর নির্দেশানুসারে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী হজরত রুকাইয়ার দেখাশোনার জন্য মদীনায় থেকে যান। দ্বিতীয়জন ছিলেন হজরত তালহা এবং তৃতীয় জন ছিলেন হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদ, যাঁরা মুশরিকদের কাফেলার সন্ধান করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অন্যদিকে। পাঁচজন ছিলেন আনসার সাহাবী— যাঁদের নাম জীবনীগ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর ছিলো তিনটি ঘোড়া, সত্তুরটি উট, ছ'টি যুদ্ধবর্ম এবং আটটি তরবারী। একটি উটের উপর কয়েকজন করে মুসলিম যোদ্ধা পালাক্রমে আরোহণ করতেন। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সওয়ার হয়েছিলেন হজরত আলী এবং হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা। তাঁরা পালাক্রমে উটের উপর আরোহণ করতেন। যখন রসুলেপাক স. এর পায়ে হেঁটে যাওয়ার পালা এলো, তখন তাঁরা দু'জনই আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আরোহী অবস্থাতেই থাকুন। আমরা আপনার বাহনের রেকাব ধরে হেঁটে যাই। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা তো আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও। আর আমি সওয়াব পাওয়ার দিক দিয়ে তোমাদের চেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষীও নই।

মুশরিকদের সংখ্যা ছিলো একহাজার বা ন'শ' অথবা পাঁচশ পঞ্চাশজন। এক বর্ণনামতে এক হাজারের চেয়ে কম এবং ন'শ'র চেয়ে বেশী। তাদের ঘোড়ার সংখ্যা ছিলো সাতশ বা তার অধিক। আর উটের সংখ্যা ছিলো এতো বেশী যে, যাতে তাদের সমস্ত মাল ছামান বহন করা যায় এবং যার সংখ্যাধিক্যের উপর বড়াই করা যায়। অশ্বারোহীরা ও পদাতিকেরা বর্মপরিহিত ছিলো। তাদের সঙ্গে ছিলো গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র। তারা পানির যে পাশে শিবির স্থাপন করেছিলো, সে পাশে তাদের নর্তকী ও গায়িকারা ইসলামের নিন্দাবাদ করে নাচগান করতো। কুরায়েশ গোত্রপতিদের মধ্যে কেউ না কেউ প্রতি দিন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতো। তাদের জন্য প্রতি দিন এগারটি করে উট যবেহ করা হতো।

মুসলমানদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ছাড়াই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। রসুলেপাক স. এবং তাঁর অন্যান্য সহচরগণ কেউই এ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সিরিয়া থেকে আগমনকারী কুরায়েশদের বাণিজ্যবহরাধিপতি আবু সুফিয়ানকে পাকড়াও করাই ছিলো মুসলমানদের উদ্দেশ্য। ওই দলে আমর ইবনুল আসও ছিলো। ত্রিশটি বাহন ছিলো তাদের। তারা যখন বদর প্রান্তরের কাছাকাছি এলো তখন রসুলেপাক স. এ ব্যাপারে অবহিত হলেন। সাহাবীগণকে বললেন, ওরা আসছে। ওদের সঙ্গে অনেক ধনসম্পদ আছে। ওদের জনসংখ্যাও কম। ওদেরকে পরাস্ত করার মাধ্যমে আল্লাহ্আয়ালা তোমাদেরকে হয়তো সম্পদবান করবেন। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. তখন দোয়া করেছিলেন, হে আমার প্রভুপালক! মুসলমানগণ বাহনহীন। তাদেরকে বাহন দান করো। তারা ক্ষুধার্ত- তাদেরকে আহার দান করো। তারা বস্ত্রহীন। তুমি তাদেরকে বস্ত্র দান করো। তারা বিত্তহীন। তুমি তাদেরকে প্রাচুর্য দান করো। বদর যুদ্ধ থেকে মুসলমানগণ যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি অনেক উট, কাপড়চোপড়, খাদ্য ও বিভিন্ন প্রকারের মালের মালিক না হয়ে ফিরেছিলেন।

রসুলেপাক স. হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এবং হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদকে কুরায়েশ কাফেলার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে রসুলেপাক স. কে কাফেলার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করলেন।

আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্যবহরসহ বদর নামক স্থানে পৌঁছে সেখানকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা মোহাম্মদ এবং তার কোনো গুপ্তচর সম্বন্ধে কোনো কিছু জানো কি? তারা বললো দু'জন উষ্ট্রারোহী অমুক স্থানে এসেছিলো। আবু সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে উটের বিষ্ঠা ভেঙে পরীক্ষা করে তার মধ্যে খেজুরের বিচি পেলো। তা দেখে বললো, আল্লাহ্র কসম! তাদের উট ইয়াছরিবের খেজুর খেয়েছিলো। এতে করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ওই দু'জন গুপ্তচরই ছিলো। আবু সুফিয়ান তখন প্রচলিত পথ ছেড়ে দিয়ে বদরের প্রান্তর এড়িয়ে সাগরের তীর ধরে মক্কার দিকে যাত্রা করলো। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যামযাম ইবনে আমর গিফারীকে আগে ভাগে মক্কায় পাঠিয়ে দিলো। সে গিয়ে জানালো, মোহাম্মদ তাদের বাণিজ্যবহর লুট করতে উদ্যত। সুতরাং শীঘ্র সাহায্য পাঠানো হোক। বাণিজ্যসামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক। আবু জাহেল এ সংবাদ শুনে বলতে লাগলো, মোহাম্মদ এবং তার সাথীরা মনে করেছে, এ কাফেলা আমর ইবনুল হাযরামীর কাফেলার মতো। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! সে রকম কক্ষণও নয়।

বর্ণিত আছে, যামযাম গিফারী মক্কায় পৌঁছার পূর্বে আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব একটি স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, কয়েকজন উষ্ট্রারোহী আবতাহ নামক

স্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলছে, হে কুরায়েশ জনতা! তোমরা তাড়াতাড়ি আপন আপন হত্যাস্থলে এসো। আবু জাহেল এ স্বপ্নের কথা শুনে হজরত আব্বাসকে বললো, হে আবুল ফযল! তোমাদের বংশের মধ্যে আবার একজন নারীও নবী হয়ে গেলো নাকি। পুরুষ নবী পেয়ে তোমরা কি তাহলে সন্তুষ্ট নও।

সে আরও বললো, ঠিক আছে। স্বপ্ন ফলে কিনা তা দেখার জন্য আমি তিন দিন অপেক্ষা করবো। যদি এর মধ্যে কিছু না হয়, তবে আরবের সমস্ত গোত্রের লোকদেরকে ডেকে এনে বলবো, হাশেম বংশের লোকেরা মিথ্যাবাদী। জীবনী লেখকগণ যামযাম গিফারী থেকেও অনুরূপ একটি স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণটি এরকম— যে সময় আমি কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলাম, তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি উটের পিঠে চড়ে এমন একটি প্রান্তর অতিক্রম করে যাচ্ছি, যার সব কিছুই রক্তে রঞ্জিত। জেগে উঠেই বুঝলাম, কুরায়েশদের নিস্তার নেই। বড় কোনো বিপদে তাদেরকে পড়তেই হবে। জীবনীকারগণ বলেন, যামযাম গিফারীর ওই স্বপ্নের কথা শুনে হাশেম বংশীয়গণ খুবই খুশি হয়েছিলেন। কেননা তার স্বপ্ন ছিলো আতেকার স্বপ্নের প্রত্যয়ন।

মক্কাবাসীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। তারা নির্ধারণ করলো, পরিবারের প্রতি কর্মক্ষমদের মধ্যে একজন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। না হলে অন্য কাউকে বদলী হিসেবে যুদ্ধে পাঠাবে। কুরায়েশদের গোত্রপতি আবু লাহাব ছাড়া কেউ এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলো না। সে তার নিজের বদলে আস ইবনে হেশাম ইবনে মুগীরাকে নিযুক্ত করলো।

উমাইয়া ইবনে খালফ জামহী মক্কার বাইরে যেতে চাইলো না। তার কারণ কোনো এক সময় রসুলে আকরম স. হজরত সাআদ ইবনে মুআযকে জানিয়েছিলেন, উমাইয়া ইবনে খালফ আমার কোনো এক সাহাবীর হাতে মারা পড়বে। রসুলেপাক স. এর ভবিষ্যদ্বাণী যে ফলবেই, সে ব্যাপারে কুরায়েশদের সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু আবু জাহেল তাকে উত্যক্ত করতে লাগলো। বললো, হে আবু সাফওয়ান! তুমি মক্কার স্বনামধন্য গোত্রাধিপতি। সুতরাং যুদ্ধযাত্রায় অনীহা প্রকাশ তোমার জন্য নিতান্ত অশোভন। এতে করে সাধারণ যোদ্ধারা উদ্যম হারিয়ে ফেলবে যে।

আবু জাহেলের এমতো প্ররোচনায় তাকে সিদ্ধান্ত বদলাতে হলো। এক বর্ণনায় এসেছে, মালউন আবু জাহেল কাবাগৃহের উপরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো, হে মক্কাবাসী! তোমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো এবং নিজেদের মাল ও কাফেলার কাছে পৌছে যাও। তোমাদের আগে মোহাম্মদ ও তার সাথীরা যদি পৌঁছে যায়, তাহলে তোমাদের কল্যাণ নেই। কাফেরদের এক হাজারের একটি জঙ্গী কাফেলা বেরিয়ে পড়লো। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সামানপত্র, গান বাজনার যন্ত্র ও নর্তকীদেরকে সঙ্গে নিয়ে দম্ভভরে বদর প্রান্তরের দিকে যাত্রা করলো।

হজরত জিব্রাইল রসুলে আকরম স.কে কাফেরদের বেরিয়ে পড়ার সংবাদ জানিয়ে দিলেন। তিনি স. পরামর্শে বসলেন। বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য দু'টি দল থেকে একটি দলকে চেয়েছেন— বাণিজ্যবাহিনী অথবা কুরায়েশদের সশস্ত্রবাহিনী। সাহাবীগণের নিকট বাণিজ্যবাহিনীটিই পছন্দনীয় ছিলো। তাঁরা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি যুদ্ধ করার কথা আগে যদি বলতেন, আমরা তাহলে পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারতাম। রসুলেপাক স. বললেন, বানিজ্যবহরটিতো সমুদ্রতীরবর্তী পথ দিয়ে চলে গেছে। ওদিকে আবু জাহেল তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! বাণিজ্যবাহিনীটিকেই কেবল তাড়া করে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা উচিত। রসুলে আকরম স. একথা শুনে রাগান্বিত হলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক দাঁড়িয়ে কিছু ভালো কথা বললেন। তারপর হজরত ওমরও দাঁড়িয়ে অনুরূপ কিছু উত্তম কথা বললেন। রসুলেপাক স. সন্তুষ্ট হলেন এবং কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। হজরত সাআদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিন। অন্য কোনো দিকে আর দৃকপাত করবেন না। আল্লাহ্র কসম! আপনি যদি আমাদেরকে আদন নামক স্থানেও নিয়ে যান, তবুও আমরা আনসাররা কেউ আপনার বিরোধিতা করবো না। রসুলেপাক স. তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

তারপর হজরত মেকদাদ ইবনে আমর দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমাদেরকে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নিয়ে চলুন। আমাদের মুখ থেকে কখনও ওরকম কথা বের হবে না, যা বনী ইসরাইল জনতা বলেছিলো হজরত মুসাকে। তারা বলেছিলো— 'ফাজহাব আংতা ওয়া রব্বাকা ফাক্বাতিলা ইন্না হাহুনা ক্বাই'দুন' (সুতরাং, তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব) (৫ঃ২৪)। তিনি আরও বললেন, আমরা আপনার সাথী হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। যিনি আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আপনি যেখানে যাবেন, আমরাও সেখানে যাবো এবং আপনার অনুগামী হয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করবো। আপনি যদি বুরগে এমাদ পর্যন্ত যান, তবে আমরাও সে পর্যন্ত যাবো। বুরগে এমাদ আবিসিনিয়ার একটি শহরের নাম। তাঁর কথা শুনে রসুলেপাক স. মৃদু হাসলেন এবং তাঁর কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। এরপর আনসারদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। এর দ্বারা আনসারদের মেজাজ পরীক্ষা করা এবং তাঁদের হাল যাচাই করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর এমতো কথার ব্যাখ্যা প্রসংগে মুফাস্সিরগণ বলেছেন, বায়আতে আকাবার সময় আনসারগণ বলেছিলেন, আমরা মদীনার উপকণ্ঠে থাকবো, যতক্ষণ আপনি থাকবেন মদীনার বাইরে। যখন আমাদের গৃহে আসবেন,

তখন আমরা আপনাকে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখবো। আপনার শত্রুর সংগে যুদ্ধ করবো। আমরা আপনাকে এমন উপকরণ সরবরাহ করবো, যা দ্বারা আপনি আপনার জীবন, সন্তান-সন্ততি এবং আপনার স্ত্রীগণকে সহায়তা করে থাকেন। তাঁদের কথা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের সাহায্য-সহায়তার অঙ্গীকার ছিলো রসুল স. এর মদীনাবাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। অথচ তিনি ওই সময় ছিলেন মদীনার বাইরে। কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং সঠিক ব্যাখ্যা এটাই যে, মদীনা আগমনের পর থেকে সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় সর্বখানে তাঁরা হবেন রসুলেপাক স. এর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাপ্রহরী।

তাই রসুলেপাক স. যখন তাঁদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, হজরত সাআদ ইবনে মুআয বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ সম্বোধন কি আমাদের প্রতি? রসুল স. বললেন, হাঁ। হজরত মুআয বললেন, এমন কোনো বিষয় তো নেই, যে বিষয়ে আমরা আপনার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেছি। আমরা আপনার উপর ইমান এনেছি। আপনাকে বিশ্বাস করেছি। আপনি যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, তার সকল কিছুর সত্যতা স্বীকার করেছি। আমাদের অঙ্গীকার দ্বারা আপনার প্রতি বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করেছি। আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং তা মান্য করেছি। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র রসুল! চলুন। যেখানে আপনার ইচ্ছা হয়, সেখানে। যিনি আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বললেও আমরা নির্দ্বিধায় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। পশ্চাদপসরণ করবো না। আপনার শত্রুকে প্রতিহত আমরা করবোই। শত প্রতিকূলতায় ধৈর্যধারণ করবো এবং সত্যপথে সুদৃঢ় থাকবো। আশা করি আল্লাহ্‌তায়ালা যুদ্ধের সময় আমাদের দ্বারা এমন দৃশ্য অবলোকন করাবেন, যাতে আপনার নয়নযুগল শীতল হবে। সুতরাং আপনি যেখানে ইচ্ছা আমাদেরকে নিয়ে চলুন। হজরত সাআদ ইবনে মুআযের কথা শুনে রসুলেপাক স. অত্যন্ত প্রীত হলেন। বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর বরকতের সাথে তোমাদেরকে প্রীত রাখবেন। জেনে রেখো বিজয় তোমাদেরই হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা এই মর্মে আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি কুরায়েশদের বাণিজ্যকাফেলা অথবা সৈন্যবাহিনী এ দু'টি দলের যে কোনো একটিকে আমাদের অধীনস্থ করে দিবেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাদের মৃত্যুস্থলগুলোও দেখতে পাচ্ছি। তারপর তিনি সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করে দেখালেন। হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. তখন মাটির উপর হাত রেখে জায়গা চিহ্নিত করে বলেছিলেন, এ হচ্ছে ওমুক ব্যক্তির হত্যার স্থান। এ হচ্ছে ওমুকের মৃত্যুস্থল। এ হচ্ছে ওমুক ব্যক্তির কতল হওয়ার জায়গা। তিনি এক এক জনের নাম উল্লেখ করে করে জায়গা চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পরে দেখা গিয়েছিলো, তিনি স. যেরূপ বলেছিলেন, সেরূপই হয়েছিলো। তাঁর চিহ্নিত স্থানেই ওই সকল কাফেরের লাশ পড়ে ছিলো।

কুরায়েশদের সৈন্য যখন জুহফা নামক স্থানে পৌঁছলো, তখন জাহাস ইবনে সালত ইবনে মাখযুম ইবনে আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখলো, একজন লোক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছে। তার সঙ্গে একটি উট রয়েছে। সে বলছে, উতবা, শায়বা, আবুল হাকাম ইবনে হেশাম (আবু জাহেল), উমাইয়াকে হত্যা করা হয়েছে। তারপর অশ্বারোহীটি তাঁর উটের ঘাড়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করলো। বাহিনীর মধ্যে এমন কোনো লোক ছিলো না যার শরীরে উক্ত উটের রক্ত ছিটকে পড়েনি। তারপর লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেলো। আবু জাহেল যখন এ স্বপ্নের কথা শুনলো তখন বললো, মুত্তালিব বংশে দেখছি আরেক নবীর জন্ম হলো। শীঘ্রই মানুষ জানতে পারবে, কে কে নিহত হবে। আমরা তো জনশক্তিতে পরিপূর্ণ। আবু জাহেল এভাবেই সবকিছুকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখছিলো। কিন্তু শেষে সে নিজ চোখে দেখতে পেলো কীরূপ অপদস্থ অবস্থায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। আফরার দু'সন্তান মাআয ও মুআওয়ায তাকে আক্রমণ করলো। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো সে। হজরত ইবনে মাসউদ এসে তার বুকের উপর বসলেন এবং তরবারী দিয়ে তার দেহ থেকে মস্তক পৃথক করে ফেললেন। জীবনচরিতপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ানের কাফেলা যখন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে বেরিয়ে এলো, তখন সে তার অনুসারীদের একজনকে কুরায়েশদের নিকট পাঠিয়ে জানিয়ে দিলো, কাফেলা এখন বিপদমুক্ত। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। মোহাম্মদকে আক্রমণ কোরো না। কুরায়েশদের জ্ঞানী ও শুভানুধ্যায়ীরাও কুরায়েশবাহিনীকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলো। উতবা এবং শায়বার পরামর্শও ছিলো যুদ্ধ না করার পক্ষে। উতবা ও শায়বার ক্রীতদাস আদাম নাজরানী রসুলে আকরম স. এর উপর ইমান এনেছিলেন। তিনি তাঁর মালিকদ্বয়কে বললেন, মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হতভাগ্যদের দলভুক্ত হবেন না। কিন্তু দুর্বৃত্তশ্রেষ্ঠ আবু জাহেল বললো, আমরা মোহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ঘরে ফিরবো না। আল্লাহ্র শপথ! বদর প্রান্তরে আমরা যাবোই। সেখানে তিনদিন অবস্থান করবো। উট জবাই করে আনন্দ ফুর্তি করবো। শরাব পান করবো। গান শুনবো। নাচ দেখবো। এরকম করলে আরবের চতুর্দিকে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তির কথা ছড়িয়ে পড়বে। মোহাম্মদও তাহলে আমাদেরকে ভয় করে চলবে।

আবু সুফিয়ান কুরায়েশদেরকে বদরযাত্রা করতে নিষেধ করেছিলো। কিন্তু তার বাণিজ্যবহর মক্কায় উপস্থিত হওয়ার পর সে তার মত বদলালো। সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে বদরে এসে তাদের সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলো।

রসুলেপাক স. বদর প্রান্তরে পৌঁছলেন। কুরায়েশবাহিনী অপর প্রান্তে ছাউনি ফেললো। কোরআন মজীদে বর্ণনাটি এসেছে এভাবে— 'ইজ আংতুম বিলউ'দওয়াতিদ্ দুনইয়া ওয়াহুম বিল উ'দওয়াতিল কুসওয়া' (স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট-প্রান্তে এবং তাহারা ছিল দূরপ্রান্তে) (৮ঃ৪২)। উ'দওয়া অর্থ উপত্যকার শেষ প্রান্ত। 'দুনইয়া' এসেছে 'দুনববুন' শব্দ থেকে। এর অর্থ— অধিক নিকটবর্তী বা মদীনার নিকটবর্তী। 'কুসওয়া' এর অর্থ দূরবর্তী। অর্থাৎ মদীনা থেকে দূরবর্তী। মুসলমানগণ মদীনা শরীফের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর কাফেররা অবস্থান নিয়েছিলো মদীনা থেকে অধিকতর দূরবর্তী স্থান মক্কার দিকে। মুসলমানগণ সেই দিকে অবস্থান নিয়েছিলেন, যে দিক ছিলো মরুপ্রান্তর। পুরো এলাকায় বালু আর বালু। সৈন্যদের এবং বাহনগুলোর পা হাঁটু পর্যন্ত বালুতে ডুবে যায়। পিপাসার্ত ছিলো সবাই। কিন্তু পানি ছিলো শত্রুদের দখলে। তারা বেশ কিছু কূপও খনন করে নিয়েছিলো। মুসলমানদের মধ্যে কারো কারো গোসল ফরজ হয়েছিলো। শয়তান তাঁদের কাউকে কাউকে এমতো কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করলো, তোমরা কি মনে করো তোমরা সত্যাধিষ্ঠিত? তোমরা কি সত্যিই আল্লাহ্র নবীর সঙ্গী? সত্যিই কি তোমরা আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন? তাই যদি হবে, তবে পানি তোমাদের শত্রুদের দখলে কেনো? পিপাসায় তোমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তদুপরি তোমরা জুনুবীও। তোমাদের দুশমনেরা অপেক্ষা করছে, তোমরা যেনো পিপাসায় কাতর হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ো। তখন তারা তোমাদেরকে সহজে পরাস্ত করতে পারবে। তাদের মনোভাব যখন এরকম, তখনই আল্লাহ্তায়ালা বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। সমগ্র উপত্যকা জলমগ্ন হয়ে গেলো। সকলেই পরিতৃপ্ত হলেন। গোসল করলেন। অজু করলেন। উটগুলোকে পানি পান করালেন। আপন আপন মশকসমূহ ভরে রাখলেন। মুসলমানদের দিকের বালুকাময় প্রান্তরটি বৃষ্টির পানি পেয়ে শক্ত হয়ে গেলো। আর শত্রুপক্ষের এলাকাটি বৃষ্টিতে ভিজে কর্দমাক্ত হয়ে গেলো। শয়তান আর কুমন্ত্রণা দেওয়ার উপায় বের করতে পারলো না। মুসলমানদের অন্তরে নেমে এলো জান্নাতি প্রশান্তি। তখনকার পরিস্থিতি আল্লাহ্তায়ালা বর্ণনা করেছেন এভাবে 'ওয়া ইউনায্যিলু আ'লাইকুম মিনাস্ সামাই মাআল লিইউত্বহ্হিরাকুম বিহী ওয়া ইউয্হিবা আ'নকুম রিজ্যাস্ শায়ত্বান' (এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের উপর বারি বর্ষণ করেন উহা দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য, তোমাদিগ হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য) (৮ঃ১১)। জীবনালেখ্যপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের ময়দান ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করলেন এবং নিজের হাত জমিনের উপর রেখে রেখে মুশরিকদের নিহত হওয়ার জায়গা চিহ্নিত করে দিয়ে বললেন, এখানে অমুক মারা যাবে।

এখানে অমুকের লাশ পড়ে থাকবে। পরে দেখা গেলো তাঁর চিহ্নিত স্থানেই তাদের লাশ পড়ে আছে। একটুও এদিকে ওদিকে নয়। বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাআদ ইবনে মুআয নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা আপনার জন্য একটি আরীশা তৈরী করবো। আপনি সেখানেই অবস্থান করবেন। আরীশা বলা হয় কুঁড়ে ঘরকে, যা কোনো বাগানের ভিতর খুঁটি ও গাছের লতা-পাতা দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণার্থে নির্মাণ করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আরীশা তৈরী করা হয় খেজুর গাছের ডাল ও পাতা দিয়ে। 'নেহায়া' পুস্তকে আছে— আরীশা এমন কুঁড়ে ঘরকে বলা হয়, যার ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া হয়। রসুলেপাক স. মসজিদে নববীর দরজার কাছে আরীশা তৈরী করিয়েছিলেন। কোনো কোনো বিবৃতিতে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, নবী মুসার আরীশার মতো আরীশা নির্মাণের জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত। মসজিদে নববীও প্রথমে নির্মিত হয়েছিলো খেজুর গাছের কাণ্ড ও পাতা দিয়ে। হাদিস শরীফে এসেছে, বদর প্রান্তরের ওই আরীশার বাইরে হজরত সাআদ ইবনে মুআয আনসারদের একটি দল নিয়ে পাহারা দিতেন। হাদিস শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাআদ ইবনে মুআয রসুলেপাক স.কে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আরীশার মধ্যেই অবস্থান করুন। আপনার বাহন আপনার কাছেই থাকবে। আর আমরা সকলেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। আল্লাহ্তায়ালা যদি আমাদেরকে বিজয় দান করেন, তাহলে তো ভালোই। আর যদি যুদ্ধের অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করে, তাহলে আপনি আপনার বাহনে আরোহণ করে মদীনায় গিয়ে আপনার সাথিগণের সঙ্গে মিলিত হবেন। তারা আপনাকে আমাদের চেয়ে কম মহব্বত করেন না। রসুলেপাক স. হজরত মুআযের জন্য অনেক দোয়া করলেন। তারপর তিনি আরীশা নির্মাণ করলেন। এখন সেই আরীশার জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে (এই গ্রন্থ রচনাকালে। পরে ওহাবী বাদশাহ তা ভেঙে ফেলে)।

মুশরিক বাহিনী ময়দানে নেমে এলো। রসুলেপাক স. তাদেরকে দেখতে পেয়ে আল্লাহ্র দরবারে মোনাজাত করলেন, হে আমার আল্লাহ্! কুরায়েশরা অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। তারা তোমার এবং তোমার রসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়। হে আল্লাহ্! আমি তোমার ওই সাহায্যের অপেক্ষায় আছি, যার অঙ্গীকার তুমি করেছো। এমন সময় মুসলিমবাহিনীও ময়দানে অবতীর্ণ হলো। রসুলে আকরম স. এর জীবনকাহিনীরচয়িতাগণ বলেছেন, প্রথমে কুরায়েশরা একটি বাহিনী প্রেরণ করে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে চাইলো। সেই বাহিনী মুসলমানদের চারিদিকে চক্কর দিয়ে এসে বললো, মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা কমবেশী তিনশ। তারপর তারা এদিক সেদিক আরও দৃষ্টিপাত করলো। কিন্তু তারা আর কিছু দেখতে পেলো না। বললো, হে কুরায়েশ

সম্প্রদায়! আমরা এমন এক মুসিবত দেখতে পাচ্ছি, যা মৃতদেরকে উঠিয়ে ফেলেছে। আরও দেখতে পাচ্ছি ইয়াছরিবের এমন কতকগুলো উট, যেগুলো প্রাণ সংহারকারী বিষ বহন করে ধেয়ে আসছে। এমতাবস্থায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তোমরা কেবল নিজেদের ধ্বংসই ডেকে আনবে। তোমরা সকলেই যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আক্ষেপ করার জন্যও কাউকে আর খুঁজে পাবে না। সুতরাং যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের নিরাপত্তা। হাকীম ইবনে হাযাম তখন মুশরিক বাহিনীতে ছিলেন। তিনি উতবার কাছে গিয়ে বললেন, হে আবুল ওলীদ! আপনি কুরায়েশদের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন এবং নেতৃস্থানীয়। আপনি কি চান না যে, আপনার সুখ্যাতি দীর্ঘকাল ধরে থাকুক? উতবা বললো, হাকীম! বলো তো কী হয়েছে? হাকীম বললেন, এমন কিছু করুন, যাতে মানুষ ফিরে যায়। উতবা বললো, তোমার কথা আমি মঞ্জুর করলাম। তবে তুমি ইবনে হানযালার (আবু জাহেলের) কাছে যাও। তাকেও একথা বলো। সম্ভবতঃ সে এতে উৎসাহিত হতে পারে এবং লোকদেরকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। হাকীম ইবনে হাযাম বর্ণনা করেন, এরপর আমি আবু জাহেলের কাছে গেলাম এবং তাকে উতবার কথা জানালাম। আবু জাহেল উতবার কাছে এসে বললো, তোমার হৃৎপিণ্ডে বাতাস ঢুকেছে। ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রকাশার্থে প্রবাদটি আরব দেশে বহুল প্রচারিত। উতবা বললো, অচিরেই বুঝা যাবে, কার হৃৎপিণ্ডে বাতাস ঢুকেছে, আর কে কাপুরুষ। এক বিবরণে এসেছে, উতবা আবু জাহেলকে বললো, 'হে ধুসর উরুর অধিকারী! তুমি আমাকে তিরস্কার করছো, আমাকে কাপুরুষ বলছো'। আবু জাহেলের উরুদেশে শ্বেতীর দাগ ছিলো। সে শ্বেতীর দাগের উপর জাফরানের রঙের প্রলেপ দিয়ে রাখতো। এজন্যই উতবা তখন তাকে 'হে ধুসর উরুর অধিকারী' বলে সম্বোধন করেছিলো।

বদর প্রান্তরে যুদ্ধের দামামা

মুসলিমবাহিনী যখন বদর প্রান্তরে অবতীর্ণ হলেন, তখন রসুলেপাক স. সকলকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করালেন এবং বললেন, আমি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আক্রমণ কোরো না। ওরা নিকটবর্তী হলে তীর নিক্ষেপ কোরো। তীর যেনো দ্রুত নিঃশেষ না হয়, সেদিকেও খেয়াল রেখো। জীবনীরচয়িতাগণ তখনকার একটি বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— রসুলেপাক স. যখন সাহাবাকেরামকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাচ্ছিলেন, তখন তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিলো। সাওয়াদ ইবনে আযীয়া নামক একজন হাসি-খুশি ও বুদ্ধিমান সাহাবী ছিলেন। তিনি সারিসমূহের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রসুলেপাক স. তাঁর বুকের উপর ছড়ি মেরে বললেন, সাওয়াদ! কাতার সোজা করো। সাওয়াদ বললেন, হে

আল্লাহ্র রসুল! আপনি কষ্ট দিলেন যে। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আদালত ও ইনসাফ আপনার হাতে। আমি কেসাসপ্রার্থী। রসুলেপাক স. শরীর থেকে বুক পর্যন্ত অনাবৃত করলেন এবং বললেন, হে সাওয়াদ! কেসাস নাও। সাওয়াদ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ রসুলেপাক স. এর পবিত্র বুকের উপর রেখে চুম্বন করলেন। তিনি স. বললেন, এমন করছো কেনো? হজরত সাওয়াদ বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! এ আমার অন্তিম মুহূর্ত, এ যুদ্ধে আমি শহীদ হয়ে যাবো। কাজেই আমার ইচ্ছা ছিলো আমার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমার দেহ আপনার পবিত্র শরীরের স্পর্শধন্য হোক। তাঁর কথা শুনে রসুলুল্লাহ্ স. পরিতুষ্ট হলেন এবং তাঁর জন্য কল্যাণপ্রার্থনা করলেন।

কাফেরবাহিনী থেকে এগিয়ে এলো উতবা ইবনে রবীআ, ওলীদ ইবনে উতবা এবং আরো একজন। তারা যুদ্ধের আহবান জানালো। মুসলিমবাহিনী থেকে এগিয়ে গেলেন হজরত আওফ, হজরত মুআয ইবনে হারেছ এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা। কাফেররা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে? তাঁরা উত্তরে বললেন, আমরা আনসারী। তারা বললো, তোমাদের উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। আমরা আহবান জানাচ্ছি আমাদের পিতৃব্যপুত্রদেরকে। তাদের মধ্য থেকে একজন উচ্চস্বরে বললো, হে মোহাম্মদ! আমাদের গোত্র থেকে আমাদের সমমর্যাদাসম্পন্নদেরকে পাঠাও। রসুলেপাক স. হজরত উবায়েদ ইবনে হারেছ, হজরত হামযা এবং হজরত আলীকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও! মোকাবেলা করো। ত্রয়ী বীর এগিয়ে গেলেন। পৌত্তলিকেরা বললো, হাঁ, এবার আমাদের সমপর্যায়ের প্রতিপক্ষ পেয়েছি। প্রথমে এগিয়ে গেলেন হজরত উবায়েদ। তাঁর বয়স ছিলো তখন আশি বৎসর। হজরত হামযা মোকাবেলা করলেন শায়বাকে। হজরত আলী ওলীদ ইবনে উতবাকে। হজরত আলী ওলীদকে কতল করে ফেললেন। হজরত হামযাও তাঁর প্রতিপক্ষকে খতম করে দিলেন। হজরত উবায়েদ ও তাঁর প্রতিপক্ষের মধ্যে তখনও তলোয়ারযুদ্ধ চলছিলো। অকস্মাৎ একটি আঘাত এসে পড়লো হজরত উবায়েদের উরুদেশে। তাঁর সহায়তায় এগিয়ে গেলেন হজরত হামযা ও হজরত আলী। প্রতিপক্ষরাও হজরত উবায়েদকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এলো এবং তাঁর পায়ের গোছার উপর একটি আঘাত করে বসলো। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো অঝোরে। হজরত উবায়েদকে উঠিয়ে নিয়ে রসুলে পাক স. সকাশে উপস্থিত করা হলো। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি কি শহীদ? রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ, তুমি শহীদ। হজরত উবায়েদের শাহাদত সম্পন্ন হতে বিলম্ব হচ্ছিলো বলেই তিনি তখন এরকম প্রশ্ন করেছিলেন।

হজরত উবায়েদ শহীদগণের অন্তর্ভূত কিনা সে সম্পর্কে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তিনি বদর প্রান্তর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সাফরা বা রাওয়াহা নামক উপত্যকায় ইনতেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

আফরার দুই পুত্র মুআওয়ায ও মাআয আবু জাহেলের সন্ধান করে ফিরছিলেন। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে তারা আবু জাহেলকে তরবারী দিয়ে আঘাত করলেন, আবু জাহেল মাটিতে পড়ে গেলো। হজরত মাআয বর্ণনা করেন, আমি আবু জাহেলকে আঘাত করে তার পায়ের গোছা বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা আমাকে আঘাত করে আহত করলো। আমার বাহুমূল কর্তিত হয়ে ঝুলতে শুরু করলো। ওই অবস্থাতেই আমি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলাম। কর্তিত হাতটি অসুবিধা সৃষ্টি করছিলো বলে আমি ঝুলন্ত হাতটি পায়ের নিচে চেপে ধরে হাতটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। হজরত মুআওয়ায ইবনে আফরা তলোয়ার মেরে আবু জাহেলকে নিঃসাড় করে দিলেন। তখনও আবু জাহেলের দেহে প্রাণ ছিলো। জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, মুআওয়ায ও মাআয রসুলেপাক স. সকাশে হাজির হয়ে আবু জাহেলকে নিহত হওয়ার সংবাদ জানালেন। তিনি স. বললেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে কে এর হত্যাকারী? দুভাই-ই এমতো বিরল সৌভাগ্যের দাবীদার হয়ে বসলেন। রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, তোমরা তোমাদের তরবারী কি সাফ করে ফেলেছো? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে তলোয়ার দেখাও। তাঁদের তরবারী দেখে তিনি স. বললেন তোমাদের দু'জনের তরবারীই তো দেখছি রক্তরঞ্জিত। ঠিক আছে। তোমরা দু'জনই এর হত্যাকারী। এরপর তিনি স. বললেন, আবু জাহেলের মালপত্র মাআযকে দেওয়া হবে।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত মাআয গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফানের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাযী মায়ায ইবনে ওয়াহাব থেকে কাযী আয়ায বর্ণনা করেছেন, হজরত মাআয যখন রসুলেপাক স. সকাশে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর হাত কর্তিত হয়ে চামড়ার সঙ্গে ঝুলে ছিলো। রসুলেপাক স. তাঁর নিজের মুখের পবিত্র লালা তাঁর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় লাভ করলেন তিনি। হজরত ওছমানের খেলাফতকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর ভাই হজরত মুআওয়ায সেদিনই বদরের প্রান্তরে শহীদ হয়ে গেলেন। উলামা কেরাম বলেন, রসুলেপাক স. আবু জাহেলের মালপত্র হজরত মাআযকে দেওয়ার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন এ জন্য যে, সর্বপ্রথম আবু জাহেল তাঁর আঘাতেই ধরাশায়ী হয়েছিলো, যদিও দু'ভাই-ই আঘাত করেছিলেন যৌথভাবে। রসুলেপাক স. তাই বলেছিলেন, তোমরা দু'জনই আবু জাহেলের হত্যাকারী। তাঁদের মনোরঞ্জনার্থেই তিনি স. তখন এরকম বলেছিলেন। অন্যথায় শরীয়তের বিচারে হত্যাকারী তিনিই, যাঁকে নিহত ব্যক্তির মালপত্রের অধিকারী করা হয়।

হজরত ইবনে মাসউদ আবু জাহেলকে এমতাবস্থায় পেলেন যখন তার দেহ নিঃসাড় হয়ে গেলেও দেহে প্রাণ বিদ্যমান ছিলো। তিনি তাঁর মস্তক কেটে নিলেন। বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত হাদিসে বিবরণটি এসেছে এভাবে— রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, কে এমন আছো যে আবু জাহেলের সংবাদ নিয়ে আসতে পারো? তখন ইবনে মাসউদ এগিয়ে গেলেন এবং তাকে ভূতলশায়ী অবস্থায় পেলেন। এই বর্ণনানুযায়ী আফরার দু'সন্তানই তাকে হত্যা করেন। পরে হজরত ইবনে মাসউদ আবু জাহেলের হিংসাভরা বক্ষে চেপে বসলেন এবং তার নাপাক দাড়ি টেনে ধরে বললেন, তুমিই কি আবু জাহেল? আল্লাহ্ তোমাকে অপদস্থ করেছেন হে আল্লাহ্র দুশমন। আবু জাহেল বললো, এক ব্যক্তিকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছে— এর বেশী তো কিছু নয়। আমাকে তো কৃষক গোত্রের লোকদের মধ্য থেকে কেউ হত্যা করেনি। কৃষক বলে সে বোঝাতে চেয়েছিলো আনসার সাহাবীগণকে। উলামাকেরাম বলেন, আবু জাহেলকে যদিও এ উম্মতের ফেরাউন বলা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ছিলো ফেরাউনের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা ফেরাউন যখন সলিলমগ্ন হয়ে মরতে বসেছিলো, তখন সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিলো এবং আত্মরক্ষার্থে বাহানা খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু আবু জাহেল শেষ নিঃশাস পর্যন্ত ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

হজরত ইবনে মাসউদ যখন তার কর্তিত মস্তক রসুলেপাক স. এর কাছে নিয়ে এলেন, তখন তিনি স. বললেন, ওই আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। তুমি তো আল্লাহ্র শত্রু। অপর এক বিবরণে এসেছে, রসুলেপাক স. বললেন, ওই আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তার ধর্মমতকে সম্মানিত করেছেন। তিনি তখন একথাও বললেন যে, এই উম্মতের ফেরাউনের মৃত্যু হয়েছে। অপর এক বিবরণে এসেছে, রসুলেপাক স. তখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সেজদাবনত হলেন। কোনো কোনো ফেকাহশাস্ত্রবিদ তাই মনে করেন, নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে এবং বালামুসিবত দূরীভূত হলে শোকরানার সেজদা করা মোস্তাহাব। অবশ্য উলামা কেরামের মধ্যে তেলাওয়াতে সেজদা ব্যতীত নামাজের বাইরের কোনো সেজদার বৈধতার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ ওই সেজদাকে তেলাওয়াতের সেজদার অনুরূপ মনে করেন। তবে হানাফী মাযহাবের জমহুর উলামার মত অন্যরকম। তাদের মতে উল্লেখিত হাদিসে বর্ণিত সেজদা অর্থ নামাজ। যেমন অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. তখন দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. দু'পক্ষকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লক্ষ্য করলেন, মুসলিমবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নগণ্য। আর শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা অনেক। তিনি প্রবেশ করলেন আরীশে। কেবলামুখী হয়ে দোয়া করার উদ্দেশ্যে

হস্ত উত্তোলন করলেন। দোয়ার মধ্যেই আল্লাহ্তায়ালার স্মরণে মগ্ন হয়ে গেলেন। কাছে ছিলেন কেবল হজরত আবু বকর। তিনি স. তখন আল্লাহ্তায়ালার নিকট ওই বিজয় প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্পাক তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি স. নিবেদন করলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি যদি এ যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরাস্ত করো, তবে ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদতকারী আর কেউ থাকবে না। তিনি অত্যধিক রোদন করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তাঁর পবিত্র স্কন্ধদেশ থেকে চাদর পড়ে গেলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তা উঠিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দয়া করে ক্ষান্ত হোন। আপনি আপনার প্রভুপালকের নিকট যা প্রার্থনা করছেন, তার প্রকাশ সত্বরই ঘটবে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তখন দু'রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। আর হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর ডান দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ ও দোয়ায় শরীক হয়েছিলেন। হজরত আলী বলেন, বদরের দিন আমি যুদ্ধ করতে করতে বার বার আরীশে এসে দেখতাম, তিনি স. সেজদায় পড়ে আছেন। দোয়া করছেন— 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম বিরহমাতিকা আস্তাগীছ' (হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের ফরিয়াদ করছি) বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে আরীশার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ তন্দ্রাভিভূত হলেন। জাগ্রত হয়ে মৃদু হেসে বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্র সাহায্য এসেছে। অশ্বারোহী জিবরাইল তার অশ্বের লাগাম ধরে উপস্থিত হয়েছে। তার অশ্বের সামনের দু'টি দাঁতের মধ্যে মাটি জমে গিয়েছে। তারপর রসুল স. আরীশের বাইরে গেলেন এবং লোকদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে লাগলেন। বললেন, যে ব্যক্তি যে কাফেরকে হত্যা করতে পারবে, সেই সেই কাফেরের মালসামান পাবে। তোমরা জেনে রেখো, ওই পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জান; যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পুণ্যের আশায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে যাবে, তার ঠিকানা হবে বেহেশতে। ওমায়ের ইবনে হেমাম তখন খেজুর খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখন আমার আর বেহেশতের মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই। কেবলমাত্র এ বিষয়টি ছাড়া যে, আমি কোনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর হাতে শহীদ হয়ে যাবো। একথা বলেই তিনি হাত থেকে খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে হাতে তলোয়ার উঠিয়ে নিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁর আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। শাহাদতের পেয়ালা পান করার সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি।

বিঃ দ্রঃ 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে আছে, বদর যুদ্ধের দিন রসুলেপাক স. মোনাজাত ও রোদন করে আল্লাহ্র দরবারে যে প্রার্থনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে হাদিস ব্যাখ্যাতাগণ কিছু প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং সেগুলো পর্যালোচনান্তে বলেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীকের রসুলেপাক স.কে রোদন ও প্রার্থনা থেকে

বিরত রাখার বিষয়টিকে কীভাবে গ্রহণযোগ্য বলে ভাবা যায়? একীনের দিক দিয়ে তিনি তো রসুলুল্লাহ্ স. এর চেয়ে অগ্রগামী নন। বরং কোনো দিক দিয়েই তিনি রসুল স.কে অতিক্রম করতে পারেন না। রসুলুল্লাহ্ স. এর একান্ত বিশ্বাস সবার উপরে। প্রকৃত বিষয় তাহলে কী? এমতো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে কয়েক রকমভাবে। যেমন— সুহাইলি বলেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক ওই সময় ছিলেন পরিতুষ্টির মাকামে। আর খওফ (ভয়) ও শুহুদ (দর্শন) এর মাকামে ছিলেন রসুলেপাক স.। আল্লাহ্তায়ালা যা ইচ্ছে করেন, তাই করেন। কিন্তু রসুলেপাক স. এর আশংকা ছিলো, আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতকারী কেউ থাকবে না। সুতরাং তাঁর এই ভয়ভীতি তো ইবাদতই। বরং এ হচ্ছে ইবাদতের কামালিয়াত (পূর্ণতা)। ত্রুটি বা ন্যূনতা কিছুতেই নয়। খাত্তাবী বলেছেন, কেউ যেনো এ রকম অপধারণায় পতিত না হয় যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক আল্লাহ্র মারেফতের দিক দিয়ে তখন রসুলেপাক স.কে অতিক্রম করেছিলেন। বরং রসুলেপাক স. এর তখনকার আহাজারী রোনাজারী ছিলো তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দের প্রতি তাঁর অপত্য স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ। সাহাবাকেরামের মনোবল অটুট ও সুদৃঢ় রাখতেই তিনি স. তখন ওভাবে রোদন ও প্রার্থনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। কেননা তাঁদের বিশ্বাস ছিলো রসুলেপাক স. এর দোয়া অবশ্যই কবুল হবে। আর হজরত আবু বকর সিদ্দীক সান্ত্বনা দিয়েছিলেন একারণে যে, তখন তিনি জানতে পেরেছিলেন, রসুলেপাক স. এর দোয়া কবুল করা হয়েছে। তাই তিনি দৃঢ়তা ও প্রশান্তির সঙ্গে ওরকম বলতে পেরেছিলেন। পরে রসুলুল্লাহ্ স.ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলছিলেন, শীঘ্রই সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। রসুলে আকরম স. ওই সময় ছিলেন খওফের (ভীতির) মাকামে। আর খওফের মাকামের পরিপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে নামাজের অবস্থা। এমনও তো হতে পারতো যে, রসুলেপাক স. ওই সময় দোয়া না করলে ওই দিন মুসলমানেরা বিজয়ী হতে পারতেন না। কেননা আল্লাহ্তায়ালা বিজয়দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা তো কোনো বিশেষ দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো না। বরং বিজয়ের সুনির্দিষ্ট দিন, তারিখ, ঘটনা ছিলো অনুল্লেখিত (সম্ভবতঃ তাঁর দোয়ার বদৌলতেই আল্লাহ্তায়ালা বদর যুদ্ধের দিবসে মুসলিমবাহিনীকে বিজয় দান করেছিলেন)। খাত্তাবী আরও বলেছেন, রসুলেপাক স. এর ‘ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদতকারী কেউ থাকবে না’ কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— তিনি জানতেন যে, তিনিই খতামুন্নাবিয়্যীন (সর্বশেষ নবী)। সুতরাং তিনি এবং তাঁর সহচরবৃন্দ যদি এ যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যান, তাহলে তো তাঁর পরে আর এমন কেউ এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন না, যিনি ইমানের দিকে আহবান জানাবেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, মুসলমানগণ শত্রুদলের মুখোমুখি দণ্ডায়মান। ফেরেশতারাও যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। তখন তিনি স. নিজেও

জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেন। আর একথাটিও মনে রাখা দরকার যে, জেহাদ দু'প্রকার— এক প্রকার জেহাদ করতে হয় তলোয়ারের মাধ্যমে, আর এক প্রকার দোয়ার মাধ্যমে। আর এটাও সুন্নত যে, সমরাধিনায়ক নির্দেশ প্রদানার্থে থাকবেন তাঁর সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে। সরাসরি তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না। রসুলেপাক স. তাই তখন পশ্চাদ্ভাগেই ছিলেন। কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকা তাঁর মনোপুত হলো না। উভয় প্রকার জেহাদেই তিনি শরীক থাকবেন বলেই তিনি স. দোয়া করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ যুগপৎ সেনাধিনায়কত্ব এবং প্রার্থনাধিনায়কত্ব। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেই।

এ ব্যাপারে সাইয়েদ আহমদ মারযুক, যিনি ছিলেন একজন মুহাক্কেক আলেম ও প্রখ্যাত সুফী, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসা করা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া সত্ত্বেও এই একটি বিষয়ে বিশ্বাস রাখা একান্ত অপরিহার্য যে, আল্লাহ্তায়ালার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব নয়। বিষয়টির সমাধানে আরও দু'টি মূলনীতির অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমন— ১. দোয়া কবুল হওয়ার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রতিশ্রুতি যদি থাকে, তবে বিষয়টি তো জটিলতামুক্তই। ২. আর নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিশ্রুতি যদি দেওয়া হয়, তবুও প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই সময়ে যদি দোয়া কবুল নাও হয়, তবুও প্রতিশ্রুতির সত্যতার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়া যাবে না। কারণ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হওয়া আসবাব (উপকরণ) এবং শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। আর আসবাব ও শর্তের ব্যাপারে বান্দা অজ্ঞাত। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন— 'ওলা ইউহীতূনা বিশাই্ইম মিন ই'লমিহী ইল্লা বিমা শাআ' (যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না) (২ঃ২৫৫)। শর্ত ও সীমাবদ্ধতার বিষয়ে কোনো কিছু জানিয়ে দেওয়া আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব নয়। বরং তাঁর পরিপূর্ণ হেকমত হচ্ছে বিষয়টিকে গোপন রাখা। যেমন হজরত ইব্রাহীম খলীল পূর্ণ আদব প্রদর্শন করেছিলেন এভাবে— তিনি তাঁর কওমের লোকদেরকে বলেছিলেন, 'ওলা আখাফু মা তুশরিকূনা' (তোমরা যাহাকে তাহার শরীক কর তাহাকে আমি ভয় করি না) (৬ঃ৮০)। তিনি আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদার প্রতি পূর্ণপ্রত্যয়ী ছিলেন বলেই এরূপ বলতে পেরেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদা ছিলো এরকম— তাঁর রসুলগণের উপর কোনোরূপ ভয়-ভীতি নেই আর রসুলগণকে সাহায্য করা আল্লাহ্তায়ালার উপর ওয়াজিব। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা যেহেতু চির অমুখাপেক্ষী, তাই তাঁর উপর কোনোকিছু ওয়াজিবও নয়। তাই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন একথা বলে যে, 'ইন্না আঁই ইয়াশাআ রব্বী শাইয়া' (তবে আল্লাহ্তায়ালা যেমন ইচ্ছা করেন)। তাঁর এরূপ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সীমাহীন জ্ঞানের প্রতি ধাবিত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার

জ্ঞানকে তাঁর বান্দাগণ যে বেষ্টন করতে অক্ষম, সে কথার স্বীকৃতি দেওয়া। তাই তিনি তখন একথাও বলেছিলেন যে, 'ওয়াসিয়া' রব্বী কুল্লা শাইইন ই'লমা' (আমার প্রভুপালকের জ্ঞান সব কিছুতেই বিস্তৃত) (৬ঃ৮০)। হজরত ইব্রাহীমের এমতো বক্তব্য নিশ্চয়ই আল্লাহ্নির্ভরতাবিরোধী নয়। তিনি আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক কৃত অঙ্গীকারের প্রতি মোটেও সন্দিহান ছিলেন না। বরং তাঁর কৃত ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও নির্ভরশীল হয়েই তিনি ওরকম করে বলেছিলেন। উলামাকেরাম তাই বলেন, নবীগণ আল্লাহ্কে ভয় করেন তাঁর মুখাপেক্ষিহীনতার মাহাত্ম্যের (বেনিয়াজীর শানের) কারণে। তাঁর ওয়াদার প্রতি নির্ভরশীল না হওয়ার কারণে নয়।

হজরত শোয়াইব আ. তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'ওমা ইয়া কূনু লানা আন নাউ'দা ফীহা ইল্লা আঁই ইয়াশাআ' (আমাদের প্রতিপালক আলাহ্ ইচ্ছা না করিলে আর উহাকে ফিরিয়া পাওয়া আমাদের সমীচীন নয়) (৭ঃ৮৯)। তারপর তিনি বলেছিলেন 'রব্বী শাইআ ওয়াসিআ রব্বী কুন্না শাইইন ই'লমা' (আমার প্রতিপালক অদ্যাবধি ইচ্ছা না করিলে, সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত) (৬ঃ৮০)। আল্লাহ্তায়ালার এলেমের অসীম প্রশস্ততার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই তিনি এরকম বলেছিলেন। রসুলে আকরম স.ও বদর যুদ্ধের দিন তাই বলেছিলেন, 'আল্লাহুম্মা ইন হালাকাত হাজিহিল ই'সাবাতু আন তু'বাদা আ'লা ওয়াজুহিল আরদ্বি' (হে আল্লাহ্! এ দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ভুপৃষ্ঠে তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না)। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তখন বললেন, হে আল্লাহর রসুল! নিশ্চয়ই আপনার প্রভুপালক আপনার দোয়া শুনেছেন, তিনি আপনাকে প্রদত্ত অঙ্গীকার নিশ্চয়ই বাস্ত্মবায়ন করবেন।

আবু হামেদ গায্যালী বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর প্রথম হাল ছিলো পরিপূর্ণ হাল। তাই এ বিষয়ে কেউ যেনো এরকম সন্দেহকে প্রশ্রয় না দেয় যে, তিনি আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক কৃত অঙ্গীকারের উপর আস্থাশীল ছিলেন না। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রসুলেপাক স. এর পূর্বে আল্লাহ্র প্রতি আস্থাবান হয়েছিলেন— এমনটিও ঠিক নয়। রসুলেপাক স. এর দৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার অসীম প্রশস্ড এলেম এবং আদবের মাকামে নিবদ্ধ ছিলো। হকের সিফতের মারেফাত এবং হাকীকতের দর্শনে এ মাকামই সর্বোন্নত ও সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের দৃষ্টি ছিলো শরীয়তের প্রকাশ্য বিধানের উপর। কেননা আল্লাহ্তায়ালার কৃত ওয়াদা সত্য— এটাই শরীয়তের অবশ্যমান্য বিধান। আল্লাহ্তায়ালা উহুদ, আহযাব, হুনাইনের যুদ্ধ ও মক্কাবিজয়ের ব্যাপারেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে এ সকল ক্ষেত্রেও শর্তাবলী রাখা হয়েছিলো গোপন। এরকম দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থার মধ্যেও বিদ্যমান, যা বালা-মুসিবত নাযিল হওয়া এবং দ্বীনের

দুশমনদের সঙ্গে জেহাদ করার ব্যাপারে এসেছে। সেগুলোর মধ্যেও ছিলো রহস্য ও হেকমত।

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন উভয় দল মুখোমুখি হলো, তখন রসুলেপাক স. এক মুষ্টি বালি হাতে নিয়ে কাফেরদের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। 'শাহাতিল উজুহ' দোয়া পাঠ করলেন। একজন কাফেরও বাকী রইলো না, যার চোখে এবং নাকের ছিদ্রের ভিতর বালুকণা পতিত হলো না। তাদের সারা মুখ বালুতে ভরে গেলো এবং তারা পরাজিত হয়ে সেখান থেকে সকলেই পালাতে শুরু করলো। তারপর আল্লাহ্তায়ালা কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে কাউকে ধ্বংস করে দিলেন। আবার কাউকে করিয়ে দিলেন বন্দী। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' রচয়িতা বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার বাণী 'ওমা রমাইতা ইজ রমাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রমা' (এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন) (৮ঃ১৭)। বদর যুদ্ধের দিনই রসুলেপাক স. এভাবে মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন। উদ্ধৃত আয়াতে একথারই ইঙ্গিত এসেছে। তিনি স. হুনাইনের যুদ্ধের সময়ও এরূপ করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে একদল লোক বান্দার উপর থেকে কাজের ক্ষমতা রহিত করা হয়েছে বলে মনে করে থাকে। তাদের মতে সকল কাজের সম্বন্ধ কেবলই আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে। জাবরিয়া সম্প্রদায় তাদের মতের সপক্ষে এই দলিলটিই উপস্থাপন করে থাকে। তারা বলে, কার্যসমূহের সম্বন্ধ ও ক্ষমতা বান্দার দিকে করা ঠিক নয়। তাদের অভিমতটি ভ্রান্ত। তারা কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেনি। উপরোক্ত আয়াতের মতো করে যদি বলা হয় 'আপনি যখন নামাজ পড়েছেন তখন আপনি পড়েননি, বরং আল্লাহ্ নামাজ পড়েছেন'। 'আপনি যখন রোজা রেখেছেন তখন আপনি রোজা রাখেননি, বরং আল্লাহ্ রোজা রেখেছেন'— সকল ইবাদত ও গোনাহর কাজ তো তাহলে আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধিত হবে। সুতরাং তাদের মত সর্বতোরূপে ভ্রষ্ট। আবার এখানকার মাটি নিক্ষেপের কাজটিকে যদি শুধু রসুল স. এর প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়, তবুও তা হবে ভুল। কেননা মোজেজা নবী স. এর কাজ নয়; বরং আল্লাহ্র কাজ, যা আল্লাহ্তায়ালা প্রকাশ ঘটান তাঁর নবীর মাধ্যমে। কিন্তু অন্যান্য কাজ এর বিপরীত। অন্য সকল কাজের বাস্তবায়নকারী বান্দাগণ। তবে আল্লাহ্তায়ালা হচ্ছেন সকল কাজের স্রষ্টা। কিন্তু মোজেজার সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন কোনোটিই বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কাজেই উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হবে— আপনি যখন মাটি নিক্ষেপ করেছেন, বাহ্যিকভাবে তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেছেন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নিক্ষেপ করেছেন আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং। কেউ কেউ

কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মাটি নিক্ষেপ করার প্রাথমিক কাজটি আপনিই করেছেন, কিন্তু শেষ কাজ অর্থাৎ কাফেরদের চোখে মুখে তা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করেছেন আল্লাহ্তায়ালা। এরকম দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফালাম তাক্বতুলুহুম ওয়ালা কিন্নাল্লাহা ক্বাতালাহুম' (তোমরা তাহাদিগকে বধ কর নাই, আল্লাহ্ই তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন) (৮ঃ১৭)। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত উকাশার হাতের তরবারী ভেঙে গেলো। তিনি রসুল স. সকাশে হাজির হলেন। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর হাতে একটি লাকড়ি তুলে দিয়ে বললেন, এটা দিয়েই যুদ্ধ করো। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লাকড়িটি হজরত উকাশার হাতে লম্বা ও শক্ত লোহার তরবারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। তিনি তা দিয়েই যুদ্ধ করলেন এবং মুসলমানদের বিজয় হলো। হজরত উকাশা ওই তরবারীর নাম রেখেছিলেন 'আ'উন'। সব সময় ওই তরবারী তাঁর হাতে শোভা পেতো। বাকী জীবন তিনি ওই তরবারী দিয়েই যুদ্ধ করেছেন। পরে এক যুদ্ধে যখন তিনি শহীদ হলেন, তখনও দেখা গেলো, মুষ্টিবদ্ধ করে তলোয়ারটিকে তিনি ধরে রেখেছেন।

ফেরেশতাদের আগমন

ফেরেশতাদের আগমন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণই বদর যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' প্রণেতা বলেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেন, বদর যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধেই ফেরেশতারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি। অন্যান্য যুদ্ধে তাঁরা ছিলেন মুসলমানদের পরোক্ষ সহায়তাকারী। এমাদ ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রসিদ্ধ কথা এটাই যে, বদর যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো সময় ফেরেশতারা যুদ্ধ করেননি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বদর ছাড়া ফেরেশতারা আর কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। ইবনে মারযুকও এরকমই বলেছেন। এব্যাপারে একটি পছন্দনীয় মত রয়েছে এরকম— অন্যান্য সময় ফেরেশতারা যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির ছিলেন। ওই মতটিকে কোনো কোনো আলেম প্রাধান্য দিয়ে 'নেহায়তুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন' কিতাবে 'ওয়া ইয়াওমা হুনাইন' আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, হুনাইনের যুদ্ধে ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এবিষয়ে দু'রকম অভিমত রয়েছে। জমহুরের মত হচ্ছে, ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেননি। এ মতটিকে খণ্ডন করে দেওয়া হয়েছে ইমাম মুসলিমের ওই হাদিসের মাধ্যমে, যা তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে। যেমন হজরত সাআদ বলেছেন, আমি উহুদ

যুদ্ধের দিন রসুলেপাক স. এর ডান ও বাম দিকে এমন দু'জন ব্যক্তিকে দেখেছি, যাঁরা ছিলেন শুভ্র বস্ত্র পরিহিত। ওই ঘটনার আগে বা পরে আমি তাঁদেরকে কখনও দেখিনি। তাঁরা ছিলেন হজরত জিবরাইল ও হজরত মিকাইল। তাঁরা দু'জন সেদিন সাংঘাতিকভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ইমাম নববী সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, এই হাদিসে প্রকাশ পেয়েছে রসুল স. এর বিশেষ মর্যাদা। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্যই সেদিন তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। এ বিষয়ে প্রকাশ্য কথা এই যে, ফেরেশতাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিষয়টি কেবল বদর যুদ্ধের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিলো না। ইমাম নববী বলেন, এই মতটিই যথার্থ ও সত্য। সুতরাং ফেরেশতাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ বদরের সঙ্গেই খাস বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা ঠিক নয়।

ফেরেশতা দর্শন

উপরোক্ত হাদিসসমূহের মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতা দর্শন কেবল নবীগণের জন্য খাস নয়। বরং সাহাবাকেরাম ও আউলিয়াকেরামের ক্ষেত্রেও ফেরেশতাদর্শন ঘটে। বান্দা মিসকীন (মাদারেজুন নবুওয়াত গ্রন্থকার) বলেন, হজরত জিবরাইল রসুলেপাক স. এর নিকট মানবাকৃতিতে এসেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন। হজরত জিবরাইল রসুলেপাক স.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এ কে ? তিনি স. বলেছিলেন, আমার চাচাতো ভাই। হজরত জিবরাইল বলেছিলেন, সে আমাকে সালাম করেনি কেনো? এ বৈঠক সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর হজরত ইবনে আব্বাস জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার পাশে কে বসে ছিলেন? রসুলেপাক স. বললেন, জিবরাইল। তুমি তাকে সালাম করোনি কেনো? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, তাঁর সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য দেখে আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এই হাদিসের আলোকে বুঝা যায়, যাঁরা নবী নন, তাঁরাও ফেরেশতাদেরকে দেখতে পান। তবে হাঁ, নবীগণ তাঁদেরকে বিশেষ আকৃতিতে দেখতে পান। অন্যরা সেভাবে দেখতে পান না।

বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের যুদ্ধ করা সম্পর্কে আয়াত ও হাদিস

এখন আমি ওই সকল আয়াত ও হাদিস বর্ণনা করবো, যেগুলো বিবৃত হয়েছে বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের যুদ্ধ করা সম্পর্কে। যেমন— আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন 'ইজ তাছতাগীছুনা রব্বাকুম ফাসতাজ্বাবা লাকুম আন্নী মুমিদ্দুকুম বিআলফিম মিনাল মালাইকাতি মুরদিফীনা' (স্মরণ কর, 'তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলে; তিনি উহা কবুল

করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা যাহারা একের পর এক আসিবে) (৮ঃ৯)। সুরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে 'আলাইঁ ইয়াকফিয়াকুম আইঁ ইউমিদ্দাকুম রব্বুকুম বিছালাছাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি মুনযালীন' (ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন?) (৩ঃ১২৪)। প্রথমোক্ত আয়াতে এক হাজার ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে যাঁরা মানুষের সামনে হাজির হয়েছিলেন অগ্রবর্তীবাহিনী হিসেবে। অথবা যারা সরাসরি যুদ্ধ করেছেন, এমন ফেরেশতার সংখ্যা ছিলো এক হাজার। তারা সহ মোট ফেরেশতার সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। তিন হাজারের মধ্যে সকলেই যুদ্ধ করেছিলো কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। কাযী বায়যাবী এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এক হাজারকে তিন হাজারের পাশাপাশি বলা হয়েছে। অর্থাৎ এক হাজারের পরে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিলো। সুতরাং বলা যায়, অল্পসংখ্যককে সাহায্য করেছিলো বেশীসংখ্যক ফেরেশতারা। সুরা আলে ইমরানে আরও বলা হয়েছে 'বালা ইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু ওয়া ইয়া'তূকুম মিন ফাওরিহিম হাজা ইউম্‌দিদ্‌কুম রব্বুকুম বিখাম্‌সাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি মুসাওবিমীন' (হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং সাবধান হইয়া চল তবে তাহারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করিলে আল্লাহ্ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন) (৩ঃ১২৫)। 'মুসাওবিমীন' অর্থ চিহ্নিত। অর্থাৎ তাঁদের ললাটে চকচকে উজ্জ্বল চিহ্ন থাকবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আসলে পাঁচ হাজার ফেরেশতা আগমন করেননি। বরং আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদা ছিলো এরকম— তোমরা যদি সুদৃঢ় থাকো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তারা আসবে এবং তোমাদের বিরোধীদেরকে তারা পরাভূত করবে। আল্লাহ্তায়ালা এভাবে পাঁচ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করবেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে রবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা প্রথমে ওয়াদা দিয়েছেন এক হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করার। তারপর তা তিন হাজার করে দিলেন এবং সর্বশেষে পাঁচ হাজারের কথা বললেন। হজরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা বদর দিবসে পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন। এতে বুঝা যায়, আল্লাহতায়ালার সাহায্য পাঁচ হাজারের দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়েছে। হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, বদর দিবসে এতো প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়েছিলো যে, ইতিপূর্বে কখনও ওরকম হয়নি। এরকম প্রবল হাওয়া প্রবাহিত হয়েছিলো তিনবার। তারপর রসুলেপাক স. বললেন, প্রথমবার জিবরাইল এক হাজার

ফেরেশতা নিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয়বার মিকাইল এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে আগমন করেন। আর তৃতীয় বার ইসরাফীল নিয়ে আসেন এক হাজার ফেরেশতা। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে বনী গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি বলেছেন, বদর দিবসে আমি এবং আমার চাচাতো ভাই বেরিয়ে পড়লাম। উঁচু এক পাহাড়ে উঠে বসলাম আমরা। উদ্দেশ্য ছিলো, যে দলই পরাজিত হয়ে পালাবে, আমরা তাদের মালামাল লুণ্ঠন করবো। সহসা আমরা দেখতে পেলাম, একটি মেঘখণ্ড আমাদের খুব কাছে এসে গেছে। আমরা সেই মেঘখণ্ডের মধ্যে অশ্বচলাচলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আরও শুনতে পেলাম, কে যেনো ডেকে বলছে, আকদিম হায়যুম (সামনে অগ্রসর হও)। তখন আমার চাচাতো ভাই হুমড়ি খেয়ে আমার উপর এসে পড়লো এবং ভয়ে কলিজা ফেটে সে মারা গেলো। আমার অবস্থাও তখন শোচনীয়। বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম। 'হায়যুম' ছিলো জিবরাইলের ঘোড়ার নাম। এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে এরকম— জিবরাইল ও মিকাইল প্রত্যেকে পাঁচশ' করে মোট এক হাজার ফেরেশতা সঙ্গে নিয়ে মানুষের আকৃতি ধরে ঘোড়ার উপর আরোহণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে সময় তাঁদের শরীরে ছিলো শাদা পোশাক এবং মাথায় শাদা পাগড়ি। হুনাইন যুদ্ধের দিন ফেরেশতাদের মাথায় সবুজ পাগড়ি ছিলো। তাঁদের পাগড়ির শামলা দু'কাঁধের মধ্যখানে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, বদর দিবসে ফেরেশতাদের কপালের উপর শাদা পাগড়ি ছিলো, আর হুনাইন দিবসে ছিলো সবুজ পাগড়ি। হজরত আলী থেকে বর্ণিত আছে, বদর দিবসে ফেরেশতাদের কপালের উপর শাদা পশমী পাগড়ি ছিলো এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন অশ্বারোহী। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বদর দিবসে ফেরেশতাদের কপালের উপর কালো পাগড়ি ছিলো, আর হুনাইন দিবসে ছিলো লাল পাগড়ি। বিভিন্ন বিবরণে শাদা, কালো, সবুজ, লাল ও হলুদ বর্ণের পাগড়ির কথাই এসেছে। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হতে পারে যে, বিভিন্ন ফেরেশতার পাগড়ির বর্ণ বিভিন্ন রকম ছিলো। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার গতির আওয়াজ শোনা যেতো। কিন্তু ঘোড়া দৃষ্টিগোচর হতো না। মুসলমানগণ কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হতেই দেখতেন তাদের মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। উলামা কেরাম বলেন, বদর দিবসে ফেরেশতারা কাফেরদের মস্তক এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়ার উপর আঘাত করেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা এ সম্পর্কে বলেছেন 'ফাদ্বরিবু ফাওক্বাল আ'নাক্বি ওয়াদরিবু মিনহুম কুল্লা বানান' (সুতরাং তাহাদের স্কন্ধে ও সর্বাংগে আঘাত কর) (৮ঃ১২)। কথাটির অর্থ করা হয়েছে এভাবে— মস্তকের উপরে মারো। 'বানান' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে 'অঙ্গসন্ধিকে'। অর্থাৎ তাদের প্রতিটি

অঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো। তাফসীরে বায়যাবীতে বলা হয়েছে ‘ফাওকাল আ’নাক’ মানে যবেহ করার স্থান অর্থাৎ গলা এবং মাথায় আঘাত করো। আর ‘ওয়াদরিবু মিনহুম কুল্লা বানানি আয়িল আসাবি’ (তাদের প্রতিটি আঙ্গুলে আঘাত করো) সম্পর্কে তাফসীরে কাশ্‌শাফে বলা হয়েছে, ‘বানান’ অর্থ আওরাফ অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গ। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়— তাদের মস্তক কেটে ফেলো এবং অঙ্গসমূহ ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ফেরেশতাদের দ্বারা যারা নিহত হয়েছিলো, তাদেরকে চেনা যেতো তাদের ঘাড়ে এবং অঙ্গের জোড়ায় কালো দাগ দেখে। অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গিয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক আনসারী ব্যক্তি কোনো এক কাফেরের পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি বেত্রাঘাতের আওয়াজ শুনতে পান। একজন আরোহীর আওয়াজও শুনতে পান। তিনি বলেছেন ‘আকদিম হায়যুম’। পরক্ষণে তিনি দেখলেন, লোকটি তার সামনেই পড়ে রয়েছে। তার মুখ কেটে গিয়েছে। ঘাড় গিয়েছে ভেঙে। তারপর সেই আনসারী রসুলেপাক স. এর কাছে সবকিছু খুলে বললেন। তিনি স. বললেন, এ হচ্ছে আকাশাগত সাহায্য। বর্ণিত হয়েছে, মদীনাবাসীরা যখন বদরযোদ্বাদেরকে স্বাগতম জানালেন, তখন তাঁরা বললেন, তোমরা আমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছো কেনো? এ বিজয় তো আমাদের পেশীশক্তির কারণে আসেনি। আমরা তো দেখেছি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীর দেহ থেকে আপনাআপনি মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে কখন কে তাদেরকে আঘাত করেছে, তা আমরা দেখিনি। কোনো কোনো শত্রুকে দেখতাম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উটের মতো পড়ে আছে। আমরা কেবল তাদের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দিতাম। রসুলেপাক স. এরকম কথা শুনতে পেয়ে বললেন, এরকম যারা করতো, তারা ছিলো ফেরেশতা। তবে একথার অর্থ এরকমও নয় যে, ফেরেশতারাই সব অবিশ্বাসীকে হত্যা করেছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে ফেরেশতারা হত্যা করেছে কিছুসংখ্যককে। অবশিষ্টদেরকে হত্যা করেছেন সাহাবীগণ।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. এর বিজয় এবং অবিশ্বাসীদের মৃত্যুসংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছলো, তখন আবু লাহাব ও অন্যান্যরা বিস্ময় প্রকাশ করলো। রসুলেপাক স. এর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ যখন মক্কায় পৌঁছলো, তখন আবু লাহাব তাকে বললো, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমিই সঠিক খবর বলতে পারবে। আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ বললো, চাচাজান! আমরা যখন মোহাম্মদের সাথীদের মোকাবেলা করলাম, তখন আমরা নির্জীব অবস্থায় ছিলাম। আমরা দেখতে পেলাম, আমাদের হাতিয়ারগুলো আমাদের দেহ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর আমাদের হাতগুলোকে কাঁধের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়েছে।

আমরা সেখানে আসমান ও যমীনের মাঝে শাদা পোশাক পরিহিত অনেক লোক দেখতে পেয়েছি। ওরা আরোহণ করেছিলো ধূসর বর্ণের অশ্বের উপর। কেউ তাদেরকে পরাস্ত করতে পারেনি। হজরত আব্বাসের ক্রীতদাস আবু রাফে বর্ণনা করেন, আমি তখন বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! ওরা ফেরেশতা ছিলো। এসব কথা শুনে আবু লাহাব রোষান্বিত হলো। আমার মুখের উপর ঘুষি মারলো। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। তখন সে আমার বুকের উপর লাথি মারতে লাগলো। আমি ছিলাম দুর্বল। তাই তাকে প্রতিহত করতে পারিনি। হজরত ইবনে আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফযল আমার এ অবস্থা দেখে একটি শক্ত কাঠ নিয়ে আবু লাহাবের মস্তকে আঘাত করলো। তখন সে অপমানিত হয়ে ঘরে ফিরে গেলো। সাতদিন পর আবু লাহাব আদসা নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আরবের লোকেরা এ রোগটিকে আসমানী বালা বলে মনে করতো। তাই মৃত্যুর ভয়ে কেউ আবু লাহাবের কাছে গেলো না। তিনদিন ধরে তার লাশ সৎকারহীন অবস্থায় পড়ে থাকলো। তারপর ভাড়া করা লোক দিয়ে তার লাশ সরানো হলো। তারা তার লাশ মক্কার বাইরে নিয়ে গিয়ে একস্থানে গর্ত খনন করে তার মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে রাখলো। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে শায়খ তকিউদ্দীন সবকী থেকে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি একবার আমাকে এই মর্মে প্রশ্ন করে বসলো যে, রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ফেরেশতারা মিলিত হয়ে যে যুদ্ধ করেছিলো, তার পিছনে হেকমত কী ছিলো? অথচ এর জন্য জিবরাইল তো একাই যথেষ্ট ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে সমগ্র ভূখণ্ডকে তার হাতে তুলে নিয়ে সকল শত্রুকে হালাক করে দিতে পারতেন। আমি বললাম, কাজটি তো ছিলো রসুলেপাক স. এবং তাঁর সাহাবীগণের। ফেরেশতারা ছিলেন সাহায্যকারী। তাই ভূপৃষ্ঠে ফেরেশতারা সাহায্যকারী বাহিনী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বান্দা মিসকীন (মাদারেজুন নবুওয়াত গ্রন্থকার) বলেন, এরকম প্রশ্নের অবতারণা করতে পারে সাধারণ জনতা, যারা আল্লাহ্‌তায়ালার ব্যবস্থাপনা, সামান-সরঞ্জামের ক্রমবিন্যাস ও তাঁর পরিপূর্ণ হেকমতের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে অক্ষম। অন্যথায় তারা তো এমনও প্রশ্ন করতে পারতো যে, রসুলেপাক স. এর জেহাদ ও কেতাল করারই বা প্রয়োজন কী ছিলো? আল্লাহ্‌তায়ালাই তো তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। অথবা তাদেরকে এক মুহূর্তে করে দিতে পারেন ইমানদার। এরকম করলে যুদ্ধের প্রয়োজনই আর পড়ে না। কিন্তু তিনি এমন করেননি। কারণ, মুসলমানদের পুরস্কৃত করা এবং কাফেরদেরকে তিরস্কৃত করা তো দুনিয়ার আমলের উপরই নির্ভরশীল। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

নিহত ও বন্দীদের সংখ্যা

বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের সংখ্যা ছিলো সত্তুর। আর বন্দীদের সংখ্যাও ছিলো অনুরূপ। শহীদ সাহাবীর সংখ্যা চৌদ্দ। ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার। আনসারদের মধ্যে আবার ছয়জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং অবশিষ্ট দু'জন আউস গোত্রের। রসুলেপাক স. কুরায়েশদের নিহত সত্তুরটি লাশের মধ্যে চব্বিশটিকে বদরের একটি কূপে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কূপটিতে ওই এলাকার ময়লা-আবর্জনা ও নাপাক বস্তু ফেলা হতো।

রসুলেপাক স. এর স্বভাব ছিলো, কোথাও মুসলিমবাহিনী বিজয়ী হলে তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করতেন। এখানেও তিনি তিনদিন অবস্থান করলেন। তৃতীয় দিন তিনি তাঁর সওয়ারী প্রস্তুত করতে বললেন। সজ্জিত সওয়ারী আনা হলে তিনি তার উপর আরোহণ করলেন। সাহাবাকেরামের একটি দলও তাঁর সঙ্গী হলেন। তাঁরা মনে করছিলেন সম্ভবতঃ তিনি স. কোনো কাজে নিকটেই কোথাও যাচ্ছেন। চলতে চলতে অবশেষে তিনি স. সেই কূপের নিকটে উপস্থিত হলেন, যেখানে কাফেরদের লাশ ফেলে দেওয়া হয়েছিলো। তিনি তাদের একেকজনের নাম ধরে ডাক দিলেন। বললেন, হে ওমুকের পুত্র ওমুক! কোনো কোনো বর্ণনায় আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, তিনি ডাক দিলেন এভাবে— হে উতবা ইবনে রবীয়া! হে শায়বা ইবনে রবীয়া! হে আবু জাহেল ইবনে হেশাম! তোমরা কি এখন খুশি হয়েছো? তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করতে (তাহলে কি ভালো হতো না?)। এখন যে পর্দা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ্র আযাব দেখতে পাচ্ছো। এখন কি তোমাদের ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা হচ্ছে? তিনি পুনরায় বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তার সত্যতা চাক্ষুস করেছি। হকতায়ালা তোমাদিগকে যে আযাবের ভয় দেখিয়েছিলেন, তা কি তোমরা এখন অবলোকন করছো? অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কূপের মধ্যে পড়ে থাকা লোকদেরকে লক্ষ্য করে রসুলেপাক স. বললেন, তোমাদের কী মন্দ পরিণামই না হলো। তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে, আর অন্য লোকেরা আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি ওই দেহগুলোর সঙ্গে কথা বলছেন, যার মধ্যে আত্মা নেই। রসুলেপাক স. বললেন, শপথ ওই আল্লাহ্র! যার কুদরতী হস্তে আমার জীবন, তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শ্রবণকারী নও! আমার কথা তারা ঠিকই শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু উত্তর দিতে পারছে না।

মৃতদের শ্রবণ, জ্ঞান ও অনুভূতি

মনে রাখতে হবে যে, উপরে বর্ণিত হাদিসটি সহীহ্ এবং মুত্তাফাক আলাই, অর্থাৎ বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত। মৃতরা শুনতে পায়, জানতে পারে এবং

কোনো কিছু অনুভবও করতে পারে বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ এই হাদিসে রয়েছে। সহীহ্ মুসলিম কিতাবেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন— মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে দাফনকারীরা যখন ফিরে আসে, তখন মৃতব্যক্তি তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। জান্নাতুল বাকী যিয়ারতকালে রসুলেপাক স. বলেছিলেন, তোমরা কবরবাসীদেরকে সালাম কোরো। তাদেরকে সম্বোধন করে বোলো, হে কবরে বসবাসকারী লোকেরা! তোমাদের উপর সালাম। হে কবরের জনতা! তোমাদেরকে যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো, সবই তোমরা পেয়েছো। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্র আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো।

শায়েখ ইবনুল হেশাম তাঁর 'শরহে হেদায়া' গ্রন্থে বলেছেন, পূর্ববর্তী মাশায়েখদের অধিকাংশের অভিমত এই যে, মৃতরা কিছুই শুনতে পায় না। তিনি 'কিতাবুল ঈমানে' এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি এরূপ কসম করে যে, আমি ওমুক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবো না, তারপর সে যদি উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সঙ্গে কথা বলে, তাহলে সে কসমভঙ্গকারী হবে না। কেননা কসম সংঘটিত হয় এমন ব্যক্তির সঙ্গে, বুঝা বা অনুভব করার মতো যার ক্ষমতা আছে। মৃতরা এরকম নয়। এ সকল আলেম মুসলিম শরীফের বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন এভাবে— মৃতরা যে মানুষের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় কেবল তাদেরকে কবরের মধ্যে রাখার সময়। আর তা মুনকির নকীরের প্রশ্ন করার পূর্বাভাষ। তাঁদের এমতো ব্যাখ্যা হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের পরিপন্থী। তাঁদের এরূপ মন্তব্যের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। প্রকাশ্য অর্থ তো এটাই যে, উপরোক্ত অবস্থা যে মৃত, তার জন্যই অবধারিত। মৃতদেরকে সে সময় জীবিত করা, প্রশ্ন করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি— এ সব কথার মানে আবার কী? এমতো আপত্তির জবাবে তারা আবার বলেন, হাদিসে বর্ণিত অবস্থা কেবল রসুলেপাক স. এর জন্যই বিশিষ্ট ছিলো। আর তা ছিলো রসুলেপাক স. এর মোজেজা। যেমন হজরত কাতাদা বলেছেন, রসুলেপাক স. এর কথা শোনার জন্য যুদ্ধে নিহতদেরকে আল্লাহ্তায়ালা জীবিত করে দিয়েছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা ধারণাপ্রসুত ও সম্ভাব্য। সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এরকম কথা গ্রহণ করা যায় না। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা মৃতকে শ্রবণশক্তি দানে সম্পূর্ণ সক্ষম। তিনি কোনো কারণ ছাড়াই উক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। মাযহাবের বিভিন্ন কিতাবে এ স্বীকৃত নীতিটির উল্লেখ রয়েছে। মৃতদের শ্রবণ বিষয়টিকে যারা অস্বীকার করেন, তারা কখনও কখনও এরকমও বলে থাকেন যে, সেটি একটি কথার কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে যা ঘটে না। এরকম কথা পূর্বোক্ত বক্তব্যের চেয়ে আরো অধিক অগ্রহণযোগ্য। যারা অস্বীকারকারী, তাদের সন্দেহসমূহের মধ্যে এটিও একটি সুদৃঢ় সন্দেহ। এই হাদিসটি যখন হজরত ওমর

কর্তৃক বর্ণিত হলো, তখন লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করলো, রসুলুল্লাহ্ এমন কথা কীভাবে বললেন? আল্লাহ্তায়ালা তো বলেছেনই ‘ফাইন্নাকা লা তাসমাউ’ল মাওতা ওলা তুসমিউ’স সুম্মাদ দুআ’আ ইয়া ওয়াল্লাও মুদ্বিরীন’ তুমি তো মৃতকে শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না আহবান শুনাইতে, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়) (৩০ঃ৫২)। হজরত আয়েশা সিদ্দীকাও মৃতদের শ্রবণ যোগ্যতার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি দলিল গ্রহণ করেছেন উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে। কিন্তু অন্যরা হজরত আয়েশা সিদ্দীকার এমতো দলিল গ্রহণ করেননি। ‘মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া’ কিতাবে ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা জ্ঞান, বুদ্ধি ও অধিক রেওয়ায়েতের অধিকারিণী ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি এর চেয়ে অধিক আর কিছু জানতেন না। সুতরাং কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা খণ্ডন করতে হলে নস্ ব্যতীত আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। যেমন হজরত ওমরের বিবরণটিকে খণ্ডন করতে হলে এমন নস্ এর প্রয়োজন, যা বিশেষ অর্থমণ্ডিত। তাছাড়া উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের অর্থ এমনও তো হতে পারে যে, আপনি শোনাতে পারবেন না, শোনাতে পারেন আল্লাহ্। কবরবাসীগণকে শোনার শক্তি তাই আল্লাহ্রই দেওয়া। আবার শ্রবণ করাতে না পারার অর্থ এও হতে পারে যে, আপনি তাদেরকে হক কবুল করাতে পারবেন না। কাফেরদেরকে ইমানের দাওয়াত প্রদান করা এবং তাদের হক গ্রহণ না করার বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত দু’টি নাযিল হয়েছিলো। তাছাড়া উলামা কেরাম বলেন, আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত ‘মাওতার’ অর্থ কাফেরদের অন্তর। আর ‘কুবুর’ অর্থ তাদের দেহ, যে দেহের অভ্যন্তরে তাদের অন্তর মৃত অবস্থায় আছে। ‘মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া’য় উল্লেখ করা হয়েছে, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ‘মাগাযী’ অধ্যায়ে উত্তম সনদের মাধ্যমে এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হাসান সনদের মাধ্যমে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাই এরকমও বলা যায় যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা তাঁর ওই মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর তাঁর প্রত্যাবর্তনের কারণ এটাই যে, প্রবীন সাহাবীগণ তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। মুসলিম শরীফের শরাহ গ্রন্থেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা, মৃতদেরকে শ্রবণ করানো এবং তাদের এলেম ও অনুভূতি সম্পর্কে বহু খবর ও আছার রয়েছে। তাই এর বিরুদ্ধে কোনো দলিলই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে মেশকাত শরীফের শরাহ গ্রন্থে। ওয়াল্লাহু আ’লাম।

রসুলেপাক স. যখন মুশরিকদের লাশসমূহ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবীগণ উতবা ইবনে রবীয়ার লাশ ধূলা বালি থেকে বের করে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তার পুত্র হজরত আবু হুযায়ফা তাঁর পিতার

এহেন অবস্থা দেখে মনোক্ষুণ্ন হলেন। অপছন্দের ভাবটি তাঁর চেহারায় ফুটে উঠলো। রসুলেপাক স. তাঁর চেহারার বিবর্ণভাব লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু হুযায়ফা! পিতার অবস্থা দেখে সম্ভবতঃ তোমার মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। হজরত আবু হুযায়ফা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার ইসলামে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি। তবে আমার পিতা একজন জ্ঞানী, ধীরমতি এবং শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আমার আশা ছিলো যে, এহেন সদগুণাবলী তাঁকে ইসলাম ধর্মে নিয়ে আসবে। এখন দেখছি তিনি এ সৌভাগ্য থেকে চিরবঞ্চিত। একথা ভেবেই আমি চিন্তিত হয়েছি। দুঃখ পেয়েছি। রসুলুল্লাহ্‌ স. হজরত আবু হুযায়ফার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। এই হাদিস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সৎস্বভাব ও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কারো মধ্যে থাকলে সে ইসলাম গ্রহণ করবেই— এমন নয়। ইমান লাভ হয় কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার হেদায়েত ও অনুগ্রহের মাধ্যমেই। হাদিসের মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে, স্বাভাবিকভাবে কারো অবয়বে কোনো অপছন্দনীয়ভাব পরিলক্ষিত হওয়া, যার উপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই, তা কোনো ধর্তব্য বিষয়ও নয়, যদি অন্তর সঠিক বিষয়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। সবর, রেজা ও তাসলিমের ভিত্তিও এ বিধানের অন্তর্গত। রসুলে আকরম স. এর সত্যাধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীগণ কী পরিমাণ আস্থাশীল ছিলেন, তার আন্দাজও এই হাদিসের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সদ্‌গুণসম্পন্ন পিতার দুরাবস্থা দেখে হজরত আবু হুযায়ফা চিন্তিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এতটুকুও সত্যচ্যুত হননি। রসুলেপাক স. সকাশে তাই তিনি তাঁর যথাঅবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান করেছিলেন। নির্ভেজাল সত্য তাঁর সামনে ছিলো সমুদ্ভাসিত এবং সেটি পৌঁছে গিয়েছিলো একীনের স্তরে।

জীবনপঞ্জিবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. সাহাবাকেরামকে এই মর্মে উপদেশ দিলেন যে, তোমাদের জেনে রাখা উচিত, বনী হাশেমের একটি দলকে বলপূর্বক বদরের যুদ্ধে নিয়ে আসা হয়েছে। যারা এধরনের বনী হাশেমের লোককে, বিশেষ করে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে ময়দানে পাবে, তারা যেনো তাকে হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে। তখন আবু হুযায়ফা, যিনি উতবা ইবনে রবীয়ার পুত্র ছিলেন, তিনি বললেন, আমরা আমাদের পিতা ও ভ্রাতাকে হত্যা করেছি। সুতরাং আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে ছেড়ে দেবো কেনো? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তার কাছে পৌঁছতে পারলে অবশ্যই তার গর্দানে তরবারী বসাবো। রসুলেপাক স. একথা শুনতে পেয়ে হজরত ওমরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু হাফস! তুমি কি আবু হুযায়ফার কথা শুনেছো? তিনি স. এই প্রথম হজরত ওমরকে তাঁর কুনিয়াতী নাম ধরে ডাকলেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। সে তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। হজরত আবু হুযায়ফা বলেন, ওমরের ওই কথা শোনার

সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপে ও ভয়ে আমার শরীর কাঁপতে শুরু করলো। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, আমার এই পাপের ক্ষতিপূরণ কেবল এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদত বরণ করা। তাঁর এ অভিলাষ অবশেষে পূর্ণ হয়েছিলো। ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন তিনি।

যুদ্ধবন্দী

বদরের যুদ্ধবন্দীদের সংখ্যা ছিলো তাদের নিহতদের সংখ্যার অনুরূপ। অর্থাৎ সত্তুর জন কুরায়েশকে এ যুদ্ধে বন্দী করা হয়েছিলো। তাদের মধ্যে রসুল স. এর চাচা হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন। ছিলেন আকীল ইবনে আবু তালিব। তিনি ছিলেন রসুল স. এর চাচাতো ভাই। আরেক চাচাতো ভাই নওফেল ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন বন্দী। তাঁরা সকলেই পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ওই সত্তুর জন যুদ্ধবন্দীর মধ্যে কে কে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং কে কে কুফরীর উপরই রয়ে গিয়েছিলো, তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এ মুহূর্তে তাদের সকলের নামও আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

বর্ণিত হয়েছে, যখন কয়েদীদের গলায় বেড়ি এবং পায়ে শিকল লাগিয়ে রসুলেপাক স. এর নিকটে হাজির করা হলো, তখন তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এদের জন্য কী বিস্ময়কর অবস্থা সৃষ্টি করেছেন! এদেরকে বেড়ি ও শিকল পরিয়ে জান্নাতের দিকে টানা হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে, এরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুসলমান হতে চাচ্ছে না এবং বেহেশতেও যেতে চাচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা এদেরকে জোর করে বেঁধে সেধে আপন দরবারে নিয়ে এসেছেন বেহেশতে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে। এমনই বিধান শরিয়তের বাধ্যবাধকতার মধ্যে। আল্লাহ্‌তায়ালা বান্দাদেরকে মুকাল্লাফ (শরিয়তের ভারোত্তলনকারী) করে বন্দী করে ফেলেছেন। আর এভাবেই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেন।

জীবনপঞ্জিবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আব্বাস পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিষয়টিকে গোপন রেখেছিলেন। বদর দিবসে তিনি অবশ্য মুশরিকদের সঙ্গেই মক্কা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. বলেছিলেন, আব্বাস যার সামনেই পড়বেন, তার উচিত হবে তাঁকে হত্যা না করা। কারণ, তাঁকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এ যুদ্ধে নিয়ে আসা হয়েছে। যখন তাঁকে ফিদ্‌য়া আদায়ের জন্য দাঁড় করানো হলো, তখন তিনি বললেন, আমাকে তো জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, কিন্তু আপনি তো প্রকাশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কাজেই আপনাকে অবশ্যই ফিদয়া দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি বদর যুদ্ধের দিনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবওয়া বিজয়ের দিন তিনি

রসুলেপাক স.কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আর মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই হিজরতের ধারাবাহিকতার অবসান ঘটানো হয়েছিলো। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি খায়বর বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বিষয়টি তিনি তখন পর্যন্ত গোপনই রেখেছিলেন। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি তা প্রকাশ করেন। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণ বদর যুদ্ধের পুর্বেই হয়েছিলো। তিনি মক্কায় অবস্থান করে সেখানকার মুশরিকদের অবস্থা জানিয়ে রসুলেপাক স. এর নিকট পত্র প্রেরণ করতেন। তিনি রসুলেপাক স. এর নিকট চলে আসতে চাইতেন। কিন্তু তিনি স. তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আপনার জন্য উত্তম হবে মক্কাতেই অবস্থান করা।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বদর যুদ্ধে আসার সময় মুশরিকবাহিনীর আহারায়োজনের জন্য বিশ আওকিয়া স্বর্ণ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যগণ তাঁর কাছ থেকে ওই স্বর্ণ ছিনিয়ে নেন এবং গনিমতের মালের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাঁর কাছে যখন ফিদ্য়া চাওয়া হলো, তখন তিনি বললেন, ওই বিশ আওকিয়া স্বর্ণ তাঁর ফিদয়া হিসেবে নিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু রসুলেপাক স. তাঁর আবেদন গ্রহণ করেননি। বলেছিলেন, এগুলোতো ওই সম্পদ, যা আপনি নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের সাহায্যার্থে। এখন ওগুলো গনিমত। সুতরাং ওগুলো ফিদ্য়া হিসেবে ধরা যাবে না। হজরত আব্বাস বললেন, এছাড়া আমার তো আর কোনো সম্পদ নেই। তুমি কি চাও, তোমার চাচা মানুষের কাছে হাত পাতুক, আর দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে ফিরুক? রসুলেপাক স. বললেন, আপনি যখন মক্কা থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট যে স্বর্ণভাণ্ডার রেখে এসেছেন, সেগুলো তাহলে কোথায়? হজরত আব্বাস বললেন, তুমি তার খবর কেমন করে জানলে? রসুলেপাক স. বললেন, আমার প্রভুপালক আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হজরত আব্বাস বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্য নবী। একথা তো আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে কলেমা পাঠ করেন 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লল্লাহু ওয়া ইন্নাকা রসুলুল্লাহ্'। বর্ণিত হয়েছে, হজরত আব্বাসকে যে ব্যক্তি বন্দী করেছিলেন, তার নাম ছিলো হজরত আবুল ইয়াসার। তিনি ছিলেন দুর্বল ও খর্বাকৃতির। অপরপক্ষে হজরত আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি। বলা হয়ে থাকে, হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা হজরত আব্বাসের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিলেন। আর হজরত আব্বাস লম্বায় ছিলেন তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিবের কাঁধ পর্যন্ত। লোকেরা হজরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করতো, আপনার মতো দীর্ঘদেহী ও শক্তিশালী ব্যক্তিকে আবুল ইয়াসার কীভাবে বন্দী করলেন? তিনি তো হ্রস্ব ও দুর্বল। আপনি ইচ্ছে করলে তো তাঁকে মুঠির মধ্যে নিয়ে নিতে পারতেন। হজরত

আব্বাস বললেন, তোমরা তোমাদের কথা ঠিকই বলেছো। কিন্তু আমি তো তাকে দেখেছি খন্দমাহ পাহাড়ের সমান। খন্দমাহ মক্কার একটি পাহাড়ের নাম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. আবুল ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি আমার পিতৃব্যকে কীভাবে বন্দী করেছিলে? হজরত আবুল ইয়াসার বলেছিলেন, আমাকে তো এক ব্যক্তি সাহায্য করেছিলেন। তাকে আমি আর কখনও দেখতে পাইনি। তিনি খুব ভয়ানকদর্শন ছিলেন। রসুলেপাক স. বলেছিলেন, তিনি একজন সম্মানিত ফেরেশতা। জীবনালেখ্যপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানগণ বন্দী করে বেঁধে ফেললেন। রাত হলো। শক্তভাবে বাঁধার কারণে হজরত আব্বাস কষ্ট পাচ্ছিলেন। কষ্টের কারণে তিনি কোঁকাচ্ছিলেন। রসুলেপাক স. তার কোঁকানোর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাঁর আর ঘুম এলো না। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি ঘুমাতে পারছেন না কেনো? তিনি স. বললেন, আমার চাচাজান কোঁকাচ্ছেন। কী করে ঘুমাই? আনসারগণ বুঝতে পারলেন, হজরত আব্বাসের বন্ধন শিথিল করে দিলে রসুলুল্লাহ্ স. খুশি হবেন। তখন তাঁরা তাঁর বাঁধন হাল্‌কা করে দিলেন। হজরত আব্বাস ঘুমিয়ে পড়লেন। রসুলেপাক স. বললেন, ব্যাপার কী! তাঁর কোঁকানোর শব্দ যে আর শুনতে পাচ্ছি না? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাঁর বাঁধন হাল্‌কা করে দেওয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, সকল বন্দীর বন্ধন শিথিল করে দাও। রসুলেপাক স. সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌র হুকুমের পাবন্দী করতেন। কোনো কাজ করা না করা, কোনো বিষয়ে নম্রতা বা কঠোরতা প্রদর্শন, কারও উপর বলপ্রয়োগ করা, বা ক্ষমা করে দেওয়া, অথবা কাউকে শাস্তি প্রদান ইত্যাদি কোনো কিছুই তিনি স. আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত করতেন না। নিজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির চাহিদাকে তিনি কখনোই প্রশ্রয় দিতেন না। যা কিছুই ঘটতো তাকেই তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নির্ধারণ এবং বিধান বলে জানতেন। আল্লাহ্‌র হুকুম যে দিকে হতো, তিনি সেদিকেই ধাবিত হতেন।

জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবা কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। প্রথমে তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের মতামত জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এদের কাছ থেকে ফিদ্‌য়া নিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত, নাকি এদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত? হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাদেরকে হত্যা না করার পরামর্শ দিলেন। বললেন, হতে পারে, আল্লাহ্‌তায়ালা এদেরকে তওবার সুযোগ দান করবেন এবং তারা ইসলামে দীক্ষিত হবে। তিনি আরও বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এদের কাছ থেকে ফিদ্‌য়া গ্রহণ করা উচিত। এতে করে আপনার সাহাবীগণের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এর পর রসুলেপাক স. হজরত ওমর ফারুকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। বললেন, ওমর!

তুমি কী বলো? হজরত ওমর ফারুক বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এদেরকে কতল করে দেওয়াই সমীচীন। এদের মস্তক উড়িয়ে দেওয়া দরকার। কেননা এরা সকলেই কাফের এবং কাফেরদের নেতৃস্থানীয়। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে তো সম্পদের মুখাপেক্ষী করেননি। আমার ওমুক নিকটাত্মীয়কে আমার কাছে সমর্পণ করা হোক। আকীলকে দেওয়া হোক আলীর কাছে। আব্বাসকে হজরত হামযার কাছে, যেনো আমরা স্বহস্তে আমাদের আপনজনদের মস্তক উড়িয়ে দিতে পারি। রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো কোনো মানুষের অন্তর মাখনের চেয়েও নরম বানিয়েছেন। আবার কোনো কোনো মানুষের অন্তরকে করে দিয়েছেন পাথরের চেয়েও কঠিন। হে আবু বকর! তোমার অবস্থা নবী ইব্রাহীমের মতো। তিনি বলেছিলেন, 'ফামান তাবিআ'নী ফাইন্নাহু মিন্‌নী ওমান আ'সানী ফাইন্নাকা গাফুরুর রহীম' (যে আমার অনুসরণ করবে সে আমারই দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, (হে আল্লাহ্) তুমি তো (তার জন্য) ক্ষমাশীল ও দয়াময়)। হজরত ওমরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওমর! তোমার অবস্থা হচ্ছে নবী নুহের মতো। তিনি বলেছিলেন, 'লা তাজার আ'লাল আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দায়ইয়ারান' (হে আল্লাহ্! কোনো কাফেরকেই এ ভূখণ্ডে অবশিষ্ট রেখো না)।

তারপর এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ হলো— হে আমার হাবীব! আপনার সাহাবীগণকে এ শর্তের উপর অবকাশ দিন যে, তারা বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে ফিদ্‌য়ার বিনিময়ে ছেড়ে দিতে পারবে। তবে আগামী বৎসর এ সত্তুর জন বন্দীর পরিবর্তে তাদের সত্তুরজনকে শাহাদত বরণ করতে হবে। সাহাবীগণ এটাই মেনে নিলেন। বাস্তবে তাই ঘটলো। পরবর্তী বৎসরে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং যুদ্ধে শহীদ হলেন সত্তুর জন সাহাবী। ওই শহীদগণের মধ্যে ছিলেন হজরত হামযা এবং হজরত মুসআব ইবনে ওমায়েরও। রসুলেপাক স. এর সাহাবীগণ যখন ফিদ্‌য়া গ্রহণ করার কাজে মশগুল ছিলেন সেই মুহূর্তে হজরত জিবরাইল এই প্রত্যাদেশসহ অবতীর্ণ হলেন— 'মা কানা লিনাবিয়্যিন আইঁইয়াকূনা লাহু আস্‌রা হাত্তা ইউছখিনা ফিল আরদ্বি তুরিদুনা আ'রাদ্বাদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল্লাহু ইউরীদুল আখিরাতা ওয়াল্লাহু আ'যিযুন হাকীম' (দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্স্লদ এবং আল্লাহ্ চাহেন পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়) (৮:৩৭)। একথার অর্থ— নবীর দরবারে কয়েদী থাকা ঠিক নয়। তাদেরকে হত্যা করাই সমীচীন। হে মুসলমানগণ! তোমরা চাচ্ছো ফিদ্‌য়া গ্রহণ করে পার্থিবতাকে স্বচ্ছল রাখতে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা চান, তোমাদের আখেরাত হোক অধিকতর স্বচ্ছল ও উজ্জ্বল। আল্লাহ্‌তায়ালা চিরবিজয়ী। তিনিই তাঁর বন্ধুদেরকে

তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করেন। তিনি মহাজ্ঞানী। সব সময় ও সর্বাবস্থায় যা সমীচীন, সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। হত্যার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তখন, যখন তাদের শক্তিসামর্থ্য বেশী থাকে। কখনও হত্যা করা বা ফিদ্য়া নেওয়ার মধ্যে তাদেরকে স্বাধীনতাদান করেন। আবার কখনও ইহ্সান ও ফিদ্য়ার মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলেন। যখন মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় হয়, তখন আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ আসে এভাবে— 'ফাইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইম্মা ফিদাআন'।

উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত ওমর রসুলেপাক স. এর কাছে এসে দেখেন, তাঁরা দু'জনে কাঁদছেন। তিনি তখন বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনারা কাঁদছেন কেনো? দয়া করে আমাকে আপনার কান্নার কারণ জানান। আমার যদি কান্না আসে তাহলে আমিও কাঁদবো। কান্না না এলে ক্রন্দনের চেষ্টা তো করতে পারবো। রসুলে আকরম স. বললেন, আমি কাঁদছি আমার সহচরগণের সিদ্ধান্তের কারণে। তারা ফিদ্য়া গ্রহণ করাকেই বেছে নিয়েছে। তাদের উপর আপতিত আযাব আমি এমনভাবে প্রত্যক্ষ করছি, যেমন প্রত্যক্ষ করছি কাছের এই গাছটিকে। রসুলেপাক স. তাঁর নিকটস্থ একটি গাছের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তখন বললেন, আযাব আপতিত হলে ওমর ও সাআদ ইবনে মুআয ব্যতীত কেউ-ই পরিত্রাণ পেতো না। উলামাকেরাম বলেছেন, সাহাবাকেরাম তখন ওরকম করেছিলেন বদরের যুদ্ধবন্দীদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের আগ্রহের কারণে। তাঁরা মনে মনে চাচ্ছিলেন, বন্দীরা যেনো মুসলমান হয়ে যায়। অথবা তার কারণ এমনও হতে পারে যে, নিকটাত্মীয় বা প্রিয়জন হওয়ার কারণে তাদের প্রতি যেনো বিনম্র আচরণ করা হয়, এমতো প্রত্যাশাও তাঁরা তখন করেছিলেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন— 'লাওলা কিতাবুম মিনাল্লাহি সাবাক্বা লামাস্সাকুম ফীমা আখাজ্তুম আ'জাবুন আ'জীম' (আল্লাহ্র পুর্ব বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত) (৮ঃ৬৮)। একথার অর্থ— লওহে মাহফুজে যদি আমার বিধানটি পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ না থাকতো, তবে অবশ্যই ফিদ্য়া গ্রহণের কারণে তোমাদের উপর শাস্তি নেমে আসতো। পূর্ব থেকে নির্ধারিত বিধান অর্থ— ইজতেহাদে কেউ ভুল করলে তাকে শাস্তি পেতে হয় না। অথবা তার মানে হতে পারে— এ হুকুম পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ ছিলো যে, বদরী সাহাবীদের কোনো আযাব হবে না। অথবা সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না দেওয়া পর্যন্ত কোনো সম্প্রদায়কে আযাব দেওয়া হবে না। অথবা লিপিবদ্ধ ছিলো— তোমাদের ফিদয়াগ্রহণ প্রক্রিয়াটি তোমাদের জন্য বৈধ। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন— 'ফাকুলূ মিম্মা গানিম্তুম হালালান ত্বয়্যিবা' (যুদ্ধে যাহা কিছু তোমরা লাভ

করিয়াছ তাহা বৈধ ও উত্তম বলিয়া ভোগ কর) (৮ঃ৬৯)। উল্লেখ্য, ফিদ্য়া গ্রহণ করা না করার বিষয়টি ইজতেহাদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছিলো। ওহীর মাধ্যমে নয়। রসুলেপাক স. কোনো কোনো বিধানের ব্যাপারে নিজেই ইজতেহাদ করতেন। যেমন এই বিষয়ে এবং হজরত মারিয়া কিবতিয়ার বিষয়ে, যেখানে তিনি মধুপান করাকে নিজের জন্য হারাম করতে চেয়েছিলেন। কোনো কোনো সময় তাঁর ইজতেহাদ অসঠিক হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে ওগুলোর উপরে স্থায়ী রাখেননি। সঠিক অবহিতি প্রদান করেছিলেন। সকল নবীর বিধানই এরকম। উলামাকেরাম এরকমই বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে উলামা কেরাম একটি প্রশ্নের অবতারণা করে থাকেন। যেমন— সাহাবীগণকে যখন কতল বা ফিদ্য়া গ্রহণ উভয়টির অবকাশ দেওয়া হলো, তখন তাঁরা ফিদ্য়া গ্রহণ করার ব্যাপারেই একমত হলেন। তাহলে তাদেরকে তিরস্কার করা বা শাস্তির ধমক দেওয়া হলো কেনো? এর উত্তরে বলা যায়, অবকাশদানের বিষয়টি ছিলো পরীক্ষামূলক। যেমন রসুলেপাক স. এর স্ত্রীগণকে এই অবকাশ দেওয়া হয়েছিলো যে, তাঁরা দুনিয়া অথবা আখেরাত, যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারেন। এটা ছিলো তাঁদের জন্য এক মহাপরীক্ষা। তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার মর্জির বিষয়টি গ্রহণ করেন, না কি ওই জিনিস গ্রহণ করেন, যার প্রতি রয়েছে তাঁদের মনের টান। অতঃপর তাঁদের গৃহীত বিষয়ের উপর তাঁদেরকে ধমকও দেওয়া হয়েছিলো। তৌরিশী অবশ্য অবকাশদানের ব্যাপারটিকে অস্বীকার করেছেন। কেননা তাঁর মতে, এ এখতিয়ার বিষয়ক মাসআলাটি আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশনাবিরোধী। ইমাম তিরমিযীও বিষয়টিকে গরীব বা দুষ্প্রাপ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তায়বী বলেন, বিষয়টির বর্ণনা গরীব বা দুস্প্রাপ্য বলে আখ্যায়িত করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কোনো না কোনো সময় গরীব বা দুষ্প্রাপ্য বর্ণনাও সহীহ্ হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ্তায়ালার তওফীকে আমি বলতে চাই যে, গরীব শব্দের অর্থ এখানে শায (দুর্লভ)। কেননা ইমাম তিরমিজি যে সব বর্ণনাকে 'গরীব' বলেছেন, সে সব ক্ষেত্রে তিনি তার অর্থ করেছেন 'শায' বা দুর্লভ। ওগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন 'জামেউল উসুল' গ্রন্থের লেখক। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

শায়েখ ইবনে হাজার মক্কী শরহে বোখারী থেকে 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এরকম বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হেব্বান এবং হাকেম সহীহ্ সনদের ভিত্তিতে হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত জিবরাইল নবী করীম স. এর দরবারে এসে বললেন, বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আপনি আপনার সাহাবীগণকে সম্পূর্ণ এখতিয়ার দিতে পারেন। কিন্তু তারা যদি তাদেরকে কতল না করে ফিদ্য়া নিয়ে মুক্ত করে দিতে চান, তাহলে উক্ত কয়েদীদের সমান সংখ্যক সাহাবীকে আগামী বৎসর শাহাদত বরণ করতে হবে। সুতরাং সাহাাকেরামকে এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিলো এবং তাঁরা ফিদ্য়াই

গ্রহণ করেছিলেন। জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, সাহাবাকেরাম যখন মুক্তিপণ গ্রহণ করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করলেন, তখন দেখা গেলো, বন্দীদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা একেবারেই দরিদ্র। ফিদ্‌য়া দেওয়ার সঙ্গতি তাদের নেই। রসুলেপাক স. তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করলেন যে, ভবিষ্যতে তারা যেনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্রধারণ না করে। বন্দীদের মধ্যে কিছু কিছু লোক ছিলো, যারা লেখাপড়া জানতো। রসুলেপাক স. তাদেরকে আনসারদের দু'জন করে শিশুকে লেখাপড়া শিখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। আর তাদের মধ্যে যারা কিছু সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলো তাদেরকে বলা হলো, ক্ষমতা অনুসারে তারা যেনো ফিদ্‌য়াস্বরূপ কিছু কিছু স্বর্ণ দান করে। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের পিতামহ আসেম ইবনে ছাবেতকে হুকুম দেওয়া হলো, তিনি যেনো আকাবা ইবনে আবী মুঈতকে হত্যা করেন। সে ছিলো ওই দুর্ভাগা, যে রসুলেপাক স. এর নামাজে সেজদারত অবস্থায় তাঁর মাথার উপর উটের ভুঁড়ি ফেলে দিয়েছিলো।

রমজানুল মুবারকের শেষ তারিখ এবং শাওয়ালের প্রথম তারিখে যুদ্ধ শেষ হলো। রসুলেপাক স. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে বিজয়ের সংবাদ জানাতে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি চাশতের সময় মদীনায় পৌঁছলেন। তখন রসুলেপাক স. এর কন্যা সাইয়্যেদা রুকিয়াকে দাফন করে লোকজন ঘরে ফিরছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে— রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা রুকিয়ার দাফনের সময় উপস্থিত হলে তাঁকে কবরস্থ করার সময় তাঁর দুই গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো।

বদরী সাহাবীগণের মর্যাদা

বদরী সাহাবীগণের মর্যাদাসংক্রান্ত বহু হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন— রসুলেপাক স. বলেছেন 'আল্লাহ্‌তায়ালা বদরী সাহাবীগণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের যা মনে চায় তাই করতে পারো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি'। অন্য বর্ণনায় এসেছে— 'তোমাদের জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে'। এক্ষেত্রে হাতেব ইবনে আবী বালতার চিঠির বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য, যা উল্লেখ করা হয়েছে সহীহ্ বোখারীতে। হজরত হারেছার বর্ণনাও সেখানে রয়েছে। তিনি ছিলেন যুবক। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাঁর মাতা একদিন রসুলেপাক স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে বলুন, হারেছা এখন কোথায়? সে যদি বেহেশতে থেকে থাকে, তা হলে তো আমি সওয়াবের অপেক্ষায় থাকবো। আর যদি অন্য কোথাও থেকে থাকে, তাহলে আমি এতো বেশী ক্রন্দন করবো যে, আপনি তখন দেখতে পাবেন

আমি কতো কাঁদতে পারি। রসুলেপাক স. বললেন, কাঁদবে কেনো? তুমি কি মনে করো, সে এক বেহেশতে রয়েছে? সে তো অনেক বেহেশতে ঘুরে বেড়ায়। এখন সে রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসে। একটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদিন হজরত জিবরাইল নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি আপনার সাহাবীগণের মধ্যে বদরী সাহাবীগণকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন? তিনি স. বললেন, আমি মুসলমানদের মধ্যে তাদেরকে সর্বাধিক মর্যাদাবান বলে মনে করি। হজরত জিবরাইল বললেন, আমিও ফেরেশতাদের মধ্যে ওই সকল ফেরেশতাকে সর্বাধিক মর্যাদাবান বলে মনে করি, যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো।

রসুলেপাক স. সাফরা নামক উপত্যকায় পৌঁছলেন। সেখানেই গনিমতের মাল বন্টন করা হলো। যুলফিকার নামক তরবারীটি তিনি নিজের জন্য রাখলেন। গনিমতের মধ্যে ছিলো ওই তরবারীটিও। পরবর্তীতে খন্দক যুদ্ধের সময় ওই তরবারীটি তিনি স. দিয়েছিলেন হজরত আলীকে। যুলফিকার শব্দের অর্থ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট। এর যুলফিকার নামকরণের কারণ হচ্ছে, এর পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ডের হাড়ের মতো মোহর লাগানো ছিলো। জীবনপঞ্জিবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন, যেদিন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়, সেদিনই রোমীয়রা পারসীয়দের পরাজিত করে। ওই সংবাদও ছিলো মুসলমানদের খুশির অন্যতম কারণ।

কথিত আছে, বদর প্রান্তর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আবু সুফিয়ান কুরায়েশদেরকে কাঁদতে ও শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলো। অথচ তার এক পুত্র হানযালাও সেখানে মারা গিয়েছিলো। আর আমর নামের অপর এক পুত্র সেখানে বন্দী হয়েছিলো। সে শপথ করেছিলো, তার সাথীদের হন্তারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে তার স্ত্রীগণের সাহায্য গ্রহণ করবে না। গোপন মিলনেও যাবে না। মাথায় তেল ব্যবহার করবে না এবং বর্ণাঢ্য পোশাক পরিধান করবে না। তার স্ত্রী হিন্দাও আপন পিতা উতবা ও পুত্র হানযালার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ছিলো উন্মাদপ্রায়। তাদের এমতো জিঘাংসার সূত্র ধরেই পরবর্তী বৎসর সংঘটিত হয়েছিলো উহুদ যুদ্ধ। আবু সুফিয়ানই ছিলো ওই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি।

বর্ণিত হয়েছে, বদরের যুদ্ধ থেকে রসুলেপাক স. যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত রওহা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বরণ করেন ওই সকল সাহাবী, যাঁরা কোনো না কোনো কারণবশতঃ যুদ্ধে যেতে পারেননি। তাঁরা তাঁর কাছে নিজেদের অপারগতার কারণ প্রকাশ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁদের ওজরখাহি গ্রহণ করে নিলেন। উল্লেখ্য, সুনির্দিষ্ট ঘোষণা ব্যতিরেকেই মুসলিমবাহিনীকে বদর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিলো। প্রথমে উদ্দেশ্য তো ছিলো কেবল কুরায়েশদের

বাণিজ্যবহরকে আক্রমণ করা। অকস্মাৎ সেখানে উভয় বাহিনীকে মুখোমুখি হতে হয়। হজরত কাআব ইবনে মালেক বলেছেন, তবুক যুদ্ধে আমি যেতে পারিনি। আর যেতে পারিনি বদর যুদ্ধে। ওদু'টো ছাড়া সকল যুদ্ধই আমি করেছি। যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তাঁদেরকে কোনোরূপ তিরস্কার করা হয়নি। কারণ রসুলেপাক স. এর ওই অভিযান ছিলো উদ্দেশ্যহীন, অনির্ধারিত এবং অকস্মাৎ। এতদসত্ত্বেও ইমাম বোখারী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন রসুলেপাক স. বলেছেন, 'লা ইয়াস্তাবিল ক্বাই'দুনা মিনাল মু'মিনীনা আন বাদরিওঁ ওয়াল খারিজুনা ইলা বাদরিন' (বদরের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছে এবং যারা অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলো, তারা সমান নয়)।

বদর দিবসে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনাও ঘটেছিলো। সেদিন সেখানকার পাহাড়ের কোনো একটি স্থান থেকে কাড়া-নাকাড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিলো। রাজা-বাদশাহগণ যুদ্ধে জয়লাভ করলে যেরকম নাকাড়া বাজানো হয়, ঠিক সেরকম নাকাড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিলো তখন। লোকেরা বলে থাকে, মুসলমানদের বিজয়লাভের আলামতস্বরূপ হকতায়ালাই ওই আওয়াজ শুনিয়েছিলেন। পূর্বকালের উলামাকেরাম বলেছেন, সেদিন বাতাস এতো বেগে প্রবাহিত হয়েছিলো যে, সে বাতাস থেকে উক্তরূপ আওয়াজ শোনা গিয়েছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'র গ্রন্থকার যিনি রসুলেপাক স. এর মোজেজা বর্ণনা করার ব্যাপারে ছিলেন অত্যুৎসাহী, তিনি বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, আমি অনেক হাজীসাহেবের কাছ থেকে এরূপ ঘটনার কথা শুনেছি। তারা ওই স্থান অতিক্রমকালে কাড়া-নাকাড়ার শব্দ শুনেছেন। আমি অবশ্য বিষয়টিকে অস্বীকারই করে আসছিলাম। আমি সবসময়ই তাদের উক্ত বর্ণনার কোনো না কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতাম। বলতাম, ওই স্থানে সম্ভবতঃ প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হয়। ফলে প্রাণীসমূহের চলাচল থেকে সৃষ্ট পায়ের আওয়াজের কারণে ওরকম শোনা যায়। আমার এরকম ব্যাখ্যা শুনে হাজীসাহেবগণ বলতেন, না সেখানকার মাটিতো এতো শক্ত নয় যে, পশু-প্রাণীর পায়ের শব্দ উচ্চকিত হবে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ্তায়ালা যখন আমার উপর এহসান করলেন এবং উক্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পৌছার সৌভাগ্য দান করলেন, তখন আমি আমার বাহন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলাম। সে সময় আমার হাতে কীকড় কাঠের একটি ছড়ি ছিলো। আমি তখন ওসব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তখন দ্বিপ্রহর। আমি চলতে শুরু করলাম। এক উটের রাখাল আমাকে বললো, তুমি কি নাকাড়ার আওয়াজের মতো কোনো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো? আমি উৎকর্ণ হলাম। শুনতে পেলাম সেই বিজয়দুন্দুভির আওয়াজ। আমার শরীর শিউরে উঠলো। শরীরের পশমগুলো খাড়া হয়ে গেলো। তখন লোকমুখে শ্রুত কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেলো। খোলা আকাশের নিচে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিলো। আমি পুনরায় আওয়াজ

শুনতে পেলাম। হয়ে গেলাম নির্বাক ও নিঃসাড়। ভীতি ও আনন্দের অভূতপূর্ব অনুভূতি তখন আমাকে গ্রাস করে ফেললো। আমার তখনকার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালাই কেবল জানেন। ওরকম অবস্থার বিবরণ দান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর আমার মনে হলো, আমার হাতের ছড়িটির সঙ্গে বাতাস বাড়ি খেয়ে এরকম আওয়াজ তুলছে না তো! অথবা আগে থেকে বিষয়টি আমার জানা থাকার কারণেও হয়তো ওরকম মতিভ্রম ঘটতে পারে। হাত থেকে ছড়িটি ফেলে দিলাম আমি। মাটিতে বসে পড়লাম। তার পরেও ওই আওয়াজ বন্ধ হলো না। আমি হয়রান পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আওয়াজটি সুস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো। ওই আওয়াজ যে নাকাড়ার আওয়াজ, সে সম্পর্কে আর কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশই রইলো না। আমরা তখন ইয়ামন থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। বদর প্রান্তরে যাত্রাবিরতি করেছিলাম। পুরো একটি দিন সেখানে ছিলাম। আর সারাটা দিনই ধ্বনিত হচ্ছিলো ওই অলৌকিক আওয়াজ। আমাকে তখন কে যেনো বললো, সকলেই যে এ আওয়াজ শুনতে পায় এমন নয়।

মাদারেজুন নবুওয়াত গ্রন্থকার শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী বলেন, আমারও একবার বদর প্রান্তরে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব স.কে যে স্থানে প্রথম বিজয় দান করেছিলেন, সে স্থান দর্শনের আকাঙ্খা আগে থেকেই ছিলো। আমিও সেখানে গিয়ে বিজয়দুন্দুভির ওই আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। প্রান্তরের লোকজনের কাছে আমি যখন এ সম্স্লর্কে জিজ্ঞেস করলাম তখন তাঁরা বললেন, এরকম কখনও হয়, আবার কখনও হয় না। তাদের বক্তব্য ছিলো দৃঢ়প্রত্যয়জাত। তাই আমার আগ্রহও গেলো বেড়ে। মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে আমি সেখানকার আলেমগণের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরাও আমাকে একই জবাব দিলেন। আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো এখানে, যা বর্ণনা না করাটাই হয়তো সমীচীন। তবুও তা বর্ণনা না করে আর পারছি না। ঘটনাটি হচ্ছে— আমি সেখানে ওই সকল স্থান দর্শনের অভিলাষী ছিলাম, যে সকল স্থান রসুলে আকরম স. চিহ্নিত করেছিলেন কাফেরদের নিহত হওয়ার স্থান হিসেবে। এ সম্পর্কে আমি আমার 'তারিখে মদীনা' গ্রন্থে সবিশদ আলোচনা করেছি। হঠাৎ সেখানে এক আরব বেদুঈনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সে বার বার বলে যেতে লাগলো, এ হচ্ছে আবু জাহেলের জায়গা, আর এ স্থান হচ্ছে মোহাম্মদের। সে যখন বারংবার একথাই বলে যাচ্ছিলো, তখন আমি তাকে বললাম 'রূহ্‌ লানাতুল্লাহি আলাইহি' (তুমি দূর হও, আবু জাহেলের উপর আল্লাহ্‌র লানত পড়ুক)। সে তখন বললো, লা লা কানা কুরাইশিয়ান (না না সে কুরাইশী ছিলো না)।

ওমায়ের ইবনে আদীর অভিযান

হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরের ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম ঘটনা হচ্ছে, হজরত ওমায়ের ইবনে আদীর অভিযান। রসুলেপাক স. ইহুদী ইয়ায়িদ ইবনে খাত্তমীর স্ত্রী আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করার জন্য হজরত ওমায়েরকে প্রেরণ করলেন। ওই অভিশপ্ত রমণী ছিলো বড়ই নির্লজ্জ। ইহুদীদের মধ্যে তার কুখ্যাতি ছিলো কটুভাষীণী হিসেবে। সে সর্বদাই ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করতো। অযথা দোষ বর্ণনা করতো। সে রসুল স.কেও কষ্ট দিতো। রসুলেপাক স. এর নির্দেশানুসারে হজরত ওমায়ের এক রাতে আসমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার বাড়ি ছিলো মদীনার বাইরে। তখন মহিলাটির কাছে ছিলো তার সন্তানেরা। সে তার একটিকে দুধ পান করাচ্ছিলো। হজরত ওমায়ের ওদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলেন। তারপর নিজের তরবারী সজোরে বসিয়ে দিলেন ওই অভিশপ্তিনীর বুকে। তৎক্ষণাৎ তার বক্ষদেশ হয়ে গেলো দ্বিখণ্ডিত। কাজ শেষ করে তিনি ওই রাতেই ফিরে এলেন মদীনায়। প্রত্যুষে তিনি রসুলেপাক স. সকাশে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে দেখে বললেন, তুমি কি তাকে হত্যা করে এসেছো? তিনি বললেন, হাঁ। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমায়ের অন্ধ ছিলেন। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থেও বলা হয়েছে, হজরত ওমায়ের ইবনে আদী অন্ধ ছিলেন এবং প্রথম দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সদা আল্লাহ্প্রেমে নিমজ্জিত, সাধু উদ্দেশ্যসম্পন্ন এবং স্বচ্ছ বিশ্বাসধারী। রসুলেপাক স. এর প্রতি ছিলো তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা। তিনি মানত করেছিলেন, রসুলেপাক স. যদি সহীসালামতে মদীনায় ফিরে আসেন তাহলে তিনি উক্ত অভিশপ্তিনীকে হত্যা করবেন। অন্ধত্বের কারণে রসুলেপাক স. তাঁকে বদর অভিযানে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেননি। রসুলেপাক স. যেদিন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, সেই রাতেই সেহেরীর সময় তিনি ওই অভিশপ্তিনীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

হজরত ওমায়ের রসুলেপাক স.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার এ কাজে কোনো পাপ হয়নি তো? আমার উপর কি কিছু ওয়াজিব হয়েছে? তখন রসুলেপাক স. তাঁকে লক্ষ্য করে সাহাবাকেরামকে বলেছিলেন, তোমরা যদি এমন কোনো লোককে দেখতে চাও, যে জান্নাত ও তার রসুলকে না দেখে সাহায্য করেছে, তাহলে ওমায়ের ইবনে আদীকে দেখে নাও। তখন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছিলেন, তোমরা এ অন্ধ লোকটির অবদান অনুধাবন করতে চেষ্টা করো। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যের অনুকূলের কাজ তিনি করেছেন। তখন রসুলেপাক স. বললেন, একে তোমরা অন্ধ বোলো না, বরং বোলো চক্ষুষ্মান।

'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থের বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় হজরত ওমায়ের রসুলেপাক স. এর নির্দেশে আসমা নাম্নী ওই মহিলাকে হত্যা করতে যাননি। বরং দ্বীনের দাবী অনুসারেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, এতে তাঁর কোনো অপরাধ হয়েছে কি না। আর সে কারণেই 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে ওমায়ের ইবনে আদী শিরোনামে কোনো অভিযানের উল্লেখ করা হয়নি। তবে 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে উক্ত শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

কারকারাতুল কাদার যুদ্ধ

হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে কারকারাতুল কাদার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কারকারাতুল কাদার একটি স্থানের নাম। একদিন রসুলেপাক স. এর কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছলো যে, বনী সালীম এবং গাতফান গোত্রের লোকেরা ওই স্থানে এসে সমবেত হয়েছে। রসুলেপাক স. মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের সমন্বয়ে একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। পাতাকা তুলে দিলেন হজরত আলীর হাতে। মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করলেন হজরত সেবা ইবনে গেরেফতাকে। কেউ কেউ বলেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে। তারপর তিনি স. তাঁর বাহিনী নিয়ে কারকারাতুল কাদারের দিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে কাউকে পেলেন না। তাদের সন্ধানে প্রেরণ করলেন সাহাবাকেরামের একটি ছোট দলকে। অবশিষ্টদেরকে নিয়ে প্রান্তরের মধ্যবর্তী এক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে অনেক রাখালকে পাওয়া গেলো। তারা উট চরাচ্ছিলো। তাদের মধ্যে ইয়াসার নামে একজন গোলামও ছিলো। রসুলেপাক স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বনী সালীম ও গাতফান গোত্রের লোকেরা কোথায়? সে বললো, তারা পানির কিনারায় অবতরণ করেছিলো। এখন কোথায় তা আমার জানা নেই। তিনি স. বললেন, এখানকার সবক'টি উট মদীনার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, সেখানকার উটের সংখ্যা ছিলো পাঁচশ। আর ওই অভিযানে সাহাবাকেরামের সংখ্যা ছিলো দু'শ। উটগুলি বন্টনের সময় এক পঞ্চমাংশ বের করার পর এক একজন সাহাবী দু'টি করে উট পেয়েছিলেন। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন, ওই উটগুলোর সংখ্যা ছিলো পাঁচশ'র বেশী। এই বর্ণনাটিকে গ্রহণ করা হলে মেনে নিতে হয় যে, ওই অভিযানে সাহাবীগণের সংখ্যা দু'শর কম ছিলো। অথবা উটের সংখ্যা ছিলো পাঁচশ'র উপরে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। ফায় এর মাল হিসেবে প্রাপ্ত গোলাম ইয়াসার রসুলেপাক স. এর ভাগে পড়েছিলো। কিন্তু তিনি স. ইয়াসারকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. কর্তৃক আযাদকৃতদের মধ্যে হজরত ইয়াসার

ছিলেন একজন বিখ্যাত লোক। বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. ফজরের নামাজ পড়ানোর সময় দেখেন হজরত ইয়াসার অন্যান্য সাহাবীগণের সঙ্গে নামাজ পড়ছেন। হজরত ইয়াসারের এহেন নামাজরত রূপটি তাঁর খুবই পছন্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে মুক্তিদান করলেন। সেখানে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন তিনি। কেউ কেউ বলেছেন, দু'দিন ছিলেন। পুরো অভিযান শেষ করতে তাঁর পনের দিন লেগেছিলো। কোনো কোনো জীবনীরচয়িতা মনে করেন, এই অভিযান সাবীকের যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিলো। আবার কেউ কেউ এই ঘটনাকে তৃতীয় হিজরীর ঘটনার মধ্যে গণ্য করেছেন।

সালেম ইবনে ওমায়েরের অভিযান

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে লেখা রয়েছে, কারকারাতুল কাদার অভিযানের পর সালেম ইবনে ওমায়েরের অভিযান সংঘটিত হয়েছিলো। উক্ত কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, রসুলেপাক স. হজরত সালেম ইবনে ওমায়েরকে প্রেরণ করেছিলেন আবু আক্‌ফা নামক এক ইহুদীর নিকট। আক্‌ফা ছিলো বয়োবৃদ্ধ। তখন তার বয়স হয়েছিলো একশ বিশ বছর। সে রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করতো এবং এমন সব কবিতা আবৃত্তি করতো যাতে সাধারণ মানুষ রসুলেপাক স. এর প্রতি হয়ে যায় বীতশ্রদ্ধ। হজরত সালেম তার নিকট পৌঁছে তার বক্ষে তরবারী বসিয়ে দিলেন। আল্লাহ্‌র ওই দুশমন একটি মাত্র চিৎকার দিলো। তারপরই শেষ হয়ে গেলো। 'রওজাতুল আহবাব' এবং 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে এই অভিযান সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

কায়নুকার যুদ্ধ

উপরোক্ত অভিযানের পর সংঘটিত হয় কায়নুকার যুদ্ধ। কায়নুকা মদীনায় অবস্থিত একটি ইহুদী জনপদের নাম। সেখানকার ইহুদীরা ছিলো খুব ধৈর্যশীল ও বীরপুরুষ। যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিলো হিজরতের বিশতম মাসে। অর্থাৎ শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি, বদর যুদ্ধের একমাস পর। রসুলেপাক স. এর মদীনায় হিজরতের পর কাফেররা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একদল এমন ছিলো, যারা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে এইমর্মে চুক্তি করেছিলো যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং তাঁর শত্রুদেরকে কোনোরূপ সহায়তা প্রদান করবে না। বরং দুশমনরা যদি চড়াও হয় তবে তারা রসুলেপাক স.কে সাহায্য করবে। এভাবে সন্ধিবদ্ধ হয়েছিলো ইহুদীদের তিনটি গোত্র— বনী কুরায়যা, বনী নাযীর

এবং বনী কায়নুকা। কাফেরদের আরেকটি দল ছিলো যুদ্ধংদেহী। তারা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে দুশমনি করার জন্য একপায়ে খাড়া ছিলো। যেমন কুরায়েশ ও তাদের সমর্থনপুষ্ট সম্প্রদায়সমূহ। আর কাফেরদের তৃতীয় আরেকটি দল ছিলো, যারা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে শত্রুতা করতো না, বরং তাঁকে তারা পছন্দ করতো। কুরায়েশদের মিত্ররা ছাড়া অন্যান্য আরব গোত্রগুলোর মনোভাব ছিলো এরকম। তারা শেষ পরিণাম দেখার অপেক্ষায় ছিলো। ভাবতো, দেখা যাক সব শেষে কী অবস্থা দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মনে মনে রসুলেপাক স. এর বিজয় কামনা করতো। আবার কিছু কিছু লোক এর বিপরীত মনোভাব পোষণ করতো। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব প্রদর্শন করতো। কিন্তু অন্তরে পোষণ করতো শত্রুতা। তাদেরকেই বলা হয় মুনাফিক। তাদের অন্তর ছিলো তাদের বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। তাদের মন ও মুখ একরকম ছিলো না।

সর্বপ্রথম রসুলেপাক স. এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো বনী কায়নুকা সম্প্রদায়। রসুলেপাক স. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বদর যুদ্ধের একমাস পর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে। বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. যখন বদর যুদ্ধ থেকে বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বনী কায়নুকার ইহুদীরা হিংসা-বিদ্বেষ ও অবাধ্যতা প্রকাশ করে বলতে লাগলো, মোহাম্মদ তো এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, যারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলো না। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তিনি বুঝতে পারতেন যুদ্ধ কাকে বলে। জীবনীরচয়িতাগণ বলেন, তাদের সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করার কারণ ছিলো এরকম— এক মুসলমান রমণী বাজারে এক স্বর্ণকারের দোকানে বসেছিলেন। এক ইহুদী ওই রমণীর পিছনে এসে তার কাপড়ের আঁচল উঠিয়ে তাঁকে বেঁধে ফেললো। 'মাওয়াহেব' এর লেখক বলেছেন, কাজটি করেছিলো ওই স্বর্ণকার নিজেই। ওই রমণী যখন দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, তখন তাঁর আবরণীয় অঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে গেলো। তা দেখে উপস্থিত লোকেরা হাসাহাসি শুরু করে দিলো। রমণী লোকজনের কাছে এর প্রতিকারের আবেদন জানালেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন মুসলমান। তিনি তরবারী উঠিয়ে সেই লোকটিকে অথবা স্বর্ণকারকে হত্যা করে ফেললেন। সংবাদ জানতে পেরে ইহুদী জনতা ওই মুসলমানকে ঘিরে ফেললো এবং তাঁকে হত্যা করে ফেললো। রসুলেপাক স. যখন ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে এনে সাবধান করে দিলেন। বললেন, তোমরা এ ধরনের আচরণ পরিহার করো। আল্লাহ্‌র গজবকে ভয় করো। কুরায়েশরা যে গজবে আক্রান্ত হয়েছে, তোমাদেরকে যেনো সে গজবে আক্রান্ত হতে না হয়। ইহুদীরা তাঁর কথা আমলেই আনলো না। তাঁকে লক্ষ্য করে অনর্থক বকাবকি শুরু করে

দিলো। রসুলেপাক স. বুঝতে পারলেন, এরা তাদের কৃত অঙ্গীকার আর মান্য করতে চায় না। তখন হজরত জিবরাইল আগমন করলেন এই আয়াত নিয়ে— 'ওয়া ইম্মা তাখাফান্না মিন ক্বাওমিন খিয়ানাতান ফামবিয ইলাইহিম আ'লা সাওয়াইন ইন্নাললল্লাহা লা ইউহিব্বুল খা-ইনীন' (যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তিভঙ্গের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চুক্তিভঙ্গকারীদিগকে পছন্দ করেন না) (৮ঃ৫৮)। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই রসুল স. যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিলেন। তিনি হজরত আবু লুবাবাকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। একটি শাদা পতাকা তুলে দিলেন হজরত হামযার হাতে। তারপর উপস্থিত হলেন কায়নুকাদের বসতিতে। কায়নুকারা দুর্গে আশ্রয় নিলো। তিনি স. তাদেরকে অবরোধ করলেন। এভাবে অতিবাহিত হলো পনেরো দিন। তারপর আল্লাহ্তায়ালা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার ঘটালেন। অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের সমগ্র পথ রুদ্ধ হয়ে গেলো। আত্মসমর্পণ ভিন্ন তাদের আর কোনো উপায়ই রইলো না। তারা একথার উপর রাজী হয়ে গেলো যে, তাদের সমস্ত ধনসম্পদ রসুলেপাক স. অধিকার করবেন, কিন্তু তাদের নারী ও শিশুরা তাদেরই থাকবে। রসুলেপাক স. তাদেরকে আষ্ট্রেপৃষ্ঠে বেঁধে আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইলেন। কিন্তু মুনাফিকশ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে সলুল কাঁদাকাটি করে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার আবেদন জানালো। রসুলেপাক স. তাকে ও তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে অবমানিত করলেন এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে সলুল এবারও কান্নাকাটি শুরু করলো। কিন্তু তিনি স. তাঁর নির্দেশের অন্যথা ঘটালেন না।

বনী কায়নুকার সঙ্গে হজরত উবাদা ইবনে সামেতের কোনো এক বিষয়ে চুক্তি ছিলো। তিনিও আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করলেন। তিনি নিজে তাদের অনেককে তাদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। বনী কায়নুকার লোকেরা সিরিয়ার আযরুআত নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলো। কিছুকাল পর তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের ধন সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র সব কিছু গনিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। রসুলেপাক স. ওই সকল জিনিসপত্র থেকে নিজের জন্য নিয়েছিলেন তিনটি ধনুক, তিনটি তরবারী এবং তিনটি তীর। একটি বর্ম দান করেছিলেন হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে, আর একটি হজরত সাআদ ইবনে মায়াযকে। জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, বনী কায়নুকার মধ্য থেকে তিনশ জন ইহুদী বর্ম পরিহিত ছিলো। রসুলে আকরম স. ওই বর্মগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে জীবনীপ্রণেতাগণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, গনিমত পাঁচভাগে ভাগ করার ওই নির্দেশটিই ছিলো প্রথম নির্দেশ।

ঈদ এবং কোরবানী

বনী কায়নুকার অভিযান শেষ হওয়ার পর আসে কোরবানীর ঈদ। রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে নিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন। তারপর সাহাবীগণের সঙ্গে সম্পন্ন করেন কোরবানী!

কবি উমাইয়া ইবনে সালতের মৃত্যু

এ বৎসরেই কবি উমাইয়া ইবনে সালতের মৃত্যু হয়। সে ছিলো ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগের একজন খ্যাতনামা কবি। তার মধ্যে দ্বীনী প্রেরণা বিদ্যমান ছিলো। আল্লাহ্‌র ইবাদত করার আকাংখা পোষণ করতো সে। সে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেছিলো এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলো। মুর্তিপুজা বর্জন করেছিলো। অপেক্ষায় ছিলো, কখন শেষ নবীর নবুওয়াতের নূর প্রকাশিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সকল সদ্‌গুণ বিফলে গেলো। শয়তানের কুমন্ত্রণাচ্ছন্ন হয়ে এক সময় নিজেকেই নবী বলে ধারণা করতে শুরু করলো সে। রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের বহিঃপ্রকাশ যখন ঘটলো, তখন সে কুফুরী ও গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. তার এলেম ও হেকমতে পরিপূর্ণ কবিতাসমূহ শুনে মন্তব্য করেছিলেন 'আমানা লিছানুহু ওয়া কাফারা ক্বলবুহু' (তার জিহবা ইমান এনেছে কিন্তু তার অন্তর কুফুরী করেছে)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে তিনি স. বলেছিলেন, 'আমানা শে'রুহু ওয়া কাফারা ক্বলবুহু' (তার কবিতা ইমান এনেছে, অথচ তার অন্তর করেছে কুফুরী)।

সাবীকের অভিযান

জিলহজ্ব মাসের পাঁচ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর সাবীকের অভিযান সংঘটিত হয়। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, সফর মাসে ওই অভিযান সংঘটিত হয়েছিলো। এ অভিযানের পটভূমি এরকম— আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এ মর্মে কসম করেছিলো যে, সে নারী স্পর্শ করবে না এবং শরীরে তেল ব্যবহার করবে না, যতক্ষণ না রসুল স. এবং সাহাবীদের উপর প্রতিশোধ না নিবে। সুতরাং তার প্রতিশোধ প্রস্তুতি চলতে লাগলো পুরোদমে। কুরায়েশদের মধ্য থেকে বাছাই করা দু'শ অশ্বারোহী, অপর এক বর্ণনামতে চল্লিশজন বীর অশ্বারোহী নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো সে। উপস্থিত হলো আরীয নামক স্থানে। জায়গাটি ছিলো মদীনা মুনাওয়ারার এক প্রান্ত থেকে তিন মাইল দূরে। এখানে এসে সে একটি খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিলো এবং একজন আনসার সাহাবীকে শহীদ করলো। ভাবলো, এবার তার কসম পূর্ণ হয়েছে। মক্কায়

ফিরে গেলো সে। আবু সুফিয়ানের মক্কায় ফিরে যাওয়ার পর রসুলেপাক স. দু'শ মুহাজির ও আনসারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আবু সুফিয়ান ও তাঁর সাথীদের বোধবিবেচনা ছিলো কম। তাই তারা যেতে যেতে অকারণে রাস্তায় অনেক সাবীক (ছাতু) ফেলে গিয়েছিলো। তাদের ওই বাহিনীর খাদ্যসামগ্রী ছিলো মূলতঃ ছাতু। মুসলিম বাহিনী ওই সব ছাতু কুড়িয়ে নেন। তাই ওই অভিযানের নামকরণ হয় সাবীক বা ছাতুর অভিযান। শত্রুদলের দেখা না পেয়ে রসুলে আকরম স. মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ অভিযান চালাতে গিয়ে রসুলেপাক স.কে মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে পাঁচদিন অতিবাহিত করতে হয়। সীরাতবিদগণ সাবীকের অভিযানকে তৃতীয় হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। এ বৎসরেই জিলহজ্ব মাসে হজরত ওছমান ইবনে মাযউনের ওফাত হয়। আর শওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের।

তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী

হিজরীর তৃতীয় বৎসরে সংঘটিত হয় গাতফানের যুদ্ধ। একে বনী আমা ও আনমারের যুদ্ধও বলা হয়। স্থানটি নজদের অন্তর্গত। বারোই রবিউল আউয়ালে ওই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। যুদ্ধের কারণ ছিলো এরকম— সহসা সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেলো যে, বনী ছা'লাবা এবং মাহারেবের লোকজন নজদের সীমামা নামক স্থানে এসে সমবেত হয়েছে। তারা মদীনা মুনাওয়ারার পার্শ্ববর্তী এলাকায় লুটতরাজ চালাতে চায়। তাদেরকে একত্রিত করেছে দাছুর ইবনে হারেছ মাহারেবী নামক এক ব্যক্তি। খতীবে বাগদাদী বলেছেন, তার নাম ছিলো নাওয়াছ। সে ছিলো এক বেপরোওয়া যুদ্ধবাজ।

সংবাদ পেয়ে রসুলেপাক স. মুসলমানদেরকে একত্রিত হতে বললেন। তারপর তিনি চারশ পঞ্চাশজন আরোহী যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফানকে মদীনা মুনাওয়ারায় খলীফা নিযুক্ত করে গেলেন। রসুলেপাক স. যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন তারা সেস্থান থেকে পালিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করলো। মুসলমানগণ বনী ছা'লাবার এক লোককে সামনে পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলেন রসুলেপাক স. এর কাছে। তিনি স. তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। লোকটি মুসলমান হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. তাকে হজরত বেলালের সঙ্গী করে দিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। রসুলেপাক স. এবং সাহাবীগণ ভিজে গেলেন। রসুলেপাক স. তাঁর সিক্তবসন খুলে একটি গাছের ডালে ছড়িয়ে দিলেন। বিশ্রামার্থে উপবেশন করলেন ওই গাছেরই নিচে। লোকটি পাহাড়ের উপর থেকে রসুলে করিম স.কে দেখছিলো। সে দাছুর

নামের লোকটিকে ডেকে বললো, মোহাম্মদ একা একা গাছের নিচে বসে আছে। ধারে কাছে আর কেউ নেই। আশা করা যায়, এমতাবস্থায় তোমরা তাকে সহজেই কাবু করতে পারবে। দাছুর তরবারী উঠিয়ে রসুলেপাক স. এর শিয়রের সামনে দাঁড়ালো। বললো, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে? রসুলে করিম স. বললেন, আল্লাহ্! তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত জিবরাইল। তিনি আততায়ীর বুকে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে গেলো। রসুলেপাক স. তার হাত থেকে তলোয়ারটি নিয়ে নিলেন এবং বললেন, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে? সে বললো, কেউ তো নেই। তবে আমি ঘোষণা করছি— আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রসুলুল্লাহ্। রসুলে আকরম স. তার তলোয়ার পুনরায় তার হাতেই তুলে দিলেন। লোকটি আপন কওমের লোকদের কাছে ফিরে গেলো। তারা বললো, তোমার কী হয়েছিলো? তুমি তো তলোয়ার তাক করে তাঁর কাছে পোঁছে গেলে। কিন্তু কিছুই তো করতে পারলে না। সে বললো, আমি সেখানে একজন শাদা পোশাকধারী লোককে দেখলাম। সে আমার বুকের উপর এমন ভাবে আঘাত করলো যে, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। একথা বলার পর দাছুর তাঁর কওমের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত— 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানুজকুরূ নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইজ হাম্মা ক্বওমুন আঁই ইয়াবসুতূ ইলাইকুম আইদিয়াহুম ফাকাফ্ফা আইদিয়াহুম আ'নকুম' (হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের হাত তোমাদিগ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন) (৫ঃ১১)। ওই ঘটনার পর রসুলেপাক স. মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর ওই সফরের সময়সীমা ছিলো এগারো দিন।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে সীরাতবিদগণের বিবৃতিরূপে বর্ণিত হয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছিলো যাতুররেকা যুদ্ধের সময়। তবে আমি (শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী) বলি, বোখারী গ্রন্থে খওফের নামাজ প্রসঙ্গে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে— রসুলেপাক স. একদা গাছের নিচে নিদ্রিত ছিলেন। তখন তাঁর তলোয়ারখানি গাছের ডালে ঝুলানো ছিলো। ওই সময় এক বেদুঈন এসে তাঁর তলোয়াটি হাতে নিয়ে তাঁর মাথার কাছে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুম থেকে জেগে গেলেন। লোকটি বললো, আমা থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্! একথা বলেই তিনি স. তার হাত থেকে তলোয়ারটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। বোখারীতে তার ইমান আনার বিষয়টির উল্লেখ নেই। তবে কাসতালানী ওয়াকেদী থেকে বর্ণনা করেছেন, সে ইসলাম গ্রহণ

করেছিলো। তারপর সে তার কওমের লোকদের নিকট ফিরে গিয়েছিলো এবং তার মাধ্যমে অনেক লোক হেদায়েত পেয়েছিলো। যাতুররেকা যুদ্ধের আলোচনায় তার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ্ ।

কাআব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে হত্যা

হিজরতের তৃতীয় বৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ইহুদী কাআব ইবনে আশরাফের নিহত হওয়া। চৌদ্দই রবিউল আউয়াল রাতে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এটিকে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার অভিযান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কাআব ইবনে আশরাফ ছিলো কবি। সে সর্বদাই রসুলুল্লাহ্ স. এবং মুসলমানদের নিন্দাবাদে নিয়োজিত থাকতো। আর মক্কার কুরায়েশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করতো। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে তাদের পরাস্ত হওয়ার এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু ঘটার সংবাদ শুনে সে মনোক্ষণ্ন হলো, কিন্তু হাল ছাড়লো না। কুরায়েশদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়ে তাদের নিহত ব্যক্তিবর্গের নামে বিলাপ করলো। মর্সিয়া রচনা করে তাদেরকে শোনাতে লাগলো। সাথে সাথে তাদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারেও উৎসাহ দিতে লাগলো। তার অপকর্ম সম্পর্কে যখন রসুলেপাক স. অবহিত হলেন, তখন তিনি আল্লাহ্তায়ালার দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে কাআব ইবনে আশরাফের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করো, যেভাবে তোমার মর্জি হয়। আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ এলো। রসুলেপাক স. হজরত সাআদ ইবনে মাআযকে হুকুম দিলেন, কাআব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে হত্যার ব্যবস্থা করা হোক। অপর এক বিবৃতিতে এসেছে, রসুলেপাক স. বললেন, এমন কে আছে, যে কাআব ইবনে আশরাফের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে? সে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে আমার এবং অপরাপর মুসলমানের দোষচর্চা করেই চলেছে। মুশরিকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করছে এবং খারাপ লোকদেরকে সংঘবদ্ধ করছে। আমি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ পেয়েছি। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'আলাম তারা ইলাল্ লাজীনা ঊতূ নাসিবাম মিনাল কিতাবি ইউ'মিনুনা বিল জ্বিবতি ওয়াত্ব ত্বাগুতি ওয়া ইয়া কূলুনা লিল্ লাজিনা কাফারূ হাউলাই আহদা মিনাল লাজীনা আমানু সাবীলা উলাইকাল লাজীনা লাআ'নাহুমুল্লাহু ওয়া মাঁইইয়াল আ'নিল্লাহু ফালান তাজ্বিদা লাহু নাসীরা' (তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা জিব্‌ত ও তাগুতে বিশ্বাস করে? তাহারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, ইহাদেরই পথ মুমিনদের পথ অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্ লা'নত

করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ যাহাকে লা'নত করেন তুমি কখনও তাহার কোন সাহায্যকারী পাইবে না) ৯৪ঃ৫১-৫২)। অপর এক বিবরণে এসেছে, রসুলেপাক স. হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে হজরত সাআদ ইবনে মাআযের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে বললেন। আরও চারজন সাহাবী এ পরামর্শে হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরা হচ্ছেন— ১. হজরত আবু নায়েলা, যার আসল নাম ছিলো মালকান ইবনে সালাম। তিনি কাআব ইবনে আশরাফের দুধভাই ছিলেন। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি তার পরামর্শদাতাও ছিলেন। ২. হজরত উব্বাদ ইবনে বিশর ৩. হজরত হারেছ ইবনে আউস এবং ৪. হজরত আবু দমা ইবনে যোবায়ের। তাঁরা সকলেই আউস গোত্রের লোক ছিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে ঘটনাটির সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তবে আমি বোখারীর হাদিসটি মূল হিসেবে সাব্যস্ত করে তার তরজমাটুকুই গ্রহণ করেছি। আর তার অনুকূল-প্রতিকূল কথা এবং কমবেশী বর্ণনাটুকু উক্ত তরজমার সাথে শামিল করে নিয়েছি। ইমাম বোখারী হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. কাআব ইবনে আশরাফ সম্বন্ধে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে কাআব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে পারো? সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয়। হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, তাকে হত্যা করার ব্যাপারে যদি কোনোরকম হিলার আশ্রয় নেওয়া হয়, তাকে যদি ধোকা দেওয়া হয় এবং তার সাথে যদি এমন কোনো কথা বলা হয়, যা বাহ্যত অসত্য, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ সদৃশ— এরকম অনুমতি কি রয়েছে? রসুলে আকরম স. বললেন, যা ইচ্ছা বলতে পারো। যেভাবেই হোক তাকে হত্যা করা চাই।

তারপর একদিন হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা কাআব ইবনে আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, ও লোকটি (রসুল স.) তো আমাদের কাছে জাকাত ইত্যাদির মাল চাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে জটিল অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন। বোখারীর বর্ণনা এটুকুই। তবে 'রওজাতুল আহবাবে' লেখা হয়েছে অতিরিক্ত আরো কিছু কথা। যেমন— মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, লোকটি আমাদের জন্য এক আপদ। আরববাসীরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত পথ বন্ধ। এদিকে এরা সব সময় আমাদের কাছে জাকাত সদকা ইত্যাদির তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের দিনাতিপাত করার সম্বলটুকুও নেই। চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সময়াতিপাত করতে হচ্ছে আমাদেরকে। কাআব বললো, আল্লাহ্র কসম! এখনই তোমরা তার প্রতি বেজার হয়ে গিয়েছো? মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন,

আমরা তো স্বেচ্ছায় তার অনুসরণ করে যাচ্ছি। আমরা যে তাঁকে কথা দিয়ে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি সে কথা ফিরিয়ে নেওয়াও তো যাচ্ছে না। অভিশপ্ত কাআব তাঁর কথা শুনে খুবই খুশি হলো। বর্ণনাকারী বলেন, হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং হজরত মাআয পরস্পরে পরামর্শ করে কাজ চালিয়ে যাবেন মর্মে রসুলেপাক স. এর নির্দেশ ছিলো। আবু নায়েলাও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমাদের তো আপনার নিকট একটি বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে। আপনি আমাদেরকে এক ওসক (মতান্তরে দু' ওসক) খাদ্য কর্জ হিসাবে দান করুন। ওসক এক আরবীয় মাপ, যা ষাট সা-তে হয়ে থাকে (আর এক সা হচ্ছে পৌনে চার সেরের সমান)। অপর এক বিবৃতিতে 'ওসক' এর উল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে, আমাদেরকে কর্জ হিসাবে কিছু খাদ্য প্রদান করুন। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এরকমই বলা হয়েছে। কাআব বললো, হাঁ। আমি তোমাদেরকে শর্ত সাপেক্ষে খাদ্য কর্জ দিতে পারি। শর্তটি হচ্ছে, তোমাদের কিছু মাল আমার কাছে বন্ধক রাখতে হবে। তাঁরা বললেন, এমন কী আমাদের রয়েছে, যা আপনার কাছে বন্ধক রাখতে পারি? কাআব বললো, তোমাদের মেয়েলোকদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, মেয়েলোকদেরকে আপনার কাছে বন্ধক রাখি কেমন করে? আপনি নেহায়েত খুবসুরত ও সুঠাম দেহের অধিকারী। আরবের মেয়েলোকেরা তো খুবসুরত পুরুষ দেখলে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ না করুন যদি আপনি কোনো অঘটনে জড়িয়ে পড়েন? তিনি কথাটি এভাবে বলেননি যে, আপনি অঘটন ঘটাবেন, আর তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। লৌকিক শালীনতা ও সম্মান প্রদর্শনার্থে তিনি অপকর্মের সম্স্লর্কটি কাআবের দিকে করলেন না, যাতে শিকার হাতছাড়া হয়ে না যায়। কাআব বললো, তোমাদের মেয়েলোকদেরকে যদি বন্ধক রাখতে না পারো, তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, সন্তানদেরকে কেমন করে বন্ধক রাখি? লোকেরা তো তাহলে সে জন্য আমাদেরকে গালি দিবে। দোষারোপ করবে। বলবে, ওমুক তো এক ওসক বা দু ওসক খাদ্যের জন্য আপন সন্তানদেরকে বন্ধক রেখেছে। এটি আমাদের জন্য বড়ই লজ্জার ব্যাপার। তবে আমরা আমাদের লামাসমূহ বন্ধক রাখতে পারি। লামা শব্দের অর্থ করা হয়েছে হাতিয়ার। তবে অভিধানবিশারদগণ বলেছেন, লামা শব্দের অর্থ-বর্ম। তারপর মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, রাতে আমরা লামা নিয়ে আসবো। রাতে তাঁরা পুনরায় এলেন। আবু নায়েলাও তাঁর সঙ্গী হলেন। কেউ কেউ বলেন, আবু নায়েলার মতো মোহাম্মদ ইবনে মাসলামারও কাআব ইবনে আশরাফের সঙ্গে দুগ্ধসম্পর্ক ছিলো। রাতে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও আবু নায়েলা এসে কাআবকে ডাক দিলেন। কাআব তাঁদের দু'জনকে ডেকে উপরে নিয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু তাঁরা চাইলেন তাকে ডেকে নিচে নিয়ে আসতে। কাআব তখন নববিবাহিত। তার স্ত্রী তাকে বললো, কোথায়

যাচ্ছো? কাআব বললো, সে তো অপর কেউ নয়। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আর আমার আপন দুধভাই আবু নায়েলা। তার স্ত্রী বললো, আমি লোকটির গলার স্বর শুনেছি। তার কণ্ঠস্বর থেকে যেনো অগ্নি টপকাচ্ছে। বিষয়টি বিস্ময়কর। ওই রমণী কেমন করে বিষয়টি আন্দাজ করতে পারলো কে জানে? তবে এমন হতে পারে যে, উচ্চ আওয়াজে কথা বলার কারণে আবু নায়েলার রুক্ষতা ধরা পড়েছিলো। তবে প্রকৃত কথা এই যে, সময় ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কাআবের স্ত্রী বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলো বলে মনে হয়। কেননা মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও আবু নায়েলার এরূপ সময়ে রাতের আঁধারে আগমনের ঘটনাটিই ছিলো অস্বাভাবিক। আর ওই মহিলার পূর্ব থেকে একথা জানা ছিলো যে, মোহাম্মদ স. এর সকল সাহাবীই তাঁকে একনিষ্ঠভাবে মহব্বত করেন। আর সে এও জানতো যে, তার স্বামী মোহাম্মদ স. এর প্রতি শত্রুতা রাখে। এ সকল বিষয় পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ওই মহিলা কোনো না কোনো আলামত বা সম্ভাবনার মাধ্যমেই বিষয়টি সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিলো। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, মহিলাটি বলেছিলো, আমি নিশ্চিত অমঙ্গলের আভাস পাচ্ছি। কাআব তার স্ত্রীর বারণ মানলো না। বাইরে যেতে যেতে বললো, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ডাকা হলেও সে ডাকে সাড়া দেওয়াই তাদের জন্য শোভন। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাঁর তিন সাথীর সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছিলেন যে, যখন কাআব তাঁদের সামনে আসবে, তখন আমি তার মাথার চুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে উদ্যত হবো। তোমরা যখন দেখবে যে, আমি তার চুল শক্তভাবে ধরেছি তখন তোমরা তরবারীর এক আঘাতে তার স্কন্ধদেশ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে।

কাআব চাদর দিয়ে তার মাথা ও শরীর ঢেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। তার মাথা থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ছিলো। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, চুলে কি সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন? এরকম খুশবু তো আমি জীবনে পাইনি। কাআব বললো, আমি আরবের এমন এক রমণীকে বিয়ে করেছি, যে খুশবু খুব ভালোবাসে। আর সে অত্যন্ত সুন্দরীও। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, আমাকে অনুমতি দিন। আমি আপনার চুলের খুশবু শুঁকতে চাই। সে বললো, অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি তার মাথার চুল ধরে শুঁকে নিলেন এবং তাঁর সাথীদেরকে সে ঘ্রাণ শুঁকালেন। তারপর তার মাথা ছেড়ে দিলেন। পুনরায় আবার শুঁকতে লাগলেন। তার চুলের গোছা শক্তভাবে মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমনের গর্দান উড়িয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথীরা কাআবের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারার দিকে যাত্রা করলেন। আক্রমণের সময় ঘটনাক্রমে হারেছ ইবনে আউস সাথীদের তলোয়ারের আঘাত পেয়েছিলেন। কাআবের পরিবারের লোকজনও ঘরের বাইরে এসেছিলো। তারা একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ স. এর সাথীদের

কাউকেই তারা দেখতে পায়নি। অভিযান সফলকারী সাহাবীগণ জান্নাতুলবাকীতে পৌঁছে উচ্চস্বরে তকবীর বলতে লাগলেন। রসুলেপাক স. তখন কিয়ামে লাইলে মগ্ন ছিলেন। তিনি তকবীরের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বুঝলেন, অভিযান সফল হয়েছে। তিনিও উচ্চ আওয়াজে তকবীর উচ্চারণ করলেন। তাঁরা রসুলুল্লাহ স. এর সামনে এসে কাআবের ছিন্ন মস্তক মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। কাআবের মস্তকটিই ছিলো প্রথম মস্তক, যা ইসলামের দুশমনদের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিলো। রসুলেপাক স. আল্লাহ্পাকের শুকরিয়া আদায় করলেন। তিনি তাঁর পবিত্র মুখের লালা হারেছ ইবনে আউসের জখমে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেলো। আলহামদু লিল্লাহি আলা যালিক।

কোনো কোনো খর্বজ্ঞানধারী ও বক্রমতিসম্পন্ন লোক এরকম ধারণা করে যে, কাআব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার ব্যাপারে যে বাহানার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিলো, তা ছিলো নবুওয়াতের মর্যাদাবিরোধী। আক্ষেপ তাদের প্রতি। এরকম অপপ্রশ্ন তো কেবল তাদের কুটিল মনোভাবকেই প্রকাশ করে দেয়। বাহানা এখানে কোথায়। সে হত্যার উপযোগীই তো ছিলো। আল্লাহ্তায়ালাই তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে মুসলমানদের কোনোপ্রকারের চুক্তিও ছিলো না। যে ভাবেই সম্ভব, সেভাবেই তাকে হত্যা করাতে দোষের কিছু নেই। সে যদি যুদ্ধে মারা যেতো, তবুও তো নিহতই হতো। আর যুদ্ধ মানেই তো ধোকা দেওয়া। অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যে ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করা দুষণীয় কিছু নয়। আর মুশরিকদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের অনিষ্ট থেকে জগতবাসীকে হেফাজত করা। মানুষের কল্যাণকামীগণ কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এরকম করে থাকেন। তার দৃষ্টান্তটি এরকম— যেমন, কোনো ফলবান বৃক্ষকে অনিষ্টমুক্ত রাখতে হলে তাকে আগাছামুক্ত রাখতে হয়। পরগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে দিতে হয়। অতিরিক্ত ডালপালা কেটে ফেলতে হয়। অন্যথায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তেমনি মানববৃক্ষের ফল নিরাপদ রাখতে হলে কেটে ফেলতে হয় কাআবের মতো দুর্বৃত্তদের মস্তক।

নাজরান অভিযান

হিজরী তৃতীয় বৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে নাজরানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা। একে বনী সুলায়মের অভিযানও বলা হয়। ওই অভিযানের কারণ ছিলো এরকম— রসুলুল্লাহ্ স. সংবাদ পেলেন, সেখানে বনী সুলায়ম গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হচ্ছে। রসুলেপাক স. তিনশ সাহাবীর একটি দল নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। দেখলেন, বিভিন্ন পানির কূপ ও অন্যান্য জলাশয়সমূহের মধ্যে তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। তিনি স.

অগ্রসর হলেন। মোকাবেলা করার জন্য কেউ এগিয়ে এলো না। অগত্যা সদলবলে ফিরে আসতে হলো তাঁকে। ওই সময় তিনি স. মদীনা মুনাওয়ারায় খলীফা বানিয়ে গিয়েছিলেন হজরত ইবনে উম্মে কুলছুমকে। অভিযানে সময় লেগেছিলো দশদিন। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। আর এই অভিযানের বিবরণ কেবল 'মাওয়াহেব' গ্রন্থেই পাওয়া যায়, অন্য কোনো গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই।

কারওহ্ অভিযান

এ বৎসরেই কারওহ নামক স্থানের দিকে অভিযান পরিচালিত হয়। নজদের কূপসমূহের মধ্যে এটি একটি কূপের নাম। ওই কূপের নামানুসারেই সে জায়গাটির নামকরণ করা হয় কারওহ। ওই অভিযানের পটভূমি ছিলো এরকম— রসুলেপাক স. সংবাদ পেলেন, কুরায়েশদের একটি কাফেলা ইরাকের রাস্তা ধরে সিরিয়ার দিকে যাচ্ছে। ইতোপূর্বে কুরায়েশরা হেজাজের রাস্তা দিয়ে সিরিয়ায় যেতো। কিন্তু বদরের ঘটনার পর থেকে তারা ও পথ মাড়াতো না। বাণিজ্যে যেতো ইরাকের পথ ধরে। কথিত কাফেলা একটি বিরাট বাণিজ্যবহরের সঙ্গী হয়ে যাত্রা করেছিলো। উক্ত কাফেলায় ছিলো আবু সুফিয়ান ইবনুল হারব এবং সফওয়ান ইবনে উমাইয়া। তাদের সঙ্গে অনেক ধন-দৌলত এবং রৌপ্যের তৈজসপত্র ছিলো। রসুলেপাক স. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে হিজরতের আটাশতম মাস জমাদিউল উখরার প্রথম তারিখে একশ আরোহীর সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁর বাহিনী সহকারে উক্ত কাফেলার মুখোমুখি হয়ে গেলেন। বাহিনী দেখে কাফেলার নেতৃস্থানীয়রা পালিয়ে গেলো। অবশিষ্টদেরকে গ্রেফতার করে রসুলেপাক স. এর সম্মুখে নিয়ে আসা হলো। তিনি স. তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মালের এক পঞ্চমাংশ বের করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। জীবনীরচয়িতাগণ লিখেছেন, ওই এক পঞ্চমাংশে পড়েছিলো বিশহাজার দেরহাম। অপর এক বর্ণনানুসারে মালের পরিমাণ ছিলো পঁচিশ হাজার দেরহাম। বাকী মাল অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। এই অভিযানটি কাআব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো বলে ইবনে ইসহাক মন্তব্য করেছেন।

হেজাজের ব্যবসায়ী আবু রাফেকে হত্যা

এ বৎসরই কাআব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার পর হেজাজের ব্যবসায়ী আবু রাফেকে হত্যা করা হয়। তার হত্যাকাণ্ড কাআবের হত্যাকাণ্ড থেকেও বিস্ময়কর ছিলো। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বোখারীতে দু'টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিস দু'টির বিবরণের মধ্যে বিস্তর অসামঞ্জস্য রয়েছে। আমি দু'টো হাদিসই এখানে

উদ্ধৃত করতে চাই। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে জীবনীলেখক বলেছেন, একমত অনুসারে তার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিলো চতুর্থ হিজরীতে। আরেক বর্ণনামতে পঞ্চম বৎসরে। অপর আরেকটি বর্ণনানুসারে ঘটনাটি ঘটেছিলো ষষ্ঠ বৎসরে। সবচেয়ে শক্তিশালী মত এটাই। আমি এ ঘটনার আলোচনা এখানে ওভাবেই উপস্থাপন করছি, যেভাবে বর্ণনা করেছি কাআব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা। সহীহ্ বোখারীতেও এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। কাস্তালানী তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো ষষ্ঠ হিজরীর রমজান মাসে। আবু রাফের নাম কেউ কেউ বলেছেন আবদুল্লাহ। আবার কেউ বলেছেন সালাম বা সাল্লাম। সে ছিলো উবাই আলহাকীকের পুত্র। আর কানানা ইবনে উবাই আলহাকীকের ভাই, সাফিয়ার পূর্ব স্বামী। সাফিয়া সম্বন্ধে আলোচনা আসবে খায়বর যুদ্ধের বর্ণনায়। আবু রাফে হেজাজের মাটিতে এক কেল্লার ভিতরে থাকতো। সেও রসুলেপাক স. ও মুসলমানদেরকে মানসিক যন্ত্রণা দিতে সদাতৎপর ছিলো। রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধগুলোতে সে মুশরিকদেরকে নানাভাবে সাহায্য করতো। তার হত্যার সূত্রপাত ঘটে এভাবে— আউস গোত্রের মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং অন্যান্যরা মিলিতভাবে যখন কাআব ইবনে আশরাফ নিধনে সফল হলেন, তখন খাযরাজ গোত্রের লোকদের মনেও এমতো বাসনা জাগলো যে, তারাও কাআব ইবনে আশরাফের মতো কোনো দ্বীনের দুশমনকে হত্যা করবে। পারস্পরিক পরামর্শের পর সাব্যস্ত হলো যে, আবু রাফেকেই তাহলে হত্যা করা হোক। কারণ সেও কাআবের মতো দূরাচার। আল্লাহ্‌র নবী ও মুসলমানদেরকে সেও কম যন্ত্রণা দেয় না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে সে ধনদৌলত দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করে। উল্লেখ্য, প্রথমেই রসুলেপাক স. তাকে হত্যা করার ব্যাপারে তাদেরকে বলেননি। বরং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা নিজেরাই এ ব্যাপারে তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছিলো। পরে তিনি তাদের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। খাযরাজ গোত্রের লোকেরা কথিত কাজ সম্পাদনের জন্য তাদের ভিতর থেকে একটি দল তৈরী করে নিলো এবং তাদের দলপতি নির্বাচন করলো হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আতীককে। রসুলেপাক স. এর অনুমতি লাভের পর তাঁরা খায়বরে আবু রাফের কেল্লার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁরা সেখানে পৌঁছলেন সুর্যাস্তের সময়। শত্রুপক্ষের পশুগুলো তখন কেল্লার ভিতর প্রবেশ করছিলো। আবদুল্লাহ্ ইবনে আতীক তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা এখানেই বসে থাকো। আমি কেল্লার পাহারাদারের সঙ্গে ভাব করে তোমাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করবো। একথা বলার পর তিনি কেল্লার দিকে অগ্রসর হলেন। আর ওদিকে তাঁর সাথী-সঙ্গীরা প্রস্রাব করার ভান করে মাথা নিচু করে বিভিন্ন স্থানে বসে পড়লেন। তাঁরা এমন ভাব ধরলেন, যেনো তাঁরা এ কেল্লারই সাধারণ অধিবাসী। কেল্লার দারোয়ান বললো, এসো আল্লাহ্‌র বান্দা।

যদি ভিতরে প্রবেশ করতে চাও, তবে জলদি জলদি প্রবেশ করো। আমি এখনই কেল্লার ফটক বন্ধ করে দিবো। আবদুল্লাহ্ ইবনে আতীক বলেন, আমি কেল্লায় প্রবেশ করে যেখানে গাধা বাঁধা হয়, সেখানে চুপি চুপি বসে রইলাম। এভাবে আমি মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় রইলাম। লোকেরা যখন আবু রাফের নিকট থেকে পানাহার সেরে আপন আপন স্থানের দিকে চলে যাচ্ছে, তখন চারিদিক নিস্তব্ধ। তখন আমি দেখলাম, দারোয়ান ফটকের চাবি তাকের উপর রেখে দিয়ে শয়ন করতে চলে গেলো। আমি উঠে গিয়ে চাবি নিয়ে কেল্লার ফটক খুলে দিলাম। কাজটি করলাম এ জন্য যে, কেল্লার লোকজন যদি আমার ব্যাপারে জেনে ফেলে, তাহলে যেনো সেখান থেকে পালাতে পারি। আমি আবু রাফের সন্ধান করতে লাগলাম। দেখলাম, সে তার ভবনেই আছে। জেগেও আছে। গল্পকাররা তাকে গল্প শোনাচ্ছে। বোখারী গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, তাকে তখন লোকেরা কাহিনী শোনাচ্ছিলো। তারা যখন চলে গেলো, তখন আবু রাফেও তার শয়নকক্ষে গিয়ে ঢুকলো। দরজা ভেজানো ছিলো। অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে আমি তার ঘরে ঢুকে পড়লাম। এভাবে কয়েকটা ঘর পেরিয়ে গেলাম আমি। যে ঘরে ঢুকলাম, সেই ঘরেরই দরজা দিলাম বন্ধ করে। এরকম করলাম এজন্যে, কেউ আমার উপস্থিতি টের পেলেও যেনো সরাসরি আমার কাছে আসতে না পারে। এক পর্যায়ে উপস্থিত হলাম তার খাস কামরায়। অন্ধকার ঘর। তবুও বুঝতে পারলাম, এখানেই সে তার পরিবার পরিজনদের সঙ্গে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তার সঠিক অবস্থান স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। ডাকলাম, আবু রাফে! ঘুম ভেঙে গেলো তার। বললো, কে? আমি তার গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে সেদিকেই তলোয়ার চালিয়ে দিলাম। মারাত্মকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম বলে আমার তলোয়ারের আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আবু রাফে চিৎকার করতে লাগলো। আমি কামরার বাইরে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর আমি আবার তার কামরার ভিতরে প্রবেশ করলাম। নিজের গলার স্বর পরিবর্তন করে আমি তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছি, এরূপ ভাব করে বললাম, হে আবু রাফে! কীসের আওয়াজ শুনলাম? সে বললো, তোমার মায়ের প্রতি আক্ষেপ। ঘরের মধ্যে নিশ্চয় কেউ আছে। সে আমার উপর তলোয়ারের আঘাত করেছে। এবারও আমি তার গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে তলোয়ার মারলাম। এ আঘাতও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কিন্তু পরক্ষণেই আমি তলোয়ারের অগ্রভাগ তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। এতো জোরে তলোয়ার চালালাম যে, তাতে তার পেট এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো। তার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যাওয়ার আওয়াজও আমি শুনতে পেলাম। বুঝলাম, তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। কামরার দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম আমি। আকাশে চাঁদ ছিলো। তবুও সবকিছু কেমন ঝাপসা। শূন্যস্থানকে জমিন মনে করে সেখানে পা ফেলতেই ধড়াস করে নিচে পড়ে গেলাম। আমার একটি পা গেলো ভেঙে।

এক বর্ণনায় আছে, আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেলো। ভাঙা পায়ে চাদর পেঁচিয়ে নিলাম। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক সময় মিলিত হতে সক্ষম হলাম সাথীদের সঙ্গে। পরিবার-পরিজনের বিলাপ শ্রবণ করা পর্যন্ত আমি সেখানেই অবস্থান করলাম। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, লোকেরা বলছে, হেজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফে নিহত হয়েছে। তারপর আমার সাথীরা আমাকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় রসুলেপাক স. সকাশে উপস্থিত করলো। অভিযানের বিবরণ শুনে তিনি স. খুবই আনন্দিত হলেন। আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তোমাকে অভিনন্দন। তারপর তিনি স. তাঁর পবিত্র হাত আমার ভাঙা পায়ে বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার পা ভালো হয়ে গেলো। আমি তৎক্ষণাত সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, আবু রাফের হত্যাসংক্রান্ত এই বিবরণটি বোখারীতে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনচরিতের বিভিন্ন গ্রন্থে অবশ্য ঘটনাটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে। তবে যতটুকু সহীহ্ বোখারীতে রয়েছে, ততটুকু বর্ণনা করাই অধিকতর উত্তম।

ইমাম হাসানের জন্ম

তৃতীয় হিজরীর ১৫ই রমজান রসুলে আকরম স. এর নয়নমনি তাঁর প্রিয় দৌহিত্র হজরত ইমাম হাসান জন্মগ্রহণ করেন।

হজরত ওছমানের সঙ্গে সাইয়্যেদা উম্মে কুলসুমের বিবাহ

তৃতীয় হিজরীতেই রসুলেপাক স. এর প্রিয় কন্যা সাইয়্যেদা হজরত উম্মে কুলছুমের বিবাহ সম্পাদিত হয়। তিনি হজরত ওছমানের সঙ্গে বিবাহবদ্ধ হন তাঁরই সহোদরা সাইয়্যেদা রুকিয়ার পরলোকগমনের পর। তিনি পরলোকগমন করেন বদরের যুদ্ধের সময়।

এ বৎসরই রসুলেপাক স. হজরত ওমর ফারুকের কন্যা হজরত হাফসাকে এবং হজরত যয়নব বিনতে খুযায়মাকে বিবাহ করেন।

উহুদ যুদ্ধ

হিজরতের তৃতীয় বৎসরে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শাওয়াল মাসের এগার, মতান্তরে সাত রাত অতিবাহিত হওয়ার পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেন, শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, বদরের যুদ্ধের এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর এ যুদ্ধ হয়েছিলো। তিনি এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের একত্রিশতম মাসের প্রারম্ভে

উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহুদ যুদ্ধও ইসলামের অন্যতম মহান যুদ্ধ। ইসলামের শক্তিবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এ যুদ্ধও বদর যুদ্ধের মতো। তবে ব্যাতিক্রম এটুকুই যে, বদর যুদ্ধ ছিলো সৌন্দর্য, অনুগ্রহ ও পূর্ণতায় ভাস্বর। আর উহুদ যুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছিলো আল্লাহ্তায়ালার শান-শওকত ও মাহাত্ম্য। এ যুদ্ধে বদর যুদ্ধের কয়েদীদের ফিদ্য়ার বদলা দেওয়া হয়েছিলো মুসলমানদের পক্ষ হতে, যার বর্ণনা ইতোপুর্বে করা হয়েছে। এ যুদ্ধে কোনো কোনো সাহাবী রসুলেপাক স. এর নির্দেশিত স্থানে সুদৃঢ় অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা গনিমতের মালের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন— 'মিনকুম মাঁই ইউরীদুদ্ দুন্ইয়া ওয়া মিনকুম মাঁই ইউরীদুল আখিরাত' (তোমাদের কতক ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল) (৩ঃ১৫২)। এ আয়াতে মুসলমানদের ভয়ানক পরিণতির প্রতি ইশারা করা ছাড়াও অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ্। 'মাআরেজ' পুস্তকে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধ মুসলমানদেরকে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন করে দিয়েছিলো। পরিশেষে আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদেরকে বিজয়, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। 'মাওয়াহেব' পুস্তকে সংকলিত হয়েছে, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে, উহুদ যুদ্ধে রসুলেপাক স. এর পরাজয় হয়েছিলো, তাকে তওবা করতে হবে। আর যদি সে তওবা না করে, তবে তাকে কতল করে ফেলতে হবে। কেননা রসুল স. যুদ্ধজয়ের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর প্রতি পরাজয়ের সম্পর্ক করা অবিশ্বাসকে অবধারিত করে, যা কুফরী।

উহুদ মদীনা মুনাওয়ারার একটি বিখ্যাত পাহাড়। এটি 'তাওয়াহ্হুদ' শব্দ থেকে গঠিত, যার অর্থ একক। পাহাড়টি মদীনার অন্যান্য পাহাড় থেকে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন। এটি একটি উপত্যকা। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে উত্তর দিকে দু'মাইল বা তার চেয়ে কিছু দূরে অবস্থিত। উহুদ পাহাড়ের সঙ্গে অন্য কোনো পাহাড় মিলিত নয়। এ হিসেবেই তার নাম হয়েছে উহুদ। স্থানটি ইমান ও তওহীদপন্থীদের সাহায্যের স্থান। ইসলামপন্থীদের খ্যাতি ও মর্যাদার সাথে এ পাহাড়ের নামকরণের বিষয়টি জড়িত। তবে প্রকাশ্য কথা হচ্ছে, এ নামের প্রচলন হয়েছিলো ইসলামের পূর্বেই। বহু হাদিসে এ পাহাড়ের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। 'জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' পুস্তকেও এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে তার কিছু আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

উহুদ পাহাড়ের মর্যাদা সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে, 'উহাদুন জাবালুন ইউহিব্বুনা ওয়া নুহিব্বুহু' (উহুদ এমন একটি পাহাড়, যে আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি)। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসুলেপাক স. এর দৃষ্টি উহুদ পাহাড়ের উপর পতিত হলো।

তিনি উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করলেন। তারপর বললেন, এটি বেহেশতের দরজাসমূহের মধ্য হতে একটি দরজার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর তিনি স. মদীনা শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত আইর নামক পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করে তার সমন্ধে বললেন, আইর এমন একটি পাহাড় যে আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। আমরাও তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করি। এটি দোজখের দরজাসমূহের মধ্য হতে একটি দরজার উপর প্রতিষ্ঠিত। হাদিস দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ভালোবাসা-শত্রুতা, সৌভাগ্যশালীতা, হতভাগ্যতা জড় পদার্থের মধ্যেও থাকতে পারে। ইমাম নববী বলেছেন, উপরোক্ত হাদিসে দু'পক্ষ থেকে মহব্বত হওয়া, অর্থাৎ রসুলেপাক স. এর উহুদ পাহাড়কে ভালোবাসা এবং উহুদ পাহাড় রসুলেপাক স.কে ভালোবাসার তাৎপর্যটি হকিকতের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ভালোবাসার বিষয়টি রূপকার্থক নয়, প্রকৃতার্থক। আর সে কারণেই উহুদ পাহাড় ওই বেহেশতে প্রবেশ করবে যেখানে রসুলেপাক স. থাকবেন। কেননা এক হাদিসে এসেছে, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে। পাহাড়ের মধ্যে এশক ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া জড় পদার্থের তসবীহ পাঠ করার মতো। আল্লাহ্‌তায়ালা যেমন বলেছেন,'ওয়া ইম মিন শাই্‌ইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি' (এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা) (১৭ঃ৪৪)। পাহাড় ও সমস্ত জড় পদার্থ যদি আল্লাহ্‌তায়ালার হামদ, তসবীহ ও যিকির করতে পারে তবে আল্লাহ্‌র হাবীবকে তারা ভালোবাসতে তো পারবেই। রসুলেপাক স. উহুদ পাহাড়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন 'হে উহুদ! প্রশান্ত হও। তোমার উপর এখন নবী এবং শহীদ রয়েছেন'। এই হাদিসটিও পাহাড়ের মধ্যে বোধ-বিবেচনা, জ্ঞান ও ভালোবাসা বিদ্যমান থাকার দলিল। রসুল স.কে পাথরের সালাম করা এবং উস্তুনে হান্নানার রোদনের ঘটনা দু'টিকেও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। পাহাড়ের ভালোবাসা ও শত্রুতার অর্থ যদি করা হয় সেখানকার অধিবাসীদেরকে ভালোবাসা ও তাদের প্রতি শত্রুতা করা, তাহলে তা হবে অপব্যাখ্যা এবং চরম মুর্খতার পরিচায়ক। কেউ কেউ বলেন, উহুদ পাহাড়ের ব্যাপারে রসুলেপাক স. এর এ ধরনের বক্তব্য হচ্ছে তাঁর মনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ, যা তিনি স. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর করতেন। সফর থেকে ফেরার পর মদীনা শহর বা উহুদ পাহাড়কে দেখে মনে মনে খুশি হয়ে যেতেন তিনি। ওই খুশীই মুখের ভাষা হয়ে প্রকাশিত হতো। তাই বর্ণিত হাদিস উহুদ পাহাড়ের জ্ঞান ও বোধ থাকার প্রমাণ নয়। একথার উত্তরে ওই সকল কথাই বলতে হয়, যা বলেছেন দিব্যদর্শী (আহলে কাশফ)গণ। কিন্তু ওই বিবরণগুলো হবে দীর্ঘ। তাই আমরা এখন মূল আলোচনার দিকে ফিরে আসছি।

কুরায়েশ মুশরিকরা যখন বদর প্রান্তর থেকে পলায়ন করে মক্কায় পৌঁছলো, তখন আবু সুফিয়ান তার কাফেলা মক্কায় নিয়ে এলো। তার নির্দেশে

বাণিজ্যসামগ্রীসমূহ দারুন নদ্‌ওয়ায় রাখা হলো। কুরায়েশদের নেতৃস্থানীয় অনেক লোক তাদের পুত্রসহ মারা গিয়েছিলো বদর যুদ্ধে। আবু সুফিয়ান এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কুরায়েশদেরকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে এগিয়ে এসো। এখন আমাদের বিপুল অর্থ-সম্পদ প্রয়োজন। একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে আমাদেরকে। নিতে হবে প্রতিশোধ। আক্ষেপ তোমাদের প্রতি! এখনো তোমাদের অন্তরে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে জিঘাংসার আগুন জ্বলে উঠছে না কেনো? আবু সুফিয়ানের তখনকার দম্ভোক্তি ছিলো এরকম। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার মহান বাণী যে অন্যরকমের। যেমন তিনি বলেন, 'ইন্না মিনাল মুজ্বরিমীনা মুনতাক্বিমুন' (নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব)।

রসুলে আকরম স. এর জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, কাফেরদের মালের পরিমাণ ছিলো একহাজার উট, যার মূলধনের মূল্য ছিলো পঞ্চাশ হাজার মিছকাল। আর তা থেকে প্রাপ্ত লাভের মূল্য ছিলো বিশ হাজার মিছকাল। তারা সব মালের আসল মূল্যের অর্থ মালিকদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে লভ্যাংশের অর্থ সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার কাজে ব্যয় করলো। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, 'ইন্নাল লাজীনা কাফারূ ইউনফিক্বুনা আমওয়ালাহুম লিইয়াসুদ্দু আ'ন সাবীলিল্লাহী ফাসাইউন্‌ফিক্বুনাহা ছুম্মা তাকূনু আ'লাইহিম হাস্‌রাতান ছুম্মা ইউগলাবুন' (আল্লাহ্‌র পথ হইতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিরগণ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে; অতঃপর উহা তাহাদের মনস্তাপের কারণ হইবে, ইহার পর তাহারা পরাভূত হইবে) (৮ঃ৩৬)।

তারপর তারা তীক্ষ্ণভাষী কতিপয় লোককে ঠিক করলো। আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোককে বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব দেওয়া হলো তাদেরকে। মেয়েদেরও একটি ছোট দল তাদের সঙ্গে পাঠানো হলো। উদ্দেশ্য তারা বদরের যুদ্ধে নিহতদের নামে শোকগাঁথা গেয়ে গেয়ে মানুষদের মনে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়ে তুলবে। প্রথমে এতে আবু সুফিয়ানের সায় ছিলো না। কিন্তু তার স্ত্রী হিন্দা এবং উতবা ইবনে রবীয়ার কন্যা মেয়েদের দল পাঠানোর ব্যাপারে ছিলো নাছোড়বান্দা।

প্রস্তুতকৃত বাহিনীর সদস্যসংখ্যা হয়ে গেলো তিন হাজার— সাতশ বর্মপরিহিত এবং দু'শ অশ্বারোহী। উটের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। পনেরোটি হাওদা ছিলো মহিলাদের। তারা সকলেই ছিলো সশস্ত্রা। হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তখন মক্কায় ছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর কাছে একটি পত্র লিখলেন। তার মধ্যে ছিলো তাদের সেনাসংখ্যা, অস্ত্র-শস্ত্র এবং রসদসম্ভারের পূর্ণ বিবরণ। পত্রবাহককে হুকুম দিলেন, যে করেই হোক তিন দিনের মধ্যে চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দিতেই হবে। কাফেরবাহিনী মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলো। এ

বাহিনীর সেনাধিনায়ক আবু সুফিয়ান। কাফেরদের এ বাহিনী মদীনা থেকে পাঁচ মাইল দূরে যুলহুলায়ফায় গিয়ে ঘাঁটি গাড়লো। তিন দিন অতিবাহিত হলো। রসুলেপাক স. তাদের অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করলেন হজরত খাব্বাব ইবনে মুনযেরকে। হজরত আব্বাস পত্র মারফত যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তিনিও ফিরে এসে অনুরূপ সংবাদই দিলেন। তখন রসুলেপাক স. বললেন, '................ হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীলু আল্লাহুম্মা বিকা হুলু ওয়া বিকা আসুলু' (আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক। হে আল্লাহ্! তোমারই সকাশে সাহায্য যাচনা করি। তোমার কাছেই চাই শান শওকত)। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শত্রুর আক্রমণাংশকার সময়ে এভাবেই আল্লাহ্র আশ্রয়প্রার্থী হওয়া এবং তাঁর প্রতি ভরসা করা উচিত। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' পুস্তকে ওয়াকেদী থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুশরিকরা আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছলো। সেখানে ছিলো রসুলেপাক স. এর মাতা হজরত আমেনার কবর। তারা তাঁর কবর খনন করে পুরাতন হাড়গুলো কবর থেকে উঠিয়ে নিতে চাইলো। উদ্দেশ্য— যদি তারা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাদের রমণীরা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, তবে তারা তাঁর মায়ের হাড়সমূহ জিম্মী হিসাবে ব্যবহার করবে। তখন মুসলমানগণ বন্দী নারীদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। আর কোনো নারী তাঁদের হাতে বন্দী না হলেও অত্যন্ত চড়া মূল্যে তারা তাঁর কবরের হাড় হস্তান্তর করতে পারবে। আবু সুফিয়ানের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া হলে সে একে নির্বুদ্ধিতা হিসেবে আখ্যায়িত করে বললো, মোহাম্মদের গোত্র বনী বকর ও খাযাআ যদি এ সংবাদ জানতে পারে, তবে তারা আমাদের সকল কবরবাসীর হাড়সমূহ কবর থেকে তুলে ফেলবে। আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে আরো অগ্রসর হলো। উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যতনে ওয়াদীতে পৌঁছে মদীনার মুখোমুখি তাঁবু ফেললো। শুক্রবারের রাত্রি অতিবাহিত হলো। শনিবার দিন দু'দল মুখোমুখি হয়ে গেলো। হজরত সাআদ ইবনে মাআয, হজরত সাআদ ইবনে উবাদা, হজরত উসায়দ ইবনে হুযায়র এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর একটি দল অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রসুল স.কে পাহারা দিতে লাগলেন। সারারাত জেগে রইলেন তাঁরা। অন্যান্য আরও কিছু মুসলমান রাতে মদীনায় পাহারা দিলেন। ওই রাতে রসুলেপাক স. একটি স্বপ্ন দেখলেন। সকাল হলে তিনি স. বললেন, স্বপ্নে দেখলাম, আমি কতকগুলো গাভী যবেহ করছি এবং আমার তলোয়ার ছিদ্র হয়ে গেছে। আরো দেখলাম, আমার হাতে দৃঢ়ভাবে যুদ্ধবর্ম ধারণ করে আছি। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে স্বপ্নের এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। আর 'রওজাতুল আহবাব' এবং 'মাআরেজুন নবুওয়াত' পুস্জকের বর্ণনা এরকম— আমি একটি বর্ম পরিধান করলাম। আমার যুলফিকারে কয়েকটি ছিদ্র হয়ে গেলো।

গাভীগুলোকে মেরে ফেলা হয়েছে— এবং এদের পিছনে রয়েছে যবেহকৃত কতকগুলো দুম্বা। মুনাব্বেহ ইবনে হাজ্জাজ সাহমীর তলোয়ারের নাম ছিলো যুলফিকার। তলোয়ারটি তিনি স. পেয়েছিলেন বদর যুদ্ধের গনিমত থেকে। তখন থেকে সেটি তাঁর কাছেই থাকতো। উহুদ যুদ্ধেও যুলফিকার তাঁর হাতে ছিলো। খন্দকের যুদ্ধে তিনি সেটিকে হজরত আলীর হাতে দিয়েছিলেন। বোখারী শরীফে এরকম একটি তলোয়ার দানের বিবরণ আছে। কাসতালানী বলেছেন, ওই তলোয়ারই ছিলো যুলফিকার। বোখারী শরীফে স্বপ্নের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে— রসুলেপাক স. বলেছেন, স্বপ্নে দেখলাম, আমি তলোয়ার পরিচালনা করছি। এমন সময় মধ্যখান থেকে তলোয়ারটি ভেঙে গেলো। এর ব্যাখ্যা হবে— মুসলমানগণ প্রথমে পরাজিত হবে। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তলোয়ারটি পুনরায় চালালাম। দেখলাম, তলোয়ারটি আগের চেয়ে ভালো হয়ে গেলো। এর ব্যাখ্যা— পরবর্তীতে মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর বিজয় লাভ করবেন। এই হাদিস ও স্বপ্নের বর্ণনা 'রওজাতুল আহবাব' এবং 'মাআরেজুন নবুওয়াত' পুস্তকে উল্লেখ করা হয়নি। স্বপ্নের অবশিষ্টাংশের (আমার হাতে দৃঢ়ভাবে যুদ্ধবর্ম ধারণ করে আছি) অর্থ মদীনা শরীফ। আর যুলফিকার ছিদ্র হয়ে যাওয়ার অর্থ— ওই মুসিবত, যা এসেছিলো যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে। তখন রসুলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র ওষ্ঠ, দন্ত এবং মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলো। জীবনচরিতজ্ঞগণ বলেন, যুলফিকার ছিদ্র হওয়ার অর্থ আহলে বাইতের মধ্য থেকে কারও শহীদ হয়ে যাওয়া। তাই হয়েছিলো। সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা হজরত হামযা ওই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। গরু যবেহ করার মানে হলো অন্যান্য সাহাবীর শাহাদত বরণ।

স্বপ্নের বর্ণনায় 'বাকার' শব্দ এসেছে। 'বাকার' প্রাণীবাচক বিশেষ্য, যার অর্থ গরু। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেছেন, রসুলেপাক স. গরু যবেহ করতে দেখেছেন অর্থ— সাহাবাকেরামের শাহাদত বরণ, কাবাশ অর্থ দুম্বা। সুতরাং 'যবেহকৃত দুম্বা' অর্থ কাফের বাহিনী। তাদের মধ্যে একজন প্রধান লোক ছিলো, যার নাম কাবাশুল কাতাবা। উহুদ যুদ্ধে সে মারা যায়। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' পুস্তকে বলা হয়েছে 'কাবাশ' মানে দুশমনদের বড় বড় যোদ্ধা। এই মিসকীনের (গ্রন্থকারের) মতে 'বাকার' দ্বারা সাধারণ সাহাবাগণকে বুঝানো হয়েছে। আর 'কাবাশ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে। যেমন হজরত হামযা প্রমুখ। তিনি শত্রুর প্রতি আক্রমণ করার সময় ছিলেন দুম্বার মতো ক্ষীপ্রগতিসম্পন্ন। জীবনচরিতজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, আনসারদের মধ্য থেকে দু'জন সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সে কারণে তাঁরা খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন এবং মনে মনে আশা করছিলেন পরবর্তীতে যদি এমন কোনো সুযোগ আসে, তাহলে তাঁরা অবশ্যই তার

সদ্ব্যবহার করবেন। কাআব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে যে সব সাহাবী সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরাও চেয়েছিলেন এধরনের কোনো খেদমতের সুযোগ যদি আসে, তাহলে তাঁরা অবশ্যই তা কাজে লাগাবেন। উহুদ যুদ্ধে সে সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন এবং তা কাজেও লাগিয়েছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে তখন একটি বিষয়ে মতানৈক্য ঘটেছিলো। কেউ কেউ বলেছিলেন, মদীনা থেকে যুদ্ধ করাই ভালো। তাঁরা নারী ও শিশুদেরকে কোনো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন। জীবনরচয়িতাগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর অভিমতও ছিলো অনুরূপ। মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইও এরূপ মন্তব্য করেছিলো। কিন্তু হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, মুহাজিরগণের একটি দল, হজরত সাআদ ইবনে উবাদা এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলতে লাগলেন, মদীনাকে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে আমরা যদি এখান থেকেই শত্রুর মোকাবিলা করি, তাহলে তারা আমাদেরকে দুর্বল মনে করবে। তাদের শক্তি ও সাহস যাবে বেড়ে। বদর যুদ্ধে আমাদের সৈন্যসংখ্যা তিন'শর অধিক ছিলো না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ্পাকের প্রশংসা, আমরা তো এখন অধিকতর শক্তিশালী ও সুগঠিত। সংখ্যায়ও আমরা এখন কম নই। এখন আর আমরা ভীরু ও কাপুরুষও নই। দীর্ঘ সময় ধরে এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায় আমরা ছিলাম। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর পিতা হজরত মালেক ইবনে সেনান বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র শপথ! দু'টি অবস্থাই আমাদের জন্য ভালো। বিজয়ী হবো, না হয় হবো শহীদ। দু'টোই আমাদের পছন্দ। হজরত হামযা বললেন, শপথ ওই জাতপাকের! যিনি আপনার উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, আমি ওই সময় পর্যন্ত রোজা রাখবো, ইফতার করবো না, যতক্ষণ না মুশরিকদের উপরে তলোয়ারের আঘাত হানতে পারবো। হজরত নোমান ইবনে মালেক, যিনি আনসারদের মধ্যে ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাহসী ও বীর, তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! গরু যবেহ হওয়া যা আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, তা হচ্ছে আমার শহীদ হওয়ার সংবাদ। শপথ ওই আল্লাহ্র! যিনি ছাড়া আর কোনো প্রভুপালক নেই, আমি বেহেশতে প্রবেশ করবো। রসুলেপাক স. বললেন, কারণ? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসি। আর আমি যুদ্ধ থেকে কখনও বিমুখ হই না। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। হজরত নোমান ইবনে মালেক সত্যিই উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। এতে করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একজন খাঁটি মুমিন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করার শপথ যদি করে, তবে তা যথার্থ হবে। ইচ্ছা করার ব্যাপারে ভালো ইচ্ছা করাই উচিত। এটি হচ্ছে আল্লাহ্র রহমতের আশার প্রাবল্য এবং সেই জাতপাকের প্রতি সুধারণা। 'নিশ্চয়ই তিনি সে ব্যাক্তিকে নিরাশ করেন না যে তাঁকে আশা করে'।

মোটকথা, রসুলেপাক স. এর কাছে সাহাবীগণ যখন এভাবে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন তিনিও আর দ্বিমত করলেন না। তাঁদের মতেই মত দিয়ে জুমার খুতবায় তাঁদেরকে অনেক সদুপদেশ দিলেন এবং যুদ্ধজয়ের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে বললেন। বললেন, তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং দৃঢ়তা অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে। তারপর দিলেন যথাপ্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ। মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে যারা ছিলেন, তাঁরা এতে খুব খুশি হলেন। আসরের নামাজ সম্পাদনের পর তিনি স. তাঁর হুজরা শরীফে প্রবেশ করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকও সঙ্গে গেলেন। তাঁরা দু'জনে তাঁর মাথার শিরোস্ত্রাণ ঠিক করে পরিয়ে দিলেন যুদ্ধবর্ম। শরীরে ঝুলিয়ে দিলেন কোষবদ্ধ তরবারী। হুজরা শরীফের বাইরে অনেক লোক সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হজরত সাআদ ইবনে মাআয এবং হজরত উসায়দ ইবনে হুযায়র বললেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর উপর যেহেতু আসমান থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তাই উত্তম যে, তাঁর বাহনের লাগাম তাঁর পবিত্র হাতেই শোভা পাক। তাঁর উপরে কোনোপ্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপ না করাই সমীচীন। এরকম কথাবার্তা যখন চলছিলো তখন তিনি স. বর্মপরিহিত অবস্থায় শিরোস্ত্রাণশোভিত হয়ে কটিদেশে তলোয়ার ঝুলিয়ে এবং হাতে তীর ধনুক নিয়ে মনোহর ভঙ্গিতে হুজরা শরীফ থেকে বেরিয়ে এলেন। সাহাবাকেরাম সচকিত হলেন। তীব্র আবেগ স্তিমিত হলো তাঁদের। তাঁরা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আপনার যা মর্জি হয়, আপনি তা-ই করুন। আমরা ভুল করেছি। আমাদের আবেগকে আপনার অভিমতাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছি। রসুলেপাক স. বললেন, এখন আর সিদ্ধান্ত বদলানোর উপায় নেই। নবীগণের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তাঁরা যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করবেন, অথচ তাঁদের এবং তাঁদের শত্রুগণের মধ্যে আল্লাহ্ কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে তা খুলে ফেলাবেন। এখন আমি তোমাদেরকে যা বলি, তা শোনো এবং আমল করো। ধৈর্য ও দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকো। তাহলে বিজয় তোমাদেরই হবে। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ যুদ্ধের ব্যাপারে প্রথম থেকেই মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো। অবশেষে মদীনার বাইরে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করার বিষয়টিই রসুলেপাক স. মেনে নিয়েছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার এই বিধান অনুসারে— 'ফাইজা আ'যামতা ফাতাওয়াক্কাল আ'লাল্লাহ্' (যখন দৃঢ়প্রত্যয়ী হইয়া যাইবে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ভরসা করিও) (৩ঃ১৫৯)। এ যুদ্ধে তিনটি পতাকা সাজানো হয়েছিলো। মুহাজিরগণের পতাকাবাহী ছিলেন হজরত আলী। কেউ কেউ বলেন, হজরত মুসআব ইবনে ওমায়ের। আউস গোত্রের পতাকাবাহী ছিলেন হজরত সাআদ

ইবনে উবাদা। আর খাযরাজ গোত্রের পতাকা ধারণ করেছিলেন হজরত খাব্বাব ইবনুল মুনযির।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে কুলছুমকে মদীনার খলীফা নিযুক্ত করা হলো। তারপর মুসলিমবাহিনী উহুদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলো। রসুলেপাক স. ছিলেন অগ্রবর্তী বাহিনীতে। পুরো ইসলামী লশকর তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলো। তাঁদের মধ্যে একশ জন ছিলেন বর্মপরিহিত। ইসলামীবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো এক হাজার। অপর এক বর্ণনামতে নয়শ'। হজরত সাআদ ইবনে মুআয এবং হজরত সাআদ ইবনে উবাদা বর্ম পরিধান করে রসুলেপাক স. এর আগে আগে চললেন। ইসলামীবাহিনী যখন শায়খাইন মনযিলে পৌঁছলো, তখন শত্রুবাহিনীর একটি ব্যূহ দৃষ্টিগোচর হলো। তাদের হট্টগোল কানে আসছিলো। রসুলুল্লাহ্ স. জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? বলা হলো, এরা হচ্ছে ইহুদীদের সহযোগী আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের লোক। এখানে এসে তিনি স. মুসলিমবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা গণনা করলেন। তখন সাহাবাকেরামের অপ্রাপ্তবয়স্কদের একটি ছোটো দল দেখা গেলো। ওই দলে ছিলেন সর্বহজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, যায়েদ ইবনে ছাবেত, উসামা ইবনে যায়েদ, যায়েদ ইবনে আরকাম, বারা ইবনে আজীব, আবু সাঈদ খুদরী, সামুরা ইবনে জুন্দুব, রাফে ইবনে খাদীয এবং তাঁদের বয়সী আরও অপ্রাপ্তবয়স্ক সাহাবী। অল্প বয়স হওয়ার কারণে রসুলেপাক স. তাঁদেরকে মদীনায় ফিরে যেতে বললেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! রাফে একজন পারদর্শী তীরন্দাজ। একথা শুনে তিনি স. তাঁকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকার অনুমতি দিলেন। হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি রাফেকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, অথচ কুস্তিতে সে আমার সঙ্গে পারে না। রসুলেপাক স. বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমরা দু'জনে কুস্তি করে দেখাও। দু'জনের মল্লযুদ্ধ শুরু হলো। সামুরা রাফেকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। এভাবে সামুরা ইবনে জুন্দুবও যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেলেন।

সূর্য অস্তমিত হলো। হজরত বেলাল আজান দিলেন। রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। রাত কাটাতে হলো সেখানেই। রসুলেপাক স. রাত্রিযাপন করলেন বনী নাজ্জার গোত্রের সঙ্গে। তিনি মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে পঞ্চাশজন লোকসহ লশকরকে পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত করলেন। মুশরিকরা গোপনে গোপনে নিকটে এসে দেখে গেলো মুসলমানরা কী করে। ওদিকে কাফেরবাহিনীর প্রধান প্রহরী ছিলো ইকরামা ইবনে আবু জাহেল। রসুলেপাক স. রাতের শেষ প্রহরে গাত্রোত্থান করলেন এবং দুশমনদের কাছে পৌঁছতে গেলে কোন পথে যাওয়া উত্তম, সে সম্পর্কে জানতে চাইলেন। পথপ্রদর্শক হিসেবে এগিয়ে এলেন হজরত আবু হাশমা হারেছী। এরপর রসুলেপাক স. তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। হজরত আবু হাশমা আগে আগে

চললেন। তাঁর অনুসরণে সাবধানতার সাথে তিনি স. পৌঁছলেন উহুদ উপত্যকায়। রাস্তায় মুনাফিকদের একটি মহল্লা অতিক্রম করতে হলো। সেখানকার প্রধান মুনাফিক ছিলো মারবা ইবনে কিবতী। সে যাহেরী ও বাতেনী উভয় দিক দিয়েই ছিলো অন্ধ। সে মুসলিমবাহিনীর উপর ধূলি নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। রসুলেপাক স. এর কাছে এসে বলতে লাগলো, আপনি যদি নবীই হতেন, তাহলে আমার মহল্লায় ঢুকে মহল্লাটি খারাপ করতেন না। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদ আশহালী তীর মেরে তার মস্তক ছিন্ন করে দিলেন। রসুলেপাক স. বললেন, 'দা'হু ফাইন্নাহুল আ'মা আ'মাল ক্বাল্ব' (ওকে ছেড়ে দাও। ওতো একটি অন্ধ। তার অন্তরও অন্ধ)। কিন্তু ততক্ষণে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে।

রসুলেপাক স. উহুদ প্রান্তরে পৌঁছলেন ফজরের নামাজের সময়ে। হজরত বেলাল আজান ও একামত দিলেন। কাতার সোজা করা হলো। তিনি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করলেন। তিনি স. আগে থেকে একটি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তার উপর আরেকটি বর্ম পরিধান করলেন। মস্তকের শিরস্ত্রাণ ঠিক করে নিলেন। তাঁর এমতো পবিত্র আবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আসবাব-উপকরণ গ্রহণ করা এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখা তাওয়াককুলের (আল্লাহ্নির্ভরতার) পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে তাওয়াক্কুল হচ্ছে তকদীরে ইলাহীর উপর ভরসা রাখা। আসবাবের সাথে সম্পর্ক রাখা তকদীরেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। রসুলেপাক স. ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। যিনি যেমন বীর তিনি তো যুদ্ধের ময়দানে হবেন শত্রুর প্রতি তেমনই বেপরোয়া। এটাই স্বাভাবিক। আর তিনি তার সমরাস্ত্রসমূহের প্রতি ততটুকু হুঁশিয়ারও নিশ্চয় হবেন। জীবনচরিতজ্ঞগণ বলেছেন, মুনাফিকপ্রধান আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তিনশ লোকের একটি দল নিয়ে উহুদ প্রান্তরে এসেছিলো। সে এ পর্যন্ত এসে ফিরে গেলো। তবে সুসাব্যস্ত মত হচ্ছে, উহুদ প্রান্তরে পৌঁছার পূর্বেই সে তার লোকজন নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো। কেননা উহুদ মুমিন ও তৌহীদপ্রেমিকদের স্থান। এরকম একটি মত পাওয়া যায় যে, রসুলেপাক স. তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

উহুদের যুদ্ধক্ষেত্র

উহুদের ময়দানে মুসলিমবাহিনী পৌঁছার পর দু'পক্ষই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। মুসলমানগণ উহুদ পাহাড়ের নিচে, অর্থাৎ তার পাদদেশে কাতার করলেন। রসুলেপাক স. নিজে সাহাবীগণের কাতার ঠিক করে দিলেন। তিনি এভাবে কাতার ঠিক করে দিচ্ছিলেন, যাতে উহুদ পাহাড় পিছনে এবং মদীনা শরীফ সামনে পড়ে। উহুদ প্রান্তরে একটি পাহাড় আছে— যার নাম আইনাইন। সে পাহাড়ে ছিলো

একটি বিপজ্জনক উপত্যকা। দুশমনদের আক্রমণাশংকা ছিল সেদিক থেকেই। রসুলেপাক স. পঞ্চাশজন তীরন্দাজ সৈন্যের একটি দলকে সেখানে মোতায়েন করলেন। অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরকে। তাঁদেরকে এইমর্মে সাবধানও করে দেওয়া হলো যে, যুদ্ধে যে পক্ষই জিতুক না কেনো, পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়া যাবে না। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে তাকিদ দিলেন এভাবে— তোমরা যদি দেখো যে, পাখিরা এসে আমাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তবুও তোমরা এ স্থান ত্যাগ কোরো না, যতক্ষণ না আমি তোমাদেরকে ডেকে পাঠাই। যদি দেখো যে, আমরা শক্রবাহিনীকে পরাভুত করে দিয়েছি, তবুও তোমরা এ স্থান ছেড়ো না। তারা যদি আমাদের সকলকে হত্যাও করে ফেলে, তবুও যেনো এ স্থান ত্যাগ করা না হয়।

হজরত উকাশা ইবনে মেহসান আযাদীকে দক্ষিণবাহিনীর প্রধান, হজরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আযাদ মাখযুমীকে বামবাহিনীর প্রধান, হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহকে এবং হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে অগ্রবর্তী প্রধান এবং হজরত মেকদাদ ইবনে আমরকে পশ্চাৎবর্তীবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হলো। মুশরিকরাও তাদের বাহিনী প্রস্তুত করলো। খালেদ ইবনে ওলীদ হলো দক্ষিণবাহিনীর প্রধান, ইকরামা ইবনে আবু জাহেলকে বামবাহিনীর প্রধান। আবু সুফিয়ান অবস্থান গ্রহণ করলো বাহিনীর মধ্যভাগে। তারা সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে, মতান্তরে আমর ইবনুল আসকে পিছনে পাহাড়ের প্রবেশপথে নিযুক্ত করে দিলো। আবদুল্লাহ্ ইবনে রবীয়াকে করা হলো তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক। আর ঝাণ্ডা বহন করার দায়িত্ব পেলো তালহা ইবনে আবু তালহা। তাকেই কাবাশুল কাতীবা বলা হতো। জীবনচরিতজ্ঞগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর তরবারীর গায়ে লেখা ছিলো এই কবিতাংশটি—

ফিল জ্বাবানিআ'দি ওয়াফিল আক্ববালি মুকাররামা
ওয়া ফিল মাররা বিল জ্বাবালি লা ইয়ানজু মিনাল ক্বাদরি

অর্থঃ কাপুরুষতার মধ্যে রয়েছে লজ্জা, আর সামনে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে আছে সম্মান। মানুষ কাপুরুষতা করে, কিন্তু তার তকদীর থেকে পরিত্রাণ পায় না।

রসুলেপাক স. তরবারীটি হাতে নিয়ে বললেন, কে আছো, যে এ তরবারীর হক আদায় করতে পারবে? অনেক লোক এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি স. তরবারীটি কাউকেই দিলেন না। পূর্ববৎ নিজের কাছেই রাখলেন। হজরত আবু দাজানা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এর হক কী? তিনি স. বললেন, এ তরবারীর হক হচ্ছে, একে এমন গতিতে পরিচালিত করতে হবে যে, এটা দুশমনের শরীরে লাগা মাত্রই যেনো তার দেহ হয়ে যায় খণ্ড-বিখণ্ড। হজরত আবু

দাজানা বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমি এটার হক সহকারেই গ্রহণ করলাম। তিনি স. তাঁকে তলোয়ারটি প্রদান করলেন। আবু দাজানা ছিলেন যথার্থই বীর পুরুষ। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মনোহর ভঙ্গিতে নেচে নেচে দুশমনদের মোকাবিলায় এগিয়ে যেতেন। রসুলেপাক স. তাঁকে দর্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে দেখে বললেন, এ ধরনের গর্বিত ভঙ্গি হক তায়ালার অপছন্দনীয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নয়।

হজরত আবু দাজানা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। তিনি তখন মাথায় লাল কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধেছিলেন। জীবনচরিতপ্রণেতাগণ বলেছেন, তিনি মাথায় লাল কাপড়ের পট্টি বেঁধে ময়দানে প্রবেশ করলেন। যাকে সামনে পেলেন, তাকেই ক্ষীপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ করলেন। যে সামনে পড়লো সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারলো না। এক পর্যায়ে তিনি উঠে গেলেন পাহাড়ের ওই টিলায়, যেখানে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা অন্যান্য মেয়েলোকদেরকে নিয়ে কাফেরদের বিজয় সঙ্গীত পরিবেশন করছিলো, আর দফ বাজাচ্ছিলো। তারা বদর যুদ্ধে মৃত্যুবরণকারীদের নামে বিলাপ করছিলো। তিনি তখন তরবারী উঁচিয়ে ধরলেন হিন্দার প্রতি। তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ক্ষান্ত হলেন এবং বললেন, এ তরবারী অত্যন্ত সম্মানের। কোনো নারীর রক্ত দিয়ে একে আমি অপবিত্র করতে চাই না।

দু'পক্ষ থেকেই যুদ্ধের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। জীবনালেখ্যরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, কাফেরবাহিনীর পক্ষ থেকে মুসলমান বাহিনীর উপর যে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলো তার নাম আবু আমের ফাসেক। কাফেররা তাকে আবু আমের রাহেব বলতো। সে তার সম্প্রদায়ের পঞ্চাশজন লোক নিয়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে সে উচ্চস্বরে বললো, আনা আমের (আমি আমের)। মুসলমানগণ তার জবাবে বললেন, 'লা মারহাবাম বিকা ওয়া লা আহলান ইয়া ফাসেক'। তারপর সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তীর নিক্ষেপ করা শুরু করলো। কুরায়েশদের কিছু লোকও ছিলো তার সঙ্গে। তারা মুসলমানদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। মুসলমানগণও তাদের উপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে ফাসেক তার সাথী-সঙ্গীদের ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। ওই হতভাগা রসুলেপাক স. এর নূরে নবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার পুর্বে তাঁর অবস্থা ও আবির্ভাব সম্পর্কে মানুষকে উজ্জীবিত করতো। আর আবির্ভাবের পর সে তাঁকে অস্বীকার করা শুরু করে দেয়। শেষে সে রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়।

কুরায়েশদের পতাকাধারী তালহা ইবনে আবু তালহা প্রতিপক্ষকে আহ্বান করে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। তাকে মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হলেন হজরত

আলী। সজোরে তার মাথায় তরবারীর আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। হজরত আলী ফিরে এলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তালহাকে খতম না করে ফিরে এলেন কেনো? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তালহার মস্তকে আঘাত করলাম। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর অমনি তার লজ্জাস্থান উন্মোচিত হয়ে গেলো। সে আমাকে কসম দিলো, তাকে যেনো আমি লজ্জিত না করি। এমতাবস্থায় পুনরায় তার উপর আঘাত করতে আমার লজ্জা হলো। আর আমি এও জানি যে, অল্পক্ষণ পরেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। কোনো কোনো বিবরণে আছে, তাকে হত্যা করেছিলেন হজরত মাসআব ইবনে ওমায়ের। জীবনীলেখকগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. যে কাবাশে কাতীবা (দুম্বা)কে স্বপ্নে যবেহ করতে দেখেছিলেন, সে হচ্ছে এই লোক।

মুসলমানগণ মুশরিকদের উপর অনবরত আক্রমণ করতে লাগলেন এবং তাদের প্রতিরক্ষাব্যুহ ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। এরপর হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ময়দানে অবতীর্ণ হলেন এবং কাফেরদের পতাকাবাহী ওছমান ইবনে আবু তালহাকে হত্যা করলেন। তিনি তার বাহুদ্বয়ের মধ্যখানে তরবারী ঢুকিয়ে দিলেন। একটি বাহু কাটা পড়লো। তার ফুসফুসও বেরিয়ে পড়লো। তিনি তাঁর সারিতে ফিরে এলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন, আনা ইবনু খাকিয়িল হাজীজ (আমি হাজ্বীদের পানি সরবরাহকারীর সন্তান)। অর্থাৎ তিনি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। আবদুল মুত্তালিব কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং হজ্বের সময় হাজ্বীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্বে ছিলেন।

এরপর আবু সাআদ ইবনে আবু তালহা কাফেরদের পতাকা ধারণ করলো। তাকে হত্যা করলেন হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, উহুদের যুদ্ধে কাফেরদের পতাকা পর্যায়ক্রমে দশ ব্যক্তি ধারণ করেছিলো। এমনকি এক পর্যায়ে একজন নারীও তাদের পতাকা বহন করেছিলো। তার নাম হচ্ছে ওমরা। সে ছিলো আলকামা হারেছিয়ার কন্যা। ওই পতাকাবাহীদের সকলকেই শোচনীয় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো। এমন অবস্থা হয়েছিলো যে, তাদের কেউ মাথা ওঠালেই তার মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেতো। মুসলিমবাহিনী কাফেরদেরকে একদম লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে তারা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। যে সকল কাফের ললনা সঙ্গীতে নিয়োজিত ছিলো, তারা সঙ্গীত বন্ধ করে সেখানে মাতম ও আহাজারি শুরু করলো। তারা তাদের হাত থেকে দফ ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাপড়ের আঁচল ধরলো। এমনকি দৌড় দিতে গিয়ে তাদের পা থেকে মল খসে পড়লো। পাহাড়ের দিকে পালাতে শুরু করলো তারা। খালেদ ইবনে ওলীদ মুশরিকদের একটি ছোট দলের সঙ্গে মুসলিমবাহিনীর পশ্চাৎভাগের পাহাড়ী পথে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন। রসুলেপাক স. যে তীরন্দাজদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁরা তীর নিক্ষেপ

করে করে খালেদ ইবনে ওলীদকে বাধা দিতে লাগলেন। তিনি পালটা জওয়াব দিতে চেষ্টা করলেও সুবিধা করতে পারলেন না। অবশেষে পালাতে ব্যর্থ হয়ে আগের স্থানেই অবস্থান গ্রহণ করলেন। মুসলমানগণ বিজয়ের মুখ দেখলেন। আর কাফেররা দেখলো পরাজয়ের মলিন চেহারা। মুসলমানগণ যখন দেখলেন কাফেররা পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁরা গনিমতের মাল হস্তগত করার দিকে মন দিলেন। রসুলেপাক স. কর্তৃক নিয়োজিত তীরন্দাজবাহিনীর লোকেরাও স্থানত্যাগ করলেন। সতর্কবাণীর দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। স্বস্থানে অনড় হয়ে রইলেন কেবল হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের এবং তাঁর দশজন সঙ্গীযোদ্ধা। মুসলমানদের গনিমতের মাল সংগ্রহের সুযোগে ইকরামা ইবনে আবু জাহেল ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরের উপর হামলা করলেন। শহীদ হয়ে গেলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী। তারপর সে ওই পাহাড়ী পথে প্রবেশ করে পিছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালালো। মুসলমানদের উপরে নেমে এলো বিপর্যয়। অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হয়ে পড়লেন তাঁরা। শহীদ হয়ে গেলেন অনেকে। মুসলিমবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। পুরো বাহিনী হলো পর্যুদস্ত। একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলেন তাঁরা। শত্রু-মিত্র কিছুই চিনতে পারলেন না। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, মুসলমানরাই হজরত উবায়দ ইবনে হুযায়ের কে দু'টি আঘাত করেছিলো। হজরত আবু বুরদা মুসলমানদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ সংবাদ যখন রসুলেপাক স. এর নিকটে এলো, তখন তিনি বললেন, এযে আল্লাহ্র রাস্তায়ই হয়েছে।

হজরত হুযায়ফার পিতা হজরত ইয়ামান মুসলমানদের আঘাতে শহীদ হলেন। হজরত হুযায়ফা তাঁদেরকে বললেন আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তোমাদের উপর রহম করুন। তিনি সর্বদাই তাঁর পিতার হত্যাকারীদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করতেন। এ সংবাদ যখন রসুলেপাক স. এর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা ইয়ামানের দিয়ত (রক্তপণ) আদায় করে দিয়ো। হজরত হুযায়ফা তাঁর পিতৃহত্যার দিয়ত গ্রহণ করে তা আবার মুসলমানদের মধ্যে দান করে দিয়েছিলেন।

যুদ্ধের আপাততঃ ফল দাঁড়ালো— দুষ্টের বিজয়, শিষ্টের পরাজয়। যুদ্ধের ময়দান থেকে মুসলমানরা পালিয়ে যেতে লাগলেন। সহসা ওলট পালট হয়ে গেলো সবকিছু। কাফেররা বীরদর্পে ময়দানের দখল গ্রহণ করলো এবং নির্দয়ভাবে মুসলমানদেরকে হত্যা করতে লাগলো। আল্লাহ্র রসুলের অসতর্ক অনানুগত্যের ফলে নেমে এলো সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয়। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্র সাহায্য মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলো না। সকলকেই ক্ষমা করে দেওয়া হলো। সাময়িক এই ভাগ্য বিপর্যয়ের মাধ্যমে একথাই জানিয়ে দেওয়া হলো যে,

আল্লাহ্তায়ালা যার প্রতি দয়াপরবশ হন এবং যাকে কবুল করেন, তাঁকে আপন দরবার থেকে কখনো দূরে সরিয়ে দেন না। সাহাবীগণের ক্ষেত্রেও সেরকমই হলো। মোটকথা, সকলকিছুই হলো রসুলেপাক স. এর উপর ইমান আনার কারণে এবং তাঁরই উসিলায়। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন— 'ইন্নাল্ লাজীনা তাওয়াল্লাও মিনকুম ইয়াওমাল তাক্বাল জ্বামআ'ন ইন্নামাস্তাযাল্লাহুমুশ্ শাইত্বানু বি'দি মা কাসাবু ওলাক্বাদ আ'ফাল্লাহু আ'নহুম ইন্নাল্লাহা গফূরুন হালীম' (যে দিন দুইদল পরস্পরের সম্মুখিন হইয়াছিল সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে— যাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল) (৩ঃ১৫৫)।

জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, সে সময় সাহাবা কেরাম চারভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের একদল লোক প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন এবং শাহাদতবরণ করে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় দল ময়দান থেকে পলায়ন করেছিলেন— কেউ পাহাড়ের গুহায়, কেউ কূপের মধ্যে, আবার কেউ শহরের দিকে। তাঁদের মধ্যে হজরত ওছমানও ছিলেন। যুদ্ধের অগ্নি নিষ্প্রভ হওয়ার পর তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন এবং উপরোক্ত আয়াতের অবস্থায় মিলিত হয়ে ক্ষমা ও মাগফেরাত লাভ করেছিলেন। আরেকদল কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছিলেন সুদৃঢ়ভাবে। পশ্চাৎপদতার গ্লানি থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করতে পেরেছিলেন তাঁরা। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য— সুবহানাল্লাহ্! সেই খালেদ ইবনে ওলীদ যিনি উহুদ যুদ্ধে মুসলিমনিধনে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনিই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের জন্য এনে দিয়েছিলেন প্রভূত বিজয়। তাঁর সম্বন্ধে রসুলেপাক স. বলেছেন, 'খালেদুন সাইফুম মিন সুয়ুফিল্লাহ্' (খালেদ আল্লাহ্র তরবারীসমূহের মধ্যে অন্যতম তরবারী)। আর তাঁর পিতা ওলীদ ইবনে মুগীরা ছিলো কাফেরদের মধ্যে কঠিনহৃদয় ও কলহপরায়ণ। আবু জাহেল এবং তাঁর পুত্র হজরত ইকরামার অবস্থাও ছিলো এরকম। চিরদুর্ভাগা পিতৃদ্বয়ের ঔরস থেকে জন্ম নিয়েছিলেন ইসলামের দু'জন মহান বীরপুরুষ। হজরত খালেদ এবং হজরত ইকরামা এ দু'জন মহান সন্তানের নামের শেষে আমরা বলি রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর তাঁদের পিতৃদ্বয়— ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং আবু জাহেল এর নামোচ্চারণের পর আমাদেরকে বলতে হয় 'লা'নাতুল্লাহ আলাইহি'। যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, 'তুখরিজুল হাই্ইয়া মিনাল মাইয়্যিতি' (আল্লাহ্তায়ালা মৃত থেকে জীবিত করেন)। আবার কখনও কখনও এর বিপরীতও হয়ে থাকে। যেমন— 'তুখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাই-ই ওয়াল্লাহু আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর'

(আল্লাহ্তায়ালা জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালা সব কিছুর উপরই সক্ষম) (৩ঃ২৭)।

জীবনীকারগণ বলেছেন, মুসলমানগণ যখন এরকম চরম বিপর্যয়তাড়িত তখন হতভাগাদের সরদার ইবনে কায়মিয়া উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলো, 'আলা ইন্না মুহাম্মাদান ক্বুতিলা' (নিশ্চয়ই মোহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে)(নাউযুবিল্লাহ)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মালউন ইবলীস হেজাল ইবনে সারাকারের কণ্ঠের অনুকরণে তখন ওরকম ঘোষণা দিয়েছিলো। এ মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে রয়েছে হজরত খাব্বাব ইবনে যুবায়ের এবং হজরত আবু বুরদার বক্তব্য। তাঁরা বলেছেন, হেজাল ইবনে সারাকা আমাদের পাশেই ছিলো। আর ওই আওয়াজ যে হেজাল ব্যতীত অন্য কারও ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্ময়কর বর্ণনা দিয়েছেন 'মাআরেজুন নবুওয়াত' রচয়িতা । বলেছেন 'মোহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে' ঘোষণাটি শয়তান এমনভাবে প্রচার করে দিয়েছিলো যে, মদীনা পর্যন্ত তা পৌঁছে গিয়েছিলো। এমনকি মদীনার ঘরে ঘরে তা পৌঁছেছিলো। হজরত ফাতেমা এ আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথায় হাত রেখে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। হাশেমী বংশের অন্যান্য রমণীগণও কান্না শুরু করে দেন। এরকমও জানা যায় যে, উক্ত আওয়াজ শুনে সাইয়্যেদা ফাতেমাতুয্‌জুহরা দৌড়ে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে উহুদ পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

মুসলমানগণ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে দিলেও রসুলেপাক স. এবং তাঁর চৌদ্দজন সাথী ময়দানে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। উক্ত চৌদ্দজনের মধ্যে সাতজন ছিলেন আনসার আর সাতজন মুহাজির। মুহাজিরগণের মধ্যে ছিলেন ১. হজরত আবু বকর সিদ্দীক ২. হজরত আলী ৩. হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ৪. হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ৫. হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম ৬. হজরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্ এবং ৭. হজরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ। আনসারদের মধ্যে ছিলেন ১. হজরত খাব্বাব ইবনে মুনযের ২. হজরত আবু দাজানা ৩. হজরত আসেম ইবনে ছাবেত ৪. হজরত সাহাল ইবনে হানীফ, ৫. হজরত উসায়দ ইবনে হুযায়ের ৬. হজরত সাআদ ইবনে মুআয এবং ৭. হজরত হারেছ ইবনে সায়বা। কোনো কোনো জীবনীলেখক 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাও ছিলেন।

বান্দা মিসকীন (শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী) বলেন, আমি বিস্মিত হচ্ছি যে, উপরোক্ত সাহাবীগণের মধ্যে হজরত ওমর ফারুকের নাম নেই। অথচ তিনিও তখন রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর অবস্থানও ছিলো সুদৃঢ়। সাহাবীগণ যখন একত্রিত হলেন, তখন তাঁরা তাঁকে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে দেখেছিলেন। আবু সুফিয়ান তখন ডেকে ডেকে বলছিলো মোহাম্মদ আছো নাকি?

আবু বকর, আছো নাকি? ওমর, তুমি কোথায়? রসুলেপাক স. বলেছিলেন, উত্তর দিয়ো না। হজরত ওমর উত্তর দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে তিনি যথাউত্তর দিয়েছিলেন। জীবনীকারগণ হজরত ওমর সম্পর্কে বিস্তারিত আর কিছু বর্ণনা করেননি। তিনি তীরন্দাজদের মধ্যে ছিলেন, না ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া সাধারণ সৈনিকদের দলে ছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁরা তেমন কোনো তথ্য পরিবেশন করতে পারেননি। সুতরাং বিষয়টি অস্পষ্টই রয়ে গেলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম। অবশ্য হজরত ওছমান সম্পর্কে এই তথ্যটি পাওয়া যায় যে, উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি ময়দান থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে এসেছিলেন। যেমন সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে, একবার এক ব্যক্তি হজরত ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন, উহুদের যুদ্ধের দিন হজরত ওছমান কি মদীনায় চলে এসেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, আপনারা কি একথাটিও জানেন যে, তিনি বদর যুদ্ধেও অনুপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বললো, বায়আতে রেদওয়ানেও কি তিনি অনুপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি সজোরে তকবীর ধ্বনি দিলো। হজরত ইবনে ওমর বললেন, আমীন, আমি তোমাকে ওই বিষয়ে বলবো, যা তুমি জানতে চাচ্ছো? মুহাদ্দিছগণ উক্ত স্থানসমূহে হজরত ওছমানের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন ময়দান ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন ঠিকই। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তো এ বিষয়ে ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কিত আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। আর বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ তাঁর সহধর্মিণী রসুলেপাক স. এর কন্যা তখন ছিলেন অসুস্থ। রসুলেপাক স. তাঁকে বলেছিলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমান সওয়াব তুমিও পাবে। আর বায়আতে রেদওয়ানে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ ছিলো— রসুলেপাক স. তাঁকে মক্কাবাসীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন একথাটি জানানোর উদ্দেশ্যে যে, মুসলমানগণ কেবল ওমরা করার জন্যই মক্কায় আগমন করেছেন। যুদ্ধবিগ্রহ করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। এই দৌত্যকর্মে তাঁর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি যদি কেউ থাকতেন, তাহলে রসুলেপাক স. তাঁকেই তখন মক্কায় প্রেরণ করতেন। আর হজরত ওছমান যখন মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান, তখনই অনুষ্ঠিত হয় বায়আতে রেদওয়ান। রসুলেপাক স. তাঁর ডান হাতখানা বাম হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, এই হাতটি ওছমানের। এভাবে বক্তব্য শেষ করার পর হজরত ইবনে ওমর লোকটিকে বললেন, এই এলেমকে তোমার অবস্থার সঙ্গে শামিল করে নাও। এর মাধ্যমে তোমার আকীদা দুরুস্ত করে নাও। বলা বাহুল্য, লোকটি হজরত ওছমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখতো। হজরত ইবনে ওমর তাই তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এভাবে হজরত ওছমানের তখনকার অবস্থান সম্পর্কে জানা গেলেও হজরত ওমরের ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন।

সাইয়েদুশ্ শুহাদা হজরত হামযার শাহাদত

হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. এর শাহাদতের ঘটনা এরকম— যুদ্ধের জন্য যখন কাতার প্রস্তুত করা হলো, তখন সেবা' ইবনে আবদুল উয্যা খাযায়ী অগ্রসর হয়ে বললো, মুসলমানদের মধ্যে কে আছে, যে আমাকে মোকাবিলা করবে? হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এগিয়ে গেলেন। খাযায়ীর উপর হামলা চালিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ করে দিলেন তাকে। সেখানে একটি পাথরের আড়ালে বসে ছিলো ওয়াহ্শী। হজরত হামযা তার কাছে এগিয়ে যেতেই সে খঞ্জর নিক্ষেপ করলো। খঞ্জরটি হজরত হামযার শরীর ভেদ করে অপর দিকে বেরিয়ে গেলো। এভাবেই রসুলেপাক স. এর প্রিয় পিতৃব্য শাহাদতের অমিয় সুধা পান করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

বোখারী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া যুমারী বলেছেন, আমি একবার উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী ইবনে খিয়ারের সঙ্গে কোনো এক স্থানে যাচ্ছিলাম। হেমস নামক স্থানে পৌঁছে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদীকে বললাম, তোমার কি ওয়াহশীকে দেখার আগ্রহ হয়? আমরা তাঁর কাছ থেকে একথাটা তো জেনে নিতে পারি যে, কীভাবে তিনি হজরত হামযাকে শহীদ করেছিলেন। তিনি বললেন, হাঁ, পারি তো। ওয়াহ্শী তখন হেমসেই ছিলেন। আমরা তাঁর খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি অদুরের একটি ঘরের ছায়ায় বসে আছেন। ঘরটি দেখতে বড় মশকের মতো। আমরা সেখানে পৌঁছলাম। তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী মাথা ও চেহারা পাগড়ি দিয়ে ঢেকে ওয়াহশীকে বললেন, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন? ওয়াহ্শী বললো, হ্যাঁ। উবায়দুল্লাহ তাঁর চেহারা উন্মুক্ত করে বললেন, হজরত হামযাকে আপনি কীভাবে শহীদ করেছিলেন, তা কি আপনি আমাদেরকে বলবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই বলবো। বদর যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ হামযা তাঈমা ইবনে আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। একদিন আমার মনিব যোবায়ের ইবনে মুতঈম আমাকে বললেন, তুমি আমার চাচা তাঈমা ইবনে আদীর হত্যার বদলায় হামযাকে যদি হত্যা করতে পারো, তবে তোমাকে আমি স্বাধীন করে দিবো। আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। সুযোগ মিললো সেদিন, যেদিন আমাদের লোকেরা আইনাইন পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলো। তখন আমিও তাদের সঙ্গে বের হলাম। যুদ্ধের জন্য সবাই কাতারবন্দী হলো। তখন সেবা নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধের আহ্বান জানালো। ঘোষণা দিলো, কে আছো, যে আমার সঙ্গে লড়তে চাও? হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এগিয়ে এলেন। বললেন, হে সেবা! তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছো। এসো। একথা বলেই তার উপর হামলা করলেন

এবং তাকে শেষ করে দিলেন। আমি তখন একটি বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। হামযা যখন আমার নিকটে এলেন, তখন আমি তাঁকে লক্ষ্য করে আমার খঞ্জর নিক্ষেপ করলাম। খঞ্জরটি তার নাভি ও তলপেটের মধ্যখানে প্রবেশ করলো। বেরিয়ে গেলো তাঁর উরুদেশ ভেদ করে। অল্পক্ষণের মধ্যে নিবে গেলো তাঁর জীবনপ্রদীপ। যুদ্ধশেষে লোকেরা মক্কায় ফিরে এলো। আমিও ফিরে এলাম তাদের সঙ্গে। মক্কাবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম। পরে পালিয়ে গেলাম তায়েফের দিকে। রসুলুল্লাহ্ তখন মক্কায়। তায়েফবাসীরা তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করলো। সেখানকার লোকেরা আমাকে বললো, দূতদেরকে রসুলুল্লাহ্ কিছুই করবেন না। কাজেই তুমি দূতদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর কাছে চলে যাও। নিরাপদ আশ্রয় পাবে। আমি তাই করলাম। রসুলুল্লাহ্র কাছে যখন পৌঁছলাম, তখন তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, তুমিই কি ওয়াহশী? আমি বললাম জী হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি আমার চোখের সামনে থেকে অন্যত্র সরে বসতে পারো? তারপর আমি তাঁর সম্মুখ থেকে চলে গেলাম। রসুলুল্লাহ্ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব ঘটলো, তখন আমি মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘর থেকে বের হলাম যে, মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামা কায্যাবকে যদি হত্যা করতে পারি, তাহলে হয়তো বীরকেশরী হামযাকে শহীদ করার ক্ষতিপূরণ করতে পারবো। মনে মনে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং মুসায়লামা কায্যাবের কাছে পৌঁছে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি দেয়ালের ভিতর এক ব্যাক্তি দণ্ডায়মান। দেখে মনে হলো, যে শাদা কালো রঙের একটি উট দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত ছিলো। আমি আমার খঞ্জরটি তার দিকে নিক্ষেপ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জরটি তার বক্ষভেদ করে দু'কাঁধের মধ্যখান দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সাথে সাথে এক আনসারী ব্যক্তি দৌড়ে এসে তার মস্তকে তরবারী চালিয়ে দিলো। তার বান্দী তখন ঘরের ছাদে দাঁড়িয়েছিলো। এ দৃশ্য দেখে সে চিৎকার দিয়ে বললো আমীরুল মুমিনীন মুসায়লামা কায্যাবকে একটি কালো গোলাম হত্যা করে ফেলেছে। এ রকম বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারী।

জীবনালেখ্যপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, ওয়াহশী যখন তাঈমা ইবনে আদীর কথা অনুযায়ী হজরত হামযাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উহুদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলো, তখন পথিমধ্যে তার দেখা হলো আবু সুফিয়ানের স্ত্রী এবং উতবার কন্যা হিন্দার সঙ্গে। হিন্দা তাকে বললো, তুমি ময়দানে পৌরুষদীপ্ত অবস্থায় থাকবে। মনে রেখো তোমাকে যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে, তা যদি না পারো, তবে তুমি মুক্ত হতে পারবে না। কাজ সমাধা যদি করতে পারো, তবে আমি তোমাকে অনেক কিছু উপঢৌকন দেবো। কেননা বদর দিবসে আমার পিতা উতবাকে হামযাই হত্যা করেছিলো। ওয়াহ্শী বলেন, উহুদের ময়দানে হঠাৎ

হামযাকে পেয়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি উন্মত্ত বাঘের মতো তার কাউমের লোকদের সঙ্গে ময়দানে বেরিয়ে এসে কুরায়েশ বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। তখন সেবা ইবনে আবদুল উযযা খাযায়ী কুরায়েশদের কাতার থেকে বেরিয়ে এলো এবং প্রতিপক্ষকে যুদ্ধের আহবান জানালো। হামযা এগিয়ে এলেন এবং এক আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেললেন। আমি সুযোগের অপেক্ষায় একটি পাথরের আড়ালে বসে ছিলাম। খঞ্জর পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলাম আমি। আমার খঞ্জর কখনও ব্যর্থ হতো না। হামযা আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর তলপেট লক্ষ্য করে খঞ্জর নিক্ষেপ করলাম। অপর দিক দিয়ে তা বের হয়ে গেলো। দেখলাম, হামযা আমার দিকে তাকাচ্ছেন। আমি ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম। তিনি ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথীদের একটি দল ততক্ষণে তাঁর কাছে এসে পৌঁছে গেলো। তাঁরা তাঁকে সম্বোধন করে ডাকলেন, আবু আম্মারা! উত্তর এলো না। আমি তখন বুঝতে পারলাম, তিনি আর নেই। আমি তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় কাছেই এক স্থানে আত্মগোপন করেছিলাম। এক পর্যায়ে তাঁর সাথীগণ সেখান থেকে চলে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর মরদেহের কাছে। খঞ্জর দিয়ে তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে নিলাম। উতবার কন্যা হিন্দার কাছে এসে বললাম, এ হচ্ছে তোমার পিতার হন্তারক হামযার কলিজা। সে কলিজাটি আমার হাত থেকে নিয়ে তার মুখে পুরে দিলো। কিছুক্ষণ চিবিয়ে থুক দিয়ে ফেলে দিলো। তারপর হিন্দা উপহার স্বরূপ দিলো তার জামা কাপড়, অলংকার, স্বর্ণ-রৌপ্য স-ব। শুধু তাই নয়, সে আমার কাছে অঙ্গীকার করলো, মক্কায় গিয়ে আমাকে লাল স্বর্ণের আরও দশটি আশরাফী দান করবে। তারপর বললো, আমাকে হামযার লাশের কাছে নিয়ে চলতো। আমি তাকে যথাস্থানে নিয়ে গেলাম। সে হামযার নাক-কান এবং হাত-পা কেটে নিলো। সেগুলোকে সঙ্গে করে মক্কায় নিয়ে এলো। একারণেই হিন্দাকে নাম দেওয়া হয়েছিলো কলিজাখেকো।

বর্ণিত হয়েছে, কাফেরদের চলে যাওয়ার পর মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন এবং শহীদদের লাশসমূহের সন্ধান করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, আমার চাচাজানের কী হয়েছে? হামযার হাল কী? হজরত আলী খুঁজতে খুঁজতে হজরত হামযার লাশের কাছে এলেন। ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে কেঁদে ফেললেন তিনি। ফিরে গিয়ে রসুলেপাক স.কে জানালেন সবকিছু। তিনি স. হজরত আলীর সঙ্গে সেখানে পৌঁছলেন। হজরত হামযার শিয়রে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ইতোপূর্বে এর চাইতে অধিক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! কুরায়েশদেরকে নাগালে পেলে আমি তাদের সত্তুরজনের হাত-পা ছেদন করবো। এমন সময় হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হলেন এই আয়াত নিয়ে— 'ওয়া ইন আ'ক্বাবতুম ফাআ'ক্বিবূ বিমিছলি মা উ'ক্বিবতুম বিহী ওয়ালা ইন সবারতুম লাহুয়া খায়রুল

লিস্‌সবিরীন’(যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হয়; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করিলে ধৈর্যশীলদিগের জন্য উহাই তো উত্তম) (১৬ঃ১২৬)। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ধৈর্য ধারণ করলাম। ক্ষোভোক্তির পরিবর্তে সত্তুর বার হামযার জন্য এস্তেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করলাম। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. তখন বলেছিলেন, সুফিয়ার হস্তক্ষেপ না ঘটলে আমি হামযাকে দাফন করতাম না। তাঁকে আমি পশু-পাখির আহারার্থে এভাবেই রেখে দিতাম। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে পশু-পাখির উদর থেকেই পুনরুত্থিত করতেন। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. তাঁর ফুফীকে (হজরত হামযার বোনকে) দূর থেকে আসতে দেখলেন। তখন তাঁর পুত্র হজরত যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে লক্ষ্য করে তিনি স. বললেন, যাও! তোমার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও! তাঁর আপন ভাইয়ের এরূপ পরিণতি তাঁকে দেখতে দিয়ো না। ‘রাওজাতুল আহবাব’ গ্রন্থে এসেছে, হজরত সুফিয়া হজরত হামযার মরদেহের কাছে এলেন। সঙ্গে ছিলেন হজরত ফাতেমা। তাঁরা দুজনে কাঁদতে শুরু করলেন। রসুলেপাক স.ও কান্নাভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, হামযাকে সপ্তম আকাশের বাসিন্দারা নাম দিয়েছে আসাদুল্লাহ্‌ এবং আসাদু রসুলিহী। তারপর বললেন, তাঁর জন্য কবর খনন করো। শহীদী দাফন করো তাঁকে। তাঁর জানাযার ব্যাপারে এই অধ্যায়ের শেষাংশে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌ তায়ালা।

হজরত আলী মুর্তযার বীরত্ব

উহুদ যুদ্ধে সাহাবীগণের অনেকেই বীরবিক্রমে লড়াই করেছেন এবং কেউ শহীদ হয়েছেন। কেউ কেউ প্রদর্শন করেছেন এখলাস ও মহব্বতের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইমানের যথাযথ হক আদায় করেছেন তাঁরা। হজরত আলী মুতর্যা ছিলেন তাদের অন্যতম। এ প্রসঙ্গে হজরত আলীর নিজের বর্ণনা এরকম— কাফেররা যখন মুসলমানদেরকে পরাভূত করলো, তখন আমি রসুলে আকরম স.কে দেখতে না পেয়ে তাঁকে শহীদগণের মধ্যে তালাশ করতে লাগলাম। কিন্তু সেখানে তাঁকে পেলাম না। ভাবলাম, আল্লাহ্‌তায়ালা হয়তো আমাদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে গযব নাযিল করেছেন এবং আমাদের নবীকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এমতাবস্থায় আমার জন্য উত্তম হবে কাফেরদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া এবং শহীদ হয়ে যাওয়া। আমি তরবারী তাক করে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে ফেললাম। এমন সময় হঠাৎ করে রসুলেপাক স.কে দেখতে পেলাম। দেখলাম, তিনি সহী সালামতেই আছেন। বুঝতে পারলাম, আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশতাদেরকে দিয়ে তাঁর নবীকে হেফাজত করেছেন।

বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানগণ যখন পরাজয়ের মুখোমুখি হলেন, তখন তাঁদের অনেকেই রসুলেপাক স.কে একা রেখে চলে গেলেন। তিনি স. হলেন অধিকতর উদ্দীপ্ত। ঘাম ঝরে পড়তে লাগলো তাঁর ললাটদেশ থেকে। এমতাবস্থায় হজরত আলীকে দেখতে পেলেন। দেখলেন, তিনি তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, তোমার কী হলো? অন্যদের মতো চলে গেলে না কেনো? হজরত আলী বললেন, 'লা কুফরা বা'দাল ঈমান' (ইমানের পর তো কুফুরী হতে পারে না)। 'ইন্না লী বিকা উসওয়াতুন' (নিশ্চয় আপনার মধ্যে আমার জন্য রয়েছে আদর্শ)। হজরত আলীর এমতো উক্তির মর্মার্থ— আপনাকেই তো আমি চাই। তারা আমার কে, যারা গনিমত প্রত্যাশী, যারা পরাভবকে মেনে নিয়ে স্থানত্যাগ করেছে। হঠাৎ কাফেরদের একটি দল রসুলেপাক স. এর দিকে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এলো। তিনি স. বললেন, হে আলী! এদের থেকে হেফাজত করা এবং সেবা ও সাহায্যের পথে এগিয়ে আসা এখন তোমার দায়িত্ব। হজরত আলী দলটিকে প্রতিহত করলেন। উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন তাদেরকে। অক্কা পেলো অনেকেই।

বর্ণিত হয়েছে, উহুদ প্রান্তরের এহেন নাজুক মুহূর্তে ফেরেশতারাও হাজির হয়েছিলেন। হজরত জিবরাইল ও হজরত মিকাইল দু'জন পুরুষের সুরতে শাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় রসুলেপাক স. এর ডানে ও বামে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে হেফাজত করছিলেন এবং কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, ফেরেশতারা বদরের যুদ্ধে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো। অন্যান্য স্থানে ফেরেশতাদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেলেও সে প্রমাণ ততোটা সুস্পষ্ট নয়। তবে এ সম্পর্কে আমার মত— এরকম হাজার হাজার ফেরেশতার অবতরণ এবং মানবাকৃতিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করার ব্যাপারটি কেবল বদর দিবসেই ঘটেছিলো। আর একজন দু'জন ফেরেশতা, যেমন হজরত জিবরাইল ও হজরত মিকাইলের আগমন এবং রসুলেপাক স. এর খেদমত করার মতো ঘটনা অন্যান্য স্থানেও ঘটেছে। যেমন ঘটেছে উহুদের যুদ্ধে। জীবনচিত্ররচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী যখন পূর্ণ বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন এবং রসুলেপাক স.কে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন, তখন হজরত জিবরাইল তাঁকে বললেন, আলী তো আপনার জন্য বড়ই বাহাদুরী প্রকাশ করলেন। তিনি স. বললেন, 'ইন্নাহু মিন্নী ওয়া আনা মিনহু (নিশ্চয়ই আলী আমার, আর আমি আলীর)। হাদিস শরীফে এসেছে, তখন জিবরাইল বললেন, 'ওয়া আনা মিনকুমা' (আর আমি আপনাদের দু'জনেরই)। বর্ণিত হয়েছে, ওই সময় গায়েব থেকে একটি আওয়াজ এলো 'লা ফাতা ইল্লা আলী লা সাইফা ইল্লা যুলফিকার' (আলী ব্যতীত কোনো বিজয় নেই, যুলফিকার ব্যতীত কোনো তরবারী নেই)। 'মাআরেজুন নবুওয়াত ও

‘কাশফুলগামা’ কিতাবদ্বয়ে এর চেয়ে অধিক ও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। শেষাংশে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, হে আলী! তুমি কি প্রশংসাবাণী ওই ফেরেশতার মুখ থেকে শুনেছো, আসমানে যার নাম রেদওয়ান। সে বলেছে, ‘লা ফাতা ইল্লা আলী, লা সাইফা ইল্লা যুলফিকার। ‘রওজাতুল আহবাব’ কিতাবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে কোনো কোনো প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ থেকে। আর জীবনচিত্ররচয়িতাগণও হাদিসটি তাঁদের আপন আপন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তবে ‘আসমাউর রিজাল’ বিশেষজ্ঞ ইমাম যাহাবী তাঁর ‘মীযানুল এ’তেদাল’ গ্রন্থে বলেছেন, হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। ওয়াল্লাহু আ’লাম।

তবে একথা সঠিক যে, হজরত আলী সেদিন প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর অভূতপূর্ব সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্য। কায়েস বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা সাআদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমার উপর তরবারীর ষোলটি আঘাত পড়েছিলো। আঘাত খেয়ে কয়েকবার মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। আর প্রত্যেক বারেই একজন সুদর্শন ও শক্তিমান বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে মাটি থেকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলছিলেন, কাফেরদের উপর হামলা করো। তুমিতো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যাধিষ্ঠিত এবং তাঁরা উভয়েই তোমার উপর সন্তুষ্ট। যুদ্ধশেষে আমি রসুলুল্লাহ্কে ঘটনাটি জানালাম। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে চিনতে পেরেছো? আমি বললাম, না। তবে তাঁর চেহারা দাহিয়াতুল কালবীর মতো । রসুলুল্লাহ্ বললেন, হে আলী! আল্লাহতায়ালা তোমার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করুন, তিনি জিবরাইল।

হজরত তালহার বীরত্ব

হজরত তালহাও উহুদের যুদ্ধে অনেক বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। আর এ বীরত্ব প্রদর্শনই তাঁর বেহেশতে যাওয়ার কারণ হয়েছিলো। প্রাণপণে লড়াই করেছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে রসুলেপাক স. বলেছিলেন, তালহা ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা তাদের হক পুরাপুরি আদায় করে। জীবনচিত্ররচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত তালহা তাঁর বাহুদ্বয়কে রসুলেপাক স. এর জন্য ঢাল বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি ইবনে কামীয়ার তলোয়ারের আঘাতসমূহ নিজহাত দ্বারা প্রতিহত করেছিলেন। তাই তাঁর হাত অবশ হয়ে গিয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত তালহা তাঁর হাতকে তীর প্রতিহত করার ঢাল বানিয়ে নিয়েছিলেন। এক সময় রসুলেপাক স.কে লক্ষ্য করে ছুটে আসা একটি তীর তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেলো আঙ্গুলটি। হাদিস শরীফে এসেছে, উহুদ যুদ্ধের দিন হজরত তালহার শরীরে আশিটি জখম হয়েছিলো।

তৎসত্ত্বেও তিনি প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন অবিচল। একবার তলোয়ারের দু'টি আঘাত তাঁর মস্তকে লাগলো। তিনি ব্যাথায় কাতর হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি জ্ঞান ফিরে পান। জ্ঞান আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করেন, রসুলুল্লাহ্র অবস্থা কী? হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, তিনি ভালো আছেন, তিনিই তো আমাকে তোমার কাছে পাঠালেন। তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্! এখন যে মুসিবতই আসুক না কেনো, তা আমার কাছে হবে সহজ। হজরত তালহা সম্পর্কে আরও আলোচনা আসবে মালউন ইবনে কামীয়ার দূরাচারিতার আলোচনায়।

হজরত আনাস ইবনে নযরের বীরত্ব

জীবনচিত্ররচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস ইবনে নযর হজরত আনাস ইবনে মালেকের চাচা ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তাই তিনি কামনা করতেন, পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বদরের অনুপস্থিতির ক্ষতিপূরণ করবেন। উহুদ দিবসে মুসলিমবাহিনীর যখন বেসামাল অবস্থা, তখন তিনি রসুলেপাক স. এর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কে যেনো বললো, আমরা শুনতে পেয়েছি রসুলুল্লাহ্ শাহাদতবরণ করেছেন। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন, এটা কি জায়েয হতে পারে যে, তোমরা জীবিত, অথচ তোমাদের নবী শহীদ। একথা বলেই তিনি উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এমন সময় হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তাঁর সাথে তখন মিলিত হয়েছিলেন হজরত সাআদ ইবনে মুআয। হজরত আনাস ইবনে নযর তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি উহুদের দিক থেকে বেহেশতের সুবাস পাচ্ছি। একথা বলেই তিনি কাফের বাহিনীর মধ্যভাগে আক্রমণ চালালেন। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে শাহাদত বরণ করলেন। এই বিবরণটি বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তাঁর শরীরে আশির অধিক জখম হয়েছিলো। আঘাতে আঘাতে তাঁর শরীরের এমন অবস্থা হয়েছিলো যে, শহীদানের লাশের মধ্যে তাঁকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে তাঁর বোন এসে তাঁর হাতের একটি তিল দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন।

হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের বীরত্ব

আল্লাহ্র রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করার গৌরব অর্জন করেছিলেন হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস। উহুদ যুদ্ধেও তিনি ছিলেন তীরন্দাজবাহিনীর

অন্তর্ভুক্ত। রসুলে আকরম স. তাঁকে বলেছিলেন, হে সাআদ! তুমি তীর নিক্ষেপ করো, আমার মা-বাপ তোমার জন্য কোরবান হোন। মালেক ইবনে যোবায়ের নামে এক কাফের অনেক মুসলমানকে শহীদ করেছিলো এবং অনেককে করেছিলো জখম। হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার চোখ বরাবর তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরটি তার গ্রীবা ভেদ করে বেরিয়ে গেলো। সে জাহান্নামের পথের যাত্রী হলো এবং মুসলমানগণ তার ক্ষতি থেকে নাজাত পেলো। রসুলেপাক স. তাঁকে এই মর্মে দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার দোয়া কবুল করুন এবং তোমার তীরের নিশানা অব্যর্থ রাখুন। রসুলেপাক স. এর দোয়ার বরকতে তিনি মুস্তাজাবুদ্দা'ওয়াত (যার প্রার্থনা কবুল হয়) হয়ে গিয়েছিলেন। লোকজন তাঁর কাছে দোয়ার জন্য আসতো। বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। লোকেরা তাঁকে বলতো, আপনি মানুষের জন্য দোয়া করেন। নিজের জন্য দোয়া করেন না কেনো? তাহলে তো আল্লাহ্তায়ালা আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্তায়ালার ফয়সালা আমার চোখের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার চেয়ে প্রিয়। তিনি যা চাইবেন তাই তো করবেন। আর তা-ই আমার কাছে প্রিয়।

হজরত আবু তালহা আনসারীর বীরত্ব

হজরত আবু তালহা আনসারী উহুদ যুদ্ধের সময় রসুলেপাক স. এর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। এভাবে নিজকেই করেছিলেন রসুলুল্লাহ্ স. এর ঢাল। তিনিও ছিলেন তুখোড় তীরন্দাজ। ধনুক খুব শক্তভাবে টানতে পারতেন তিনি। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি তিন তিনটি ধনুক ভেঙে ফেলেছিলেন। তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে তীর নিক্ষেপ করতেন। বলতেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ্ নাফসী আদনী মিন নাফসিকা জ্বাআল্লানিইয়াল্লাহু ফিদাক' (হে আল্লাহ্র রসুল! আমার সত্তা আপনার পবিত্র সত্তার তুলনায় অতি নগণ্য। আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন)। পঞ্চাশটি তীর ছিলো তাঁর। তীর যখন শেষ হয়ে গেলো, তখন রসুলেপাক স. মাটি থেকে তাঁবুর কাঠ তুলে দিলেন এবং বললেন, এটি নিক্ষেপ করো হে আবু তালহা। তিনি ওই কাষ্ঠখণ্ডটি ধনুকে যোজনা করে নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষিপ্ত হলো তীরে পরিণত হয়ে। রসুলেপাক স. এর নিকট দিয়ে কোনো তীর বহনকারী অতিক্রম করে গেলে তিনি তাকে বলতে লাগলেন, ওগুলো আবু তালহার জন্য রেখে যাও। তার সম্পর্কে রসুলেপাক স. বলতেন, আবু তালহা মুসলিম বাহিনীর চল্লিশজন পুরুষের চেয়েও অধিক। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তীরন্দাজীতে হজরত আবু তালহা অধিকতর অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের খ্যাতি বেশী। তিনি এ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছেন

প্রবাদপুরুষে। এর সমাধান হয়তো এমন হতে পারে যে, হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী হিসেবে এবং এর উপরে তাঁর স্থায়ীত্বের কারণে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

সাহাবীগণের ত্যাগ-তিতীক্ষা

উহুদ যুদ্ধে হজরত কাতাদা ইবনে নোমানের চোখে একটি তীর বিদ্ধ হলো। ফলে তাঁর চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে গালের উপর এসে পড়লো। রসুলেপাক স. বেরিয়ে আসা চোখটি পুনরায় কোটরে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন— 'আল্লাহুম্মাকতুব্হু জামালান' (হে আল্লাহ্! একে তুমি সুন্দর করো)। এরপর তাঁর ওই চোখ পুর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্দৃষ্টিসম্পন্ন ও সুন্দর হয়ে গেলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের তলোয়ার ভেঙে গেলো। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর হাতে তুলে দিলেন একটি খেজুরের ডাল। সঙ্গে সঙ্গে ডালটি হয়ে গেলো তলোয়ার। এভাবে বদর যুদ্ধেও তিনি স. হজরত উকাশাকে ডাল দান করেছিলেন এবং সেটির নাম রেখেছিলেন আ'ওন। আর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ ওই তলোয়ারের নাম রেখেছিলেন উরজুন। হজরত উকাশার আওন তাঁর কাছ থেকে দুই দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন আমীর মুতাসিম বিল্লাহ্। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

গাসীলে মালায়েকা হজরত হানযালার শাহাদত

উহুদ যুদ্ধের বীরপুরুষগণের মধ্যে হজরত হানযালাও অন্যতম। তাঁকে 'হানযালা গাসীল' বা 'গাসীলে মালায়েকা' বলা হয়। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন। উহুদের যুদ্ধ যে দিন সংঘটিত হয়, তার আগের রাতে তাঁর বিবাহ হয়। রাতে স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করলেন। সকালে জানাবাতের গোছল করতে গেলেন। মাথার একদিক ধৌত করতে না করতেই শুনতে পেলেন সাহাবীগণের দুরাবস্থার সংবাদ। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন গায়েব থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন 'ইয়া গাসীলাল লিল্লাহি ইরকাবী' (হে আল্লাহ্র গাসীল! আল্লাহ্ কর্তৃক গোসলকৃত ব্যক্তি বেরিয়ে পড়ো)। গোছল অসমাপ্ত রেখে দ্রুত ছুটলেন উহুদের দিকে। সেখানে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। অনেক কাফেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। নিজেও শেষে পান করলেন শাহাদতের অমিয়সুধা।

পরে রসুলেপাক স. দেখলেন, ফেরেশতারা তাঁকে গোছল দিচ্ছে। এমতো দৃশ্য দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলো জামীলা। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বোন ছিলেন। রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে হজরত জামীলার নিকটে পাঠিয়ে কিছু কথা জেনে নিলেন। তারপর বললেন, তার ওই গোছল ছিলো জানাবাতের কারণে। তিনি জুনুবী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর উপর গোছল ফরজ ছিলো।

তাই কোনো কোনো ইমাম, যেমন ইমাম আবু হানীফা এই হাদিস থেকে একথা প্রমাণ করে বলেন যে, জুনুবী শহীদের গোছল দিতে হবে। হজরত হানযালার স্ত্রী হজরত জামীলা বলেন, ওই রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম আকাশে রয়েছে একটি জানালা। ওই জানালা দিয়ে হানযালা আকাশে প্রবেশ করলেন। তারপর জানালাটি বন্ধ হয়ে গেলো। আমি বুঝতে পারলাম, হানযালা শহীদ হবেন। জীবনচিত্রপ্রণেতাগণের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাহাল ইবনে সাআদ সাঈদা বলেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট একথা শোনার পর আমি হানযালার লাশের কাছে গেলাম। দেখলাম, তাঁর মাথা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরছে। আমার এমতো বিস্ময়কর দর্শন সম্পর্কে আমি রসুলুল্লাহ্ স.কে জানালাম।

আমর ইবনে জামুহ আনসারীর ঘটনা

হজরত আমর ইবনে জামুহ আনসারীর ঘটনা বড়ই বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন প্রতিবন্ধী। তাঁর পা ছিলো অচল। তাঁর চার পুত্র রসুলেপাক স.এর খেদমতে থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হজরত আমর ইবনে জামুহ উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলে লোকেরা বললো, তুমি তো চলতে অক্ষম। যুদ্ধে না গেলে তুমি অভিযুক্ত হবে না 'ওয়া লাইছা আ'লাল আ'রাজ্বি হারাজুন' (খঞ্জের জন্য কোনো দোষ নেই)। তোমার চার পুত্রের সকলেই তো রসুলেপাক স. এর খেদমতে রয়েছেন। তিনি বললেন, আমার চারপুত্র জান্নাতে যাবে, আর আমি তোমাদের সামনে বসে থাকবো? তাঁর স্ত্রী বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসবে। হজরত আমর হাতিয়ার তুলে নিলেন এবং দোয়া করলেন 'আল্লাহুম্মা লা তারুদ্‌নী ইলা আহ্‌লী' (হে আল্লাহ্! আমাকে আর ফিরিয়ে এনো না)। এরপর তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। রসুলুল্লাহ্ স. সকাশে উপস্থিত হয়ে আপন মানুষের বাধা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করলেন এবং বললেন, আমার ইচ্ছা আমি যেনো আমার এ অক্ষম পা নিয়ে বেহেশতের বাগিচায় ভ্রমণ করতে পারি। তিনি স. বললেন, আ'যারাকাল্লাহু ওয়ালা জুনাহা আলাইকা'(আল্লাহ্ তো তোমাকে অক্ষম করে রেখেছেন। যুদ্ধে না গেলে তোমার পাপ হবে না)। হজরত আমর বারংবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। শেষে তিনি স. তাঁকে অনুমতি দিলেন। হজরত আবু তালহা বলেন, আমি আমর ইবনে জামুহকে নাচতে নাচতে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে দেখলাম, তিনি কাফেরদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন আর বলছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জান্নাতের অভিলাষী। তাঁর চার পুত্র তাঁর পিছনে পিছনে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন।

বর্ণিত হয়েছে, হজরত আমর ইবনে জামুহের স্ত্রী হিন্দা শহীদ স্বামী, পুত্র চতুষ্টয় এবং ভাইয়ের লাশসমূহ নিজে বহন করে করে উটের উপর ওঠালেন।

তাঁদের দাফন করার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে রওয়ানা হতে চাইলেন। কিন্তু উট কিছুতেই সামনে অগ্রসর হলো না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে গেলো। বারংবার চেষ্টা করেও উটটিকে সচল করতে পারলেন না তিনি। একবার উটটিকে উঠিয়ে যেমনি সেটিকে উহুদের দিকে মুখ করে দিলেন, অমনি সে চলতে শুরু করলো। হিন্দা ঘটনাটি রসুলেপাক স.কে জানালেন। তিনি স. বললেন, সে তো নিজের ইচ্ছায় চলে না। এ ব্যাপারে সে আদিষ্ট। তারপর তিনি হিন্দাকে জিজ্ঞেস করলেন, যুদ্ধযাত্রাকালে আমর কি কিছু বলেছিলো? হিন্দা বললেন, হাঁ। তিনি উহুদের দিকে রওয়ানা কালে কেবলার দিকে মুখ করে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পরিবারে আর ফিরিয়ে এনো না। রসুলেপাক স. বললেন, এ কারণেই উট মদীনায় ফিরতে চায় না।

হজরত মুসআব ইবনে ওমায়ের

উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ঘটনা হচ্ছে হজরত মুসআব ইবনে ওমায়েরের শাহাদতবরণ। জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ যখন পরাজয়ের মুখোমুখি হলো, তখন মুহাজির দলের পতাকাবাহী হজরত মুসআব ইবনে ওমায়ের অভিশপ্ত ইবনে কামীয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। সে তরবারীর এক আঘাতে মুসআবের ডান হাতটি কেটে ফেললো। তিনি তখন পতাকা বাম হাতে ধারণ করে বললেন, 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রুসুল' (মোহাম্মদ তো রসুল ভিন্ন কিছুই নন, তাঁর পূর্বে অনেক রসুল গত হয়ে গিয়েছেন) (৩ঃ১৪৪)। তখন সে অভিশপ্ত আরেকটি আঘাতে তাঁর বাম হাতও কেটে ফেললো। তিনি পুনরায় আগের বাক্যটি উচ্চারণ করলেন এবং কর্তিত হাতের অবশিষ্ট অংশ দিয়ে পতাকাটি বুকের সঙ্গে চাপা দিয়ে ধরে রাখলেন। তারপর সে অভিশপ্ত তার গায়ে একটি তীর মারলো। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। জীবনীকারগণ বলেন, উপরোক্ত বাক্যটি যা কুরআনে করীমের আয়াতের একটি অংশ, তা তখন পর্যন্ত নাযিল হয়নি। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মুখ দিয়ে তা জারী করিয়ে দিয়েছিলেন। পতাকাটি যখন মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো, তখন হজরত মুসআবের ভাই হজরত আবুর রওম অগ্রসর হয়ে পতাকা নিজ হাতে তুলে নিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তখন আল্লাহ্তায়ালা পতাকাটি ধারণ করার জন্য হজরত মুসআবের আকৃতি দিয়ে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধ শেষে যখন রসুলেপাক স. বললেন, মুসআব! এদিকে এসো। ওই ফেরেশতা বললেন, আমি মুসআব নই। রসুলেপাক স. বুঝতে পারলেন, তিনি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত একজন ফেরেশতা। তারপর আবুর রওম সেই পতাকা ধারণ করেছিলেন এবং তা শেষ পর্যন্ত বহন করে রসুলেপাক স. এর

আগে আগে মদীনা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। হজরত মুসআব ইবনে ওমায়ের ছিলেন একজন শ্রদ্ধাষ্পদ সাহাবী। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন এবং বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. দ্বিতীয় আকাবার শপথের পর তাঁকেই মদীনা শরীফে ইসলাম প্রচারার্থে পাঠিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, প্রথম আকাবার শপথের পর তাঁকে আনসারদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মদীনায় পাঠিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি আয়েশী জীবন যাপন করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর জীবনযাত্রা হয়ে যায় নির্লিপ্ত এবং সাধারণ। রসুলেপাক স. একদিন দেখলেন, তিনি ছাগলের চামড়া কোমরে পেঁচিয়ে আছেন। তিনি স. বললেন, একে দ্যাখো। আল্লাহ্তায়ালা ইমানের জন্য তার অন্তরকে কীরূপ আলোকিত করে দিয়েছেন। অথচ আমি দেখেছি সে বদরযোদ্ধাদের জন্য দু'শ দেরহাম মূল্যের কাপড় ক্রয় করেছিলো। পরবর্তীতে তার অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালোবাসা কতো গভীর হয়েছে, তা তো তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম তাঁর 'আরাঈনে সুফিয়া' পুস্তকে এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শুআবুল ঈমানে'। দায়লামী এবং ইবনে আসাকেরও এই হাদিসের দু'জন স্বনামধন্য বর্ণনাকারী।

আরও কতিপয় সাহাবীর বীরত্ব

যুদ্ধের ময়দানে আরও যে ক'জন সাহাবী চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হজরত ওয়াহাব ইবনে কাবুস মাযানী এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত হারেছ ইবনে উকবা ইবনে কাবুস। মুসলমানগণ যখন গনিমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁরাও গনিমতের মাল সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু খালেদ ইবনে ওলীদ এবং ইকরামা ইবনে আবু জাহেল যখন পিছন দিক থেকে এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলো, তখন হজরত ওয়াহাব ও তাঁর ভাতিজা হজরত হারেছ রুখে দাঁড়ালেন। প্রাণপণে তাদেরকে বাধা দিলেন। কাফেরদের একটি দল রসুল করীম স. এর দিকে অগ্রসর হলো। রসুলেপাক স. বললেন, মান বিহাযিহিল ফেরকাহ্ (কে আছো যে এ দলটিকে রুখে দিতে পারো)? হজরত ওয়াহাব বললেন, 'আনা ইয়া রসুলাল্লাহ্' (আমি আছি, হে আল্লাহ্র রসুল)! একথা বলেই তিনি দুর্বৃত্তদের প্রতি তীরনিক্ষেপ শুরু করে দিলেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দিতেও সক্ষম হলেন। শত্রুদের আরেকটি দল রসুলেপাক স.কে ঘেরাও করে ফেললো। তিনি বললেন, 'মান বিহাযিহিল কাতীবাহ' (কে আছো যে এ শয়তানদেরকে প্রতিহত করতে পারো)? হজরত ওয়াহাব আগের মতোই উত্তর দিলেন এবং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কয়েকজনকে শেষ করে দিলেন। অবশিষ্টরা পালিয়ে গেলো। এরপর আবার একটি ছোট দল দেখা

গেলো। রসুলেপাক স. বললেন, 'মান হাউলাই' (এদের জন্য কে আছো)? হজরত ওয়াহাব বললেন, আমি। রসুলেপাক স. বললেন, 'কুম ওয়াল বাশরি বিলজান্নাহ্' (দাঁড়াও এবং বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ করো)। হজরত ওয়াহাব এমতো সুসংবাদ পেয়ে অধিকতর উদ্দীপ্ত হলেন। দ্রুত ঢুকে পড়লেন শত্রুসেনাদের মধ্যে। কাফেররা তাঁকে তলোয়ার ও বর্শার ফলা দিয়ে আঘাত করে করে জর্জরিত করে ফেললো। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র হজরত হারেছ তাঁর পক্ষ হয়ে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনিও বহু কাফেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। শেষে নিজেও শাহাদতবরণ করলেন। হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, আমি এমন মৃত্যু পছন্দ করি, যেমন মৃত্যুবরণ করেছিলো ওয়াহাব মাযনী ও তার ভাতিজা হারেছ মাযনী। হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেছেন, আমি উহুদের ময়দানে হজরত ওয়াহাব মাযনীর বীরত্বের মতো আর কাউকে বীরত্ব প্রদর্শন করতে দেখিনি। তিনি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর রসুলেপাক স. তাঁর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'রাদিয়াল্লাহু আনকা ফাইন্না আনকা রাদীন' (আল্লাহ্তায়ালা তোমার উপর তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং আমিও তোমার প্রতি তুষ্ট)। তারপর আমি দেখলাম, রসুলেপাক স. নিজে আহত হওয়া সত্ত্বেও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওয়াহাবকে কবরে নামিয়ে দিচ্ছেন। যে লাল পতাকাটি তিনি বহন করেছিলেন, সেটি দিয়ে তাঁর মরদেহকে ঢেকে দিলেন।

উহুদ যুদ্ধের দিন যে সব সাহাবী বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমনও কিছুসংখ্যক সাহাবী ছিলেন, যাঁদের অবস্থার উপর আল্লাহ্র সরাসরি সাহায্যের হাত প্রসারিত হয়েছিলো। হেদায়েতের নূর তাঁদের অন্তরকে করেছিলো সমুদ্ভাসিত। যেমন আমর ইবনে ছাবেত ইবনে কায়স। তিনি দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁর কওমের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। তারা সকলেই আমর ইবনে ছাবেতকে নসীহত করতো। কিন্তু তাতে তাঁর অন্তরে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো না। হঠাৎ করে উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর ভাবান্তর হয়ে গেলো। লোকেরা যখন উহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হচ্ছে, সে সময় তাঁর অন্তরে একীনের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়ে গেলো। স্বহস্তে হাতিয়ার তুলে নিলেন এবং জেহাদের ময়দানে চলে এলেন। বীরত্বের সাথে জেহাদ করে গুরুতর আহত হলেন। একটু পরেই শাহাদত বরণ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করলেন 'ইন্নাহু লামিন আহলিল্ জান্নাহ্' (নিশ্চয়ই সে জান্নাতী)।

মুগরিক নামে একজন বনী ইসরাইল ইহুদীদের ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রসুলেপাক স. এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি কায়েম ছিলেন ইহুদী ধর্মের উপরেই। যেদিন রসুলেপাক স. উহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হলেন, সেদিন ছিলো শনিবার। সেদিনই মুগরিকের অন্তরে ইসলাম গ্রহণের উত্তাল আবেগ সৃষ্টি হলো।

তিনি দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা কেউ তাঁর দাওয়াত কবুল করলো না। মুগরিক তাদেরকে বললেন, দ্যাখো, মোহাম্মদ যে আল্লাহ্‌র রসুল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা তাঁর উপর ইমান আনো এবং তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য অর্জন করো। ইহুদীরা বললো, আজ শনিবার। আজকে যুদ্ধ করাটা ঠিক হবে না। মুগরিক বললেন, এ কথা ইহুদী ধর্মমতে আছে। মোহাম্মদী শরীয়তে সে বিধান রহিত করে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন এবং রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এইমর্মে ওসিয়ত করে গেলেন যে, আমার পর আমার সমস্ত মাল ও গোলাম রসুলুল্লাহ্‌র। তিনি বিশুদ্ধ বিশ্বাস বুকে নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অবশেষে যুদ্ধ করতে করতেই শাহাদত বরণ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁর ওসিয়ত মোতাবেক তাঁর মাল গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে রসুলেপাক স. বলেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে মুগরিক উত্তম ব্যক্তি।

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম রমণীদের অবদান

পুরুষ সাহাবীগণের বীরত্বের কিছু কথা তো পেশ করা হলো। এবার উহুদ যুদ্ধের ময়দানে মহিলা সাহাবীগণ যে অবদান রেখেছেন, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষ সাহাবীগণের জন্য পানি সরবরাহ করেছেন। কেউ কেউ সশরীরে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছেন। ওই সকল সাহসিনী রমণীগণের একজনের নাম হচ্ছে নাসিয়া বিনতে কাআব। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বাঘিনীর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিসম্পন্না, তেজোদ্দীপ্তা ও অপ্রতিরোধ্যা। সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর পাশে ছিলেন তাঁর স্বামী যায়েদ ইবনে আসেম এবং তাঁর পুত্রদ্বয় আম্মারা ও আবদুল্লাহ্। তিনি বলেন, আমি উহুদ যুদ্ধের দিন মশক ভর্তি করে পানি নিয়ে মুসলমানদের কাছে পৌঁছাতাম। মুসলমানদের পরাভূত অবস্থা দেখে পানি সরবরাহ করা বন্ধ করে দিলাম। সরাসরি যুদ্ধ শুরু করলাম কাফেরদের সঙ্গে। আমার শরীরে লাগলো তেরোটি আঘাত। ওগুলোর মধ্যে একটি আঘাতের ক্ষত ভালো হতে লেগেছিলো পুরো একটি বৎসর। একবার লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো এ আঘাত তাঁকে কে করেছে? তিনি বলেছিলেন, মালউন ইবনে কামিয়া। আমিও তাকে ছেড়ে দেইনি। বিভিন্নভাবে আঘাত করেছি। কিন্তু সে দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলো বিধায় আমার আঘাতে সে কাবু হয়নি। যখন আমাকে জখম করা হলো, তখন রসুলুল্লাহ্ আমার পুত্র আম্মারাকে ডেকে বললেন, জলদি তোমার মায়ের কাছে যাও। তার ক্ষতস্থানে পট্টি লাগাও। নাসিয়া

বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি ও আমার দুই পুত্র রসুলে আকরম স. এর সম্মুখে থেকে যুদ্ধ করেছি। সাহাবীগণ যখন পরাজিত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমি সামনে ছিলাম। আমার হাতে কোনো ঢাল ছিলো না। রসুলেপাক স. এক ব্যাক্তির হাতে ঢাল দেখে তাকে বললেন, হে ঢালধারী ব্যক্তি! তোমার ঢালটি এমন একজনকে দাও, যে যুদ্ধরতা। সে তার ঢালটি আমার দিকে ছুঁড়ে দিলো। আমি সেটিকে ধরে ফেললাম এবং রসুলেপাক স. এর সম্মুখে যে সব মুশরিক এগিয়ে এসেছিলো তাদেরকে প্রতিহত করলাম। এক পর্যায়ে এক কাফের তলোয়ার দিয়ে আমাকে আঘাত করলো। আমি সে আঘাত ফিরিয়ে দিলাম। তারপর আমার তলোয়ার দিয়ে তার ঘোড়ার উপর আঘাত করলাম। ঘোড়াটি পড়ে গেলো। আরোহীও ছিটকে পড়ে গেলো তার বাহন থেকে। রসুলেপাক স. সব দেখলেন। তিনি আমার পুত্রকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আম্মারা! জলদি তোমার মায়ের কাছে চলে এসো। তারপর আমার পুত্র ও আমি রসুলেপাক স. এর নির্দেশ মোতাবেক সম্মিলিতভাবে ওই কাফেরকে আক্রমণ করলাম এবং তাকে জাহান্নামের যাত্রী বানিয়ে দিলাম

মহিলা সাহাবী নাসিয়ার পুত্র আবদুল্লাহ্ বলেছেন, যুদ্ধের দিন মুশরিকরা আমাকে জখম করলো। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বন্ধ হচ্ছিলো না। আমার মা ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিলেন এবং বললেন, ওঠো। যুদ্ধে যাও। রসুলেপাক স. বললেন, হে আম্মারার মা! তোমার মতো শক্তি ও সাহস আর কার আছে? তখন ওই লোকটি আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো, যে আমাকে জখম করেছিলো। রসুলেপাক স. বললেন, হে উম্মে আম্মারা! ওই লোকটিই তোমার পুত্রকে জখম করেছে। নাসিয়া লোকটির পায়ের গোছায় তরবারীর আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে রসুলেপাক স. এর পায়ের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তা দেখে রসুলেপাক স. হেসে ফেললেন। পবিত্র দন্ত দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি স. বললেন, হে উম্মে আম্মারা! তুমি তো তোমার পুত্রের আঘাতের কেসাস খুব ভালোভাবেই গ্রহণ করলে। আল্লাহ্র শুকরিয়া, যিনি তোমাকে শত্রুর উপর প্রাবল্য দান করলেন এবং তোমার সামনেই তাকে হালাক করে দিয়ে তোমার চোখকে প্রশান্ত করে দিলেন। নাসিয়া বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি দোয়া করুন, আমি যেনো আপনার সাথীদের মধ্যে আপনার আহলে বাইতের সঙ্গে জান্নাতে থাকতে পারি। রসুলেপাক স. তাঁর জন্য, তাঁর স্বামী ও সন্তানদের জন্য দোয়া করলেন— 'আল্লাহুম্মাজ্ব আলহুম রুফাক্বাঈ ফিল জ্বান্নাতি' (হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে জান্নাতে আমার সঙ্গী বানিয়ে দিয়ো)। উম্মে আম্মারা বলেন, রসুলেপাক স. এর ওই দোয়াই আমার সম্বল। এখন আমার উপর যত মুসিবতই থাকুক না কেনো, তাতে আমার আর কোনো অসুবিধা নেই। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, নাসিয়া মুসায়লামা কাযযাবের সঙ্গেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নাসিয়া বর্ণনা

করেন, আমি ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামা কাযযাবকে তালাশ করছিলাম। অকস্মাৎ এক হতভাগা আমার উপর তলোয়ার চালালো। ওই আঘাতে আমার একটি হাত কেটে পড়ে গেলো। আল্লাহ্র শপথ! তারপরও আমি যুদ্ধ থেকে পিছপা হইনি। এক মুহূর্ত পরেই আমি উক্ত অভিশপ্তকে নিহত অবস্থায় পেলাম। দেখতে পেলাম আমার পুত্র আবদুল্লাহ্ তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আর হতভাগাটির নাপাক রক্ত থেকে তরবারী পাক করছে। আমি শুকরিয়ার সেজদা আদায় করলাম এবং আমার জখমের উপর পট্টি বেঁধে নিয়ে পুনঃযুদ্ধে মনোনিবেশ করলাম। সুবহানাল্লাহ্! তিনি রমণী হয়েও ছিলেন অনেক পুরুষের চেয়ে অগ্রবর্তিনী।

কোনো এক বুযুর্গ বলেছেন, মানুষের আমল করা উচিত— সে পুরুষ হোক অথবা হোক নারী। বাঘ যখন খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সবাই বলে বাঘ বেরিয়ে এসেছে। কেউ বলে না সেটি বাঘ না বাঘিনী।

রসুলেপাক স. এর আহত হওয়া

উহুদের ময়দানে সাহাবীগণের কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, তাদেরকে হত্যা করা, সাহাবীগণের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং তাঁদের শাহাদত বরণ করার চেয়েও বড় ঘটনা রসুলেপাক স. এর রক্তরঞ্জিত হওয়া। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, কাফেরদের পাঁচ ব্যক্তি অঙ্গীকার করেছিলো, তারা রসুলেপাক স.কে জীবনের মতো শেষ করে দিবে। নাউযুবিল্লাহ্! তাদের মধ্যে একজন ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে কামিয়া। সে তার গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট, কটুভাষী এবং কঠোর হৃদয়ের লোক ছিলো। দ্বিতীয় জন ছিলো উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস যুহরী। সে ছিলো হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের ভাই। যার আঘাতে রসুলেপাক স. এর পবিত্র ওষ্ঠ ও দন্ত জখম হয়েছিলো। তৃতীয় জন ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে শেহাব যুহরী। চতুর্থ জন উবাই ইবনে খালফ। কেউ কেউ বলেন, পঞ্চম আরেক জন ছিলো। তার নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে হুমায়েদ আযাদী। তারা জানতো না যে, রসুলেপাক স. তাদের হাতে শহীদ হবেন না, যতক্ষণ না তাঁর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হবে। তাঁর আরাধ্য কর্ম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন, এমনটি হতে পারেই না। আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং এ সম্পর্কে বলেছেন— 'ইউরিদূনা লিইউত্বফিউ নূরাল্লাহি বিআফ্ওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহী ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন' (উহারা আল্লাহর নূর ফুঁৎকারে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফিররা উহা অপছন্দ করে) (৬১ঃ৮)।

অভিশপ্ত ইবনে কামিয়া রসুলেপাক স. এর উপর জোরে পাথর নিক্ষেপ করলো। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। কয়েকটি টুকরা গেঁথে

গেলো তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে। হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ তাঁর কাছে বসে পড়লেন। সামনের দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে এমন জোরে টান দিলেন যে, তাতে তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙে গেলো। অন্য দাঁত দিয়ে তিনি আবার আরেকটি টুকরা বের করার জন্য টান দিলেন। সে দাঁতও ভেঙে গেলো। এ কারণে হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে রুস্তম (বীরপুরুষ) উপাধি দেওয়া হয়েছিলো। অভিশপ্ত ইবনে কামিয়ার সেদিনের সে আঘাতে রসুলেপাক স. এর সারা শরীর লালে লাল হয়ে গিয়েছিলো। তিনি স. তাঁর পবিত্র চাদর দিয়ে সে রক্ত পরিষ্কার করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, ওই জনগোষ্ঠী কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে, যারা তাদের নবীর সঙ্গে এমন আচরণ করে? অথচ নবী তো মানুষকে আল্লাহ্র দিকেই আহবান করে যাচ্ছেন। তখন হজরত জিবরাইল এ আয়াত নিয়ে আবির্ভূত হলেন 'লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন আও ইয়াতূবা আ'লাইহিম আও ইউআজ্জিবাহুম ফাইন্নাহুম যলিমূন' (তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন— এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই; কারণ তাহারা তো যালিম (৩ঃ১২৮)।

এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে এ-ও বলা হয়ে থাকে যে, রসুলেপাক স. যখন কাফেরদের উপর বদদোয়া করে কুনুতে নাযেলা পাঠ করতেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয়। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. রক্তের ফোঁটা মুছে ফেলেন। মাটিতে পড়ার সুযোগ দেননি। বলেছেন, এ রক্ত মাটিতে পড়লে নিঃসন্দেহে পৃথিবীবাসীদের উপর আসমান থেকে আযাব নেমে আসবে। ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে তারা। তারপর মাটিতে আর কোনো কিছু উৎপন্নও হবে না। তিনি স. তখন দোয়া করেন— 'আল্লাহুম্মাগফির লিক্বাওমী ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামূন' (হে আল্লাহ্! তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও। এরা তো অবুঝ) (হাকীকত সম্পর্কে কিছুই জানে না এরা)।

উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস রসুলে আকরম স. এর গায়ে একটি পাথর নিক্ষেপ করলো। তাঁর পবিত্র ওষ্ঠ ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো এবং নীচের পাটির সামনের দাঁত ভেঙে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে শেহাব রসুলেপাক স. এর কনুই মুবারকে পাথর নিক্ষেপ করে জখম করে দিলো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. এর পবিত্র দেহ থেকে যখন ফিন্কি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো, তখন আমার পিতা মালেক ইবনে সেনান তাঁর মুখ দিয়ে ক্ষতস্থানের রক্ত চুষে নিলেন। রসুলেপাক স. বললেন, যার শরীরের রক্তের সঙ্গে আমার রক্ত মিশে যাবে, দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী এবং হজরত ফাতেমা রসুলেপাক স. এর শরীর থেকে রক্ত পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। হজরত আলী মাথায় করে পানি বয়ে এনে দিলেন,

আর হজরত ফাতেমা সেই পানি দিয়ে রসুলেপাক স. এর শরীরের রক্ত পরিষ্কার করলেন। বার বার রক্ত ধৌত করলেন, কিন্তু রক্ত ঝরা বন্ধ হলো না। তারপর চাটাইয়ের একটি টুকরা এনে তা পুড়ে ছাই করে নিলেন। সেই ছাই যখন ক্ষতস্থানে লাগালেন তখন রক্ত বন্ধ হলো। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. দীর্ঘ দিন ধরে পুরানো হাড্ডি দিয়ে ওই ক্ষতের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। অনেকদিন পর ওই আঘাতের দাগ মুছে গিয়েছিলো। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে বোখারীর ব্যাখ্যাকার শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, আবদুর রায্যাক থেকে, তিনি মা'মার থেকে, আর তিনি ইবনে শেহাব জুহুরী থেকে। বর্ণনাটি এরকম— রসুলেপাক স. এর পবিত্র শরীরে তরবারীর সত্তুরটি আঘাত লেগেছিলো, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা সব ক'টি আঘাত থেকে তাঁর হাবীব স.কে রক্ষা করেছিলেন। উলামাকেরাম বলেছেন, সত্তুরের সংখ্যাটি প্রকৃতই সত্তুর হতে পারে, অথবা আরবের রীতি অনুসারে সত্তুর দ্বারা অধিকসংখ্যক আঘাতের কথাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে।

বর্ণিত হয়েছে, ইবনে কামীয়া এক পর্যায়ে রসুলেপাক স.কে তলোয়ারের আঘাত করলো। তিনি তখন সে আঘাতের চাপে এবং তাঁর দেহে বহনকৃত হাতিয়ার সমূহের ভারে নিকটস্থ একটি গর্তে পড়ে গেলেন। গর্তটি আগে থেকেই হয়তো সেখানে ছিলো, অথবা মালউন ইবনে কামীয়াও তা খনন করে রাখতে পারে। গর্তে পড়ে যাওয়ার কারণে তিনি স. লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। ওভাবে পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর উরুদেশে আঁচড় লাগলো। ওদিকে মালউন ইবনে কামীয়া উচ্চকণ্ঠে প্রচার করতে লাগলো, মোহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে। শয়তানও তার কণ্ঠস্বরের মতো করে উপরোক্ত আওয়াজ করতে লাগলো। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করতে লাগলো, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! একাজ সম্পাদন করেছে কে? মালউন ইবনে কামীয়া বললো, আমি। আবু সুফিয়ান বললো, আমরা তোমার হাতে ওই বালা পরিধান করিয়ে দেবো, আজমীরা তাদের বাহাদুর লোকদেরকে যা পরিধান করিয়ে দেয়। রসুলেপাক স. যখন গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন, তখন হজরত আবু তালহা গর্তের ভিতরে নামলেন এবং রসুলেপাক স.কে কোলে তুলে নিলেন, যাতে তিনি স. উঠে দাঁড়াতে পারেন। এদিকে হজরত আলী উপর থেকে রসুলেপাক স. এর হাত ধরে সজোরে টান দিলেন। এভাবে গর্ত থেকে উপরে উঠতে পারলেন তিনি স.।

রসুলে আকরম স. ওই পাঁচজন চিরদুর্ভাগার জন্য এই মর্মে বদদোয়া করেছিলেন, যেনো তারা বৎসর অতিক্রম করতে না পারে। তাই হয়েছিলো। কেউ কেউ সেখানেই মারা গিয়েছিলো। আর কেউ কেউ মারা গিয়েছিলো সেই বৎসরই। মালউন ইবনে কামীয়া রসুলেপাক স. এর উপর তলোয়ারের আঘাত হেনে

বলেছিলো, এ হচ্ছে আমার আঘাত। আর আমি তো হচ্ছি ইবনে কামীয়া। রসুলে আকরম স. বলেছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে অপদস্থ করুন। ওই বৎসরেই তার এক বকরীর পালের সঙ্গে সে যখন পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলো তখন সেখানেই আল্লাহ্‌তায়ালা পাঠালেন একটি ভেড়া। ভেড়াটি তার শিঙ তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। ফেঁড়ে ফেললো তার কণ্ঠনালী। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনার আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে কামীয়ার ধ্বংস হওয়ার ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধের পরক্ষণেই সংঘটিত হয়নি। সংঘটিত হয়েছিলো বেশ কিছুদিন পর। কিন্তু 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থের বর্ণনায় এসেছে— উহুদ যুদ্ধ থেকে কাফেরদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর একদিন ইবনে কামীয়া এক পাহাড়ের উপর আরোহণ করে শুয়েছিলো। তখন আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে একটি ভেড়া এসে তাকে আক্রমণ করলো। বাকী ঘটনা পূর্বানুরূপ।

এখন উবাই ইবনে খালফের মৃত্যুর বর্ণনায় আসা যাক। রসুলেপাক স. একদিন তাকে বলেছিলেন, হে উবাই! আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে। রসুলেপাক স. তাকে একথা বলেছিলেন তখন, যখন সে বদর যুদ্ধের বন্দী হিসেবে মদীনায় এসেছিলো। তার মুক্তিপণ কবুল করা হয় এবং সে মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি পায় মুক্তিপণের অর্থ নিয়ে আসার জন্য। মক্কাগমনকালে সে নির্লজ্জের মতো বলেছিলো মোহাম্মদ! আমার একটি ঘোড়া আছে, তাকে আমি খুব ভালোভাবে দানা পানি খাওয়াবো। মোটা তাজা করবো। তারপর তার উপর সওয়ার হয়ে আবার তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবো। তখন আমি তোমাকে হত্যা করবো। রসুলেপাক স. বলেছিলেন, ঘোড়ায় আরোহণ করা অবস্থায়ই আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা। উলামা কেরাম বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও কমবখত ওই ব্যক্তি, রসুলেপাক স. এর হাতে যার মৃত্যু হয়েছে।

যুদ্ধের দিন রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে বলেছিলেন, তোমরা উবাই ইবনে খালফের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থেকো, সে যেনো পিছন দিক থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে না পারে। তোমাদের কারও নজরে পড়া মাত্রই তার অবস্থানের কথা আমাকে জানিয়ে দিয়ো। যুদ্ধের শেষের দিকে হঠাৎ করে দেখা গেলো, সে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছে। রসুলেপাক স.কে দেখতে পেয়ে সে বললো, হে মোহাম্মদ! এখন উবাইয়ের হাত থেকে তো বাঁচতে পারবে না। সে আরও বললো, তুমি যদি আজ আমার হাত থেকে বাঁচতে পারো, তাহলে......। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি আমাদেরকে ইশারা করুন, আমরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেই। মালউনটি যখন নিকটে এলো তখন রসুলেপাক স. এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন হজরত যোবায়ের

ইবনে আওয়াম। তিনি তাঁর হাত থেকে তীর নিয়ে নিলেন। অপর এক বর্ণনানুসারে রসুলেপাক স. হজরত হারেছ ইবনে সাম্মার হাত থেকে তীর নিয়েছিলেন। তিনি স. উবাই ইবনে খালফের দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন। আবার অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসুলুল্লাহ্ স. তারই হাত থেকে তীর নিয়ে তারই দিকে নিক্ষেপ করলেন। তীরটি উবাইয়ের ঘাড়ে বিদ্ধ হলো। সে তখন তার ঘোড়ার লাগামে টান দিয়ে ঘোড়াকে তার সহযোদ্ধাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো এবং সেখানে পৌঁছা মাত্রই ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়লো। মাটিতে পড়েই গরুর মতো বিকট আওয়াজ করতে লাগলো সে। লোকেরা বললো, তোমার আঘাত তো খুবই মামুলি; ঘষা লেগে ছাল উঠে যাওয়ার চেয়ে বেশী কিছু তো নয়। এতো চিৎকার ও বিলাপ করছো কেনো? সে বললো, এ আঘাত কার, তা আমি জানি। এ আঘাত খেয়ে আমি আর বাঁচতে পারবো না। যে আঘাত আমি একা পেয়েছি, তা যদি সমস্ত হেজাযের লোক পায়, তাহলেও সকলেই এক সাথে মারা যাবে। মোহাম্মদ বলেছিলো, আমার হাতেই তোমার মৃত্যু হবে। সে আরও বললো, মোহাম্মদ যদি খেজুরের একটি বীচিও আমার মুখে মেরে দেয়, তাহলেও আমি মারা যাবো। এরকম বলে চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে লাগলো সে। তারপর মুশরিকরা যখন উহুদ প্রান্তর থেকে মক্কার দিকে ফিরে চললো, তখন মক্কা থেকে এক মনজিল দূরবর্তী মাররুয যাহরান নামক স্থানে মালউন উবাই ইবনে খালফ মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, উবাই ইবনে খালফ বতনে রাবেগ নামক স্থানে মারা যায়। তিনি আরো বর্ণনা করেন, তার মারা যাওয়ার পর রাত্রির এক প্রহর যখন অতিবাহিত হলো, তখন আমি বতনে রাবেগ নামক স্থান দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি আগুনের শিখা দেখতে পেলাম। সভয়ে দেখলাম, ওই আগুনের ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসছে। লোকটির গায়ে আগুনের শিকল জড়ানো। পিপাসায় চিৎকার করছে সে। দেখলাম, মানুষ যেনো একে অপরকে বলছে, একে পানি দিয়ো না। কারণ সে রসুলুল্লাহ্‌র হাতে নিহত। উবাই ইবনে খালফ রসুলুল্লাহ্ স.কে হত্যা করার মানসে আবদুল্লাহ্ ইবনে হুমায়েদ মালউন উহুদের ময়দানে ঘোড়ায় চড়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। হজরত আবু দাজানা হঠাৎ তার উপর তলোয়ারের আঘাত করলেন। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এভাবে তারও ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেলো। উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের মৃত্যু কি অবস্থায় হয়েছিলো, তা জানা যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে শেহাবের মৃত্যুর ব্যাপারে 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সে-ও ওই বৎসরেই অপমান ও অপদস্থতার সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো।

উহুদ প্রান্তরের সর্বশেষ দৃশ্যপট

জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. যখন হজরত তালহা ও হজরত আলীর সাহায্যে গুহা থেকে বাইরে এলেন, তখন সাহাবায়েকেরাম জানতে পারলেন, তিনি স. জীবিত আছেন। তিনি স. ইচ্ছা করলেন, সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে উহুদের বিভিন্ন দিকে, পাহাড়ের উপরে অথবা ছাউনিতে ফিরে যাবেন। শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম। দুর্বলতা অনুভব করলেন তিনি। তাই পদবিক্ষেপ সহজ ও স্বাভাবিক হলো না। আবু সুফিয়ান চাইলো, মুশরিকদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের কোনো উঁচু স্থানে উঠে তাদের বিজয়ের ঘোষণা দিবে। রসুল স. পশ্চাদ্পসরণ করতে চাইলে বাধা সৃষ্টি করবে। রসুলেপাক স. দোয়ার জন্য হস্ত উত্তোলন করলেন। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে অগ্রসর হতে দিয়ো না। এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত ওমর ফারুক সাহাবীগণের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে মুশরিকদের অগ্রাভিযান বন্ধ করে দিলেন। তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করতেও সক্ষম হলেন। তারা ব্যর্থ হয়ে উহুদ প্রান্তরে কুকুরের পালের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করে আনন্দ উল্লাস করতে লাগলো। হিন্দা ও তাদের অন্যান্য নারীরা শহীদগণের নাক-কান কাটতে লাগলো। ওগুলো দড়িতে গেঁথে মালা বানালো। মালাগুলো পরিধান করলো তাদের হাতে ও গলায়। গাসিলে মালায়েকা হজরত হানযালার মরদেহকে কেবল অবিকৃত রেখে দিলো তারা। কারণ তিনি ছিলেন তাদের শ্রদ্ধাভাজন পুরোহিত আবু আমেরের পুত্র। তার আসল নাম ছিলো আবু আমের রাহেব। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে সে আবু আমের ফাসেক নামে পরিচিত। সে ছিলো পৌত্তলিক এবং সেই সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলো।

রসুলেপাক স. জোহরের নামাজ বসে বসে আদায় করলেন। নামাজ শেষে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে চাইলেন। সামনে ছিলো একটি প্রকাণ্ড পাথর। তাই আর অগ্রসর হতে পারলেন না। হজরত তালহা নিজে আহত হওয়া সত্ত্বেও রসুল স.কে তাঁর কাঁধের উপর উঠিয়ে নেয়ার জন্য তাঁর কাছে বসলেন। রসুলেপাক স. বললেন, 'আওজাব তালহাতু' (তালহা তার নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিলো)।

আবু সুফিয়ান রসুলেপাক স. জীবিত আছেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলো। পাহাড়ের কাছাকাছি এসে চিৎকার করে বলতে লাগলো, তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ আছে নাকি? রসুলেপাক স. মৃদুকণ্ঠে বললেন, তার প্রশ্নের জবাব দিয়ো না। সে আবার চিৎকার করে বললো, এখানে ইবনে আবু কুহাফা আছে নাকি? রসুলেপাক স. আবারও বললেন, জবাব দিয়ো না। সে আবার চিৎকার করে উঠলো, ইবনে খাত্তাব আছে নাকি? রসুলেপাক স. এবারও বললেন, জবাব দিয়ো

না। আবু সুফিয়ান তার নিজের লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি যাদের নাম ধরে ডাকলাম, তারা সকলেই মারা গিয়েছে। জীবিত থাকলে জবাব দিতো। হজরত ওমর ফারুক আর স্থির থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'কাযাব্‌তা ইয়া আ'দুওয়াল্লাহ (হে আল্লাহ্‌র দুশমন তুমি মিথ্যা বলেছো)। তুমি যাদের নাম নিয়েছো তাঁরা সকলেই জীবিত আছেন। আবু সুফিয়ান মুর্তির প্রশংসা করে বলতে লাগলো হে হুবল! তোমার জন্য উচ্চ মর্যাদা। তোমার বরকতেই আমাদের বিজয় হয়েছে। আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় হুবলের কাছে সাহায্য চেয়েছিলো। রসুল স. বললেন, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল্লু (আল্লাহ্‌তায়ালা উচ্চ মর্যাদাশীল ও মর্যাদাপূর্ণ)। আবু সুফিয়ান বললো, আল উয্‌যা লানা ওয়া লা উয্‌যা লাকুম (উয্‌যা আমাদের, তোমাদের উয্‌যা নেই)। আরো বললো 'আল্লাহু মাওলানা ওয়া লা মাওলা লাকুম'। সে আরো বললো, ইয়াওমুন বিইয়াওমিল বাদরি ওয়াল হারবু সিজ্বালু। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিলাম। যুদ্ধ হচ্ছে বালতির মতো। পালাক্রমে আসে, যায়। বদর যুদ্ধে তোমাদের বিজয় হয়েছিলো। আর আজ উহুদ যুদ্ধে বিজয় হলো আমাদের। যুদ্ধ বালতির মতোই কখনও এক রকমের পানি ধারণ করে আবার কখনও ধারণ করে অন্য রকমের পানি। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বললেন, 'ক্বাত্‌লানা ফিল জ্বান্নাতি ওয়া ক্বাতালাকুম ফিন্‌নার' (আমাদের নিহতরা বেহেশতে যাবে, আর তোমাদের নিহতরা যাবে দোযখে)। আবু সুফিয়ান বললো, তোমাদের নিহতদের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। আমি কিন্তু এরকম নির্দেশ দেইনি। আবার তা অপছন্দও করিনি। ঠিক আছে। আগামী বৎসর আবার তোমাদের সঙ্গে বদরপ্রান্তরে দেখা হবে। একথা বলেই সে সদলবলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলো। মনে করলো, তারা বিজয়ী হয়েছে।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর

মুশরিকরা মক্কায় ফিরে গেলো। সাহাবীগণের মনে এমতো সন্দেহ উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো যে, তারা হয়তো আবার এসে মদীনায় লুটপাট চালাবে। রসুলেপাক স. হজরত আলীকে তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে তাদের গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে বললেন। হজরত আলী তাদের অনুসরণ করতে করতে গেলেন। শেষে জানতে পারলেন, তারা সত্যি সত্যিই মক্কায় চলে গিয়েছে। তিনি এই সংবাদ নিয়ে ফিরে এলে রসুলেপাক স. বললেন, ওরা আর কখনও আমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং ইনশাআল্লাহুতায়ালা মক্কাবিজয় হবেই।

মুসলমানগণ আপন শহীদগণের লাশ সন্ধান করতে লাগলেন। বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছো, যে সাআদ ইবনে রবী ইবনে আমর আনসারীর অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারো? সে কি জীবিত, না শহীদ? হজরত সাআদ ইবনে রবী ইবনে আমর আনসারী রসুল স. এর প্রিয় সাহাবী ছিলেন। ছিলেন অনন্যসাধারণ এবং বিশুদ্ধচিত্ত। একজন আনসারী তাঁর অন্বেষণে বেরিয়ে গেলেন। একস্থানে গিয়ে দেখলেন, হজরত সাআদ ইবনে রবী আনসারী গুরুতর আহত অবস্থায় শহীদদের লাশের সঙ্গে পড়ে আছেন। আনসারী ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন। হজরত সাআদ আনসারী বললেন, আমার সালামও রসুল স. এর নিকট পৌঁছে দিয়ো। তার সঙ্গে পৌঁছে দিয়ো এই শুভেচ্ছা বাণী— জ্বাযাকাল্লাহু আ'ন্না ইয়া রসূলাল্লাহি আফদালু মা জ্বাযা নাবিয়্যানা আ'ন উম্মাতা— অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ আপনাকে এমন উত্তমতম বিনিময় দান করুন, যা কোনো নবী তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে পেয়ে থাকেন। তাঁর সহচরবৃন্দের নিকটেও আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো। বোলো, তাঁরা যদি রসুল স. এর হুকুম পালনে ক্রটি করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের কোনো অজুহাতই গৃহীত হবে না। এটুকু বলার পর তিনি জান্নাতের পথে পাড়ি দিলেন। আনসারী রসুলেপাক স. এর কাছে ফিরে এলেন। তাঁর বিবরণ শুনে তিনি স. বললেন— আল্লাহুম্মারদ্বা আ'ন সাআদ ইবনে রবী— (হে আল্লাহ্! সাআদ ইবনে রবীর উপর তুষ্ট হও)। সুবহানাল্লাহ্। বিশুদ্ধচিত্ততা, ভালোবাসা ও মহব্বতের কী বিস্ময়কর নিদর্শন। আলেমগণ বলেন, শহীদগণ অন্তিমযাত্রার সময় চোখের সামনে এমন কিছু দেখেন যা অন্যেরা দেখতে পায় না। বিশ্বাসীগণের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে এটাই যে, তাঁরা আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দিবেন। হবেন পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী। 'হেকায়াতে মাশায়েখ' গ্রন্থে আছে, জারীরী একবার শায়েখ আবু আবদুল্লাহ্ হাফীফকে বলেছিলেন— আশ্ শানুহু ওয়ার রূহু ওয়ালা তাউ'য্যা বিতুরহাতিস্ সূফিয়্যাহ্— মূল বস্তু হচ্ছে রুহু, যা শাহাদতের দরজায় পৌঁছে। সুতরাং তথাকথিত সুফীদের কৃত্রিমতা দৃষ্টে প্রতারিত হয়ো না।

উহুদের শহীদগণের জানাযা পড়ার ব্যাপারে হাদিসবেত্তাগণ এবং জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, সবার আগে হজরত হামযার জানাযা পড়া হয়। তারপর একজন একজন করে হজরত হামযার পাশে রেখে জানাযা পড়া হতে থাকে। এভাবে সত্তর বার জানাযা পড়া হয়। অর্থাৎ প্রতি জানাযাতেই হজরত হামযা ছিলেন। কিন্তু হাদিসবেত্তাগণ বলেন, বার বার জানাযা পড়া হয়নি। ইমাম শাফেয়ীর পছন্দনীয় অভিমত এটাই। হানাফী অভিমতও এরকম। মাসআলাটির বিস্তারিত আলোচনা এসেছে 'সফরুস্ সাআ'দাত' গ্রন্থে।

রসুলেপাক স. বললেন, শহীদকে গোছল দেওয়ার বিধান নেই। তাঁদেরকে রক্তমাখা কাপড় সহকারেই দাফন করতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা পুনরুত্থানদিবসে ওইভাবেই তাঁদেরকে কবর থেকে উঠাবেন। তখনও তাঁদের যখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। রঙ হবে রক্তের মতোই। কিন্তু তা থেকে বের হবে মেশক আম্বরের সুরভি। তিনি আরও বললেন, শহীদকে তাঁর স্থান থেকে অন্যত্র নেওয়া যাবে না। অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হলেও পুনরায় তাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে। হজরত জাবের তাঁর পিতা হজরত আবদুল্লাহ্কে মদীনায় নিয়ে গিয়েছিলেন। নবী করীম স. এর এমতো ঘোষণার পর আবার তাঁকে উহুদে আনা হলো। রসুলেপাক স. বললেন, যার সঙ্গে যার হৃদ্যতা বেশী, তাদের দু'জনকে একই কবরে দাফন করো। এ ঘোষণা শুনে হজরত হামযাকে দাফন করা হলো তাঁর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের সঙ্গে এক কবরে। এই নিয়মে কোনো কোনো কবরে একসঙ্গে তিনজন করে দাফন করা হলো। রসুলেপাক স. এরকমও বললেন, যে কোরআন বেশী জানে, তাকে লাহদ কবরে রাখো। সকলের দাফন শেষ করে দিনের শেষে রসুলেপাক স. মদীনায় ফিরে এলেন।

সকল গোত্রের নারী-পুরুষ মদীনার বাইরে এসে অপেক্ষা করছিলেন। রসুলেপাক স.কে পেয়ে তারা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। নির্বাপিত হলো আপনজন বিয়োগের শোকাগ্নি। তাঁদের মধ্যে এমন এক রমণী ছিলেন, যাঁর পিতা-পুত্র-স্বামী, এমনকি সকল নিকটাত্মীয় শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে ফিরছিলেন, আল্লাহ্র রসুল বেঁচে আছেন তো? তিনি বেঁচে থাকলে অন্য কারও মৃত্যুর কথা আমি ভাবি না।

রসুলেপাক স. বনী আশহাল জনপদে পৌঁছলেন। জনপদটি ছিলো হজরত সাআদ ইবনে মাআযের জনপদ। তিনি সেখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে হজরত সাআদ ইবনে মাআযের মাতা হজরত কাবশা বিনতে রাফে রসুলেপাক স.কে এক নযর দেখার জন্য দ্রুত ছুটে এলেন। রসুলে আকরম স. ঘোড়ার উপরে ছিলেন। হজরত সাআদ ইবনে মুআয ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইনি আমার মা, রসুলের দাসী ও সেবিকা। রসুলে আকরম স. বললেন, 'মারহাবান বিহা' (তাকে স্বাগতম)। তাঁর মা আরো কাছে এলেন। আল্লাহ্র রসুলের দীদার লাভে ধন্য হলেন। বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে সহি-সালামতের সাথে পেলাম। এখন আমার কাছে সকল বিপদই তুচ্ছ। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর পুত্র হজরত আমর ইবনে মুআযের শহীদ হওয়ার ব্যাপারে বললেন, হে সাআদের মাতা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং বাড়ির সকলের নিকটেও এই সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে, এ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে, তারা সকলেই এখন বেহেশতের বিভিন্ন বাগানে অবস্থান করছে। তারা সেখানে আনন্দের সাথে ঘোরাফেরা করছে। তাদের গৃহবাসীদের জন্য তাদের শাফায়াত

কবুল করা হবে। শহীদজননী বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি পরিতুষ্ট। আপনার পবিত্র মুখনিঃসৃত সুসংবাদ আমার দুঃখ দূর করে দিয়েছে। পৌঁছে দিয়েছে আনন্দধামে। আরও বললেন, হে আল্লাহর বাণীবাহক! যারা বেঁচে আছে, তাদের জন্য দোয়া করুন। রসুলুল্লাহ্ স. দোয়া করলেন— আল্লাহুম্মা আজহাব হুযনা ক্বুলূবিহিম ওয়া আজ্বুরি মুসীবাতাহুম — হে আমার আল্লাহ্! তাদের অন্তরের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দাও এবং তাদের এ বিপদের বিনিময় দান করো। তারপর রসুলে আকরম স. আহত সহচরবৃন্দকে আপন আপন ঘরে চলে যেতে বললেন। দিলেন চিকিৎসা গ্রহণ করার নির্দেশ। বললেন, আমার সঙ্গে কাউকে আসতে হবে না। বনী আশহাল গোত্রের লোকেরা আহত হয়েছিলো সবচেয়ে বেশী। তাঁদের প্রায় বিশজন লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। হজরত সাআদ রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গৃহ পর্যন্ত গেলেন। তাঁকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে তিনিও ফিরে গেলেন স্বগৃহে।

বর্ণিত হয়েছে, বিপদগ্রস্তরা রসুলুল্লাহ্ স.কে বরণ করে নেওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হজরত হামযার কন্যা হজরত ফাতেমা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রসুল স. এর সহযোদ্ধাদেরকে দেখছিলেন। দলে দলে লোক আসছে। হজরত ফাতেমা তাদের মধ্যে তাঁর পিতা হজরত হামযাকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সন্ধান পেলেন না। হঠাৎ হজরত আবু বকর সিদ্দীককে দেখতে পেয়ে বললেন, আমার পিতা কোথায়? আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না যে। একথা শুনে হজরত আবু বকর সিদ্দীক কেঁদে ফেললেন। নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন কেবল। কিছুক্ষণ পর বললেন, এখনই আল্লাহ্র রসুল এসে পড়বেন। রসুলেপাক স. এলেন একটু পরেই। তাঁর সঙ্গেও তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন না। হজরত ফাতেমা রসুলেপাক স.এর বাহনের লাগাম টেনে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! বলুন, আমার পিতা কোথায়? তিনি স. বললেন, তোমার পিতা আমি। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনার এই পবিত্র বচনের মধ্যে আমি তো রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। এমতো মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে সাহাবীগণও অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারলেন না। হজরত ফাতেমা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! বলুন, আমার পিতা কীভাবে শাহাদত বরণ করেছেন? তিনি বললেন, পুত্রী! সে অবস্থা যদি বর্ণনা করি, তাহলে তুমি স্থির থাকতে পারবে না। একথা শুনে ফাতেমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

সেদিন একটি অভিনব ঘটনা ঘটলো। যেমন, জীবনচরিতজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. যখন মদীনায় এসে পৌঁছলেন, তখন অধিকাংশ আনসারদের ঘর থেকে নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। কিন্তু হজরত হামযার ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা গেলো না। তিনি স. বললেন—

ওয়ালাকিন হামযাহ্ লিআবাওয়ালিয়া লাহু— হামযার জন্য তো কোনো ক্রন্দনকারিণী নেই। আনসারগণ একথা শুনতে পেয়ে তাঁদের আপন আপন গৃহবাসিনীদেরকে বললেন, তোমরা হামযার ঘরে যাও এবং তাঁর জন্য ক্রন্দন করো। পরে নিজেদের ঘরে এসে আপন শহীদদের জন্য কেঁদো। আনসার রমণীগণ সন্ধ্যা এবং শয়নকালের মধ্যবর্তী সময়ে হজরত হামযার ঘরে গেলেন। অর্ধরজনী পর্যন্ত কান্নাকাটি করলেন। রসুলেপাক স. ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙলে শুনতে পেলেন হজরত হামযার ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। জিজ্ঞেস করলেন এ কিসের আওয়াজ? সহচরবৃন্দ বললেন, আপনার পিতৃব্য হামযার ঘরে আনসারী রমণীরা ক্রন্দন করছে। তিনি স. বললেন, 'রাদিইয়াল্লাহু তাআ'লা আ'নকুন্না ওয়া আ'ন আওলাদিকুন্না ওয়া আওলাদি আওলাদিকুন্না' (রমণীগণ! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের প্রতি, তোমাদের সন্তানদের প্রতি এবং তোমাদের সন্তানের সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে।

'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. তখন বললেন, আমরা তো এমন চাইনি যে, রমণীরা আমার চাচার জন্য রোদন করবে। তিনি স. এভাবে কাঁদতে নিষেধ করে দিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্যও সাবধান হতে বললেন। বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী) বলেন— 'লাকিন হামযাহু লা বাওয়াকী লাহু' (হামযার জন্য তো কোনো ক্রন্দনকারিণী নেই) রসুলেপাক স. এর একথার উদ্দেশ্য ছিলো, হামযার দীনতার প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করা এবং তাঁর দুরাবস্থার প্রতি সমবেদনা জানানো। কেননা তিনি শহীদ হয়েছিলেন অত্যন্ত করুণভাবে। তাছাড়া এমন কেউই তাঁর ছিলো না, যে তাঁর জন্য কাঁদবে। মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ করার ব্যাপারে তখনও কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। আনসার রমণীগণও রসুলেপাক স. এর পরিতুষ্টির দিকে খুবই খেয়াল রাখতেন। তাই তাঁরা ধারণা করে নিয়েছিলেন, তিনি স. বুঝি এটাই চান যে, মানুষ তাঁর চাচার মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থে রোদন করুক। পরে তিনি স. যখন দেখলেন, তাঁরা এভাবে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে, তখন তাঁদের জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু শেষে এভাবে রোদন করতে নিষেধ করে দিলেন এই আশংকায় যে, তাদের কর্মকাণ্ডটি একটি বিলাপধর্মী অনুষ্ঠানের রূপ নিতে পারে। উল্লেখ্য, ওই সময় মেয়েদের জন্য সশব্দে কান্নাকাটি করা বৈধ ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে বৈধতার বিধানটি রহিত হয়ে যায়।

বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে উহুদ যুদ্ধে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে চারজন ছিলেন মুহাজির, আর ছিষট্টিজন ছিলেন আনসার। আর কাফেরদের মধ্য থেকে প্রায় তেইশজন জাহান্নামের যাত্রী হয়েছিলো। মুসলমানগণ

যখন রসুলেপাক স.কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের উপর এরকম মুসিবত নাযিল হওয়ার কারণ কী? তখন আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যাদেশ করলেন— 'ওয়া লাম্মা আসাবাত্কুম্ মুসীবাতুনু ক্বাদ আসাব্তুম মিছলাইহা ক্বুলতুম আন্না হাজা ক্বুল হুয়া মিন ই'নদি আনঁফুসিকুম' (যখন তোমাদের উপর মুসিবত আসিয়াছিলো, যাহার দ্বিগুণ তোমরা ঘটাইয়াছিলে, তখন কি তোমরা বলিয়াছিলে 'ইহা কোথা হইতে আসিল?' বল, ইহা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হইতে;)(৩ঃ১৬৫)। তোমরা কেন্দ্রস্থল পরিত্যাগ করে হুকুমের বরখেলাফ কাজ করেছো। বিজয় ও দৃঢ়তা তো আমার আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিলো। তোমরা তা করোনি। তোমরা আমার মতের বাইরে মদীনা থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করার প্রতি তাকিদ করেছিলে। তোমরা আমার অনুমতির অপেক্ষা করোনি। তারপরও আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন 'ওয়ামা আসাবাকুম ইয়াওমাল তাক্বাল জ্বামআ'ন ফাবিইজনিল্লাহ্' (যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখিন হইয়াছিল, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহের অনুমতিক্রমেই ঘটিয়াছিলো)(৩ঃ১৬৬)। মুসলমানদের তো এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, যা কিছু হয়ে থাকে তা আল্লাহ্র ইচ্ছার বাইরে হতে পারে না। আল্লাহ্র ফয়সালা ও তকদীর অনুসারেই সবকিছু হয়ে থাকে। এভাবে আল্লাহ্তায়ালা মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, তকদিরের উপর ইমান ও একীন থাকলে দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়।

উহুদের শহীদগণের বিশেষ মর্যাদা

রসুলেপাক স. উহুদের শহীদগণের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবেও শহীদগণের মর্যাদা সম্পর্কিত অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি স. বিশেষভাবে উহুদের শহীদানের ব্যাপারে বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের আত্মাসমূহকে সবুজ বর্ণের পাখিদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। তারা প্রতিদিন বেহেশতের ঝর্ণাসমূহে এসে পানি পান করে যায়। বেহেশতের বাগানের ফল খায়। বেহেশতের যথা ইচ্ছা তথায় উড়ে বেড়ায়। উড়তে উড়তে আরশের স্তম্ভে ঝুলন্ত প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের কাছে এসে রাত্রি যাপন করে। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে মোনাজাত করে বলে, হে আল্লাহ্! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের পৃথিবীবাসী ভাইদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে পারে এমন কেউ কি আছে? তারা যদি আমাদের এহেন নৈকট্য, আনন্দময় জীবন ও উত্তমতম আহারায়োজন সম্পর্কে তাদের কাছে বলতে পারতো, তাহলে তারা তাদের পৃথিবীর জীবনকে কাজে লাগানোর জন্য তৎপর থাকতো এবং তাকে গনিমততুল্য মনে করতে পারতো। তারা তাহলে জেহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে মোটেও আলস্য

করতো না। বরং জেহাদকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতো। জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারলে নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করতো। এই সুবিশাল নেয়ামত থেকে কখনও বঞ্চিত হতো না। তখন আল্লাহ্তায়ালা বলেন, আমি তোমাদের রব। আমিই তোমাদের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়— 'ওয়ালা তাহ্সাবান্নাল্ লাজীনা ক্বুতিলূ ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াতান বাল আহ্ইয়াউন ই'নদা রব্বিহিম ইউর্যাকূন' ফারিহীনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদ্বলিহী (যাহারা আল্লাহের পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনোই মৃত মনে করিওনা। না, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তাহারা জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত) (৩ঃ১৬৯-৭০)।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের উপর আল্লাহ্তায়ালার জালওয়া প্রকাশিত হলো। তিনি তাদেরকে বললেন, হে শহীদগণ! আমার পথে আত্মউৎসর্গকারীগণ! তোমাদের প্রার্থনা কী, বলো? তাঁরা প্রার্থনা করলেন, হে আমাদের মাওলা! হে আমাদের রব! আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমরা যেনো তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পুনরায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করলেন, আমি যাকে গ্রহণ করি, তাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাই না। ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, পুনরায় শহীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করা এবং পৃথিবীতে আবার ফিরে আসার সার্থকতা কী? তারা যে মর্যাদার প্রত্যাশী, তা তো তাঁরা প্রথম শাহাদতের মাধ্যেমেই লাভ করেছেন। দ্বিতীয়বার জন্ম হলেও তো তাঁরা শহীদই হবেন। শহীদ তো তাঁরা হয়েছেনই। তাহলে অতিরিক্ত আর কী হলো? এর উত্তরে বলা যায় যে, তাঁরা দ্বিতীয়বার শহীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং দ্বিগুণ সওয়াব লাভের আশায় এমতো প্রার্থনা করতেই পারেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন—'লাইন শাকারতুম লাআযীদান্নাকুম' (তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিব) (১৪ঃ৭)। আবার এমনও হতে পারে যে, শহীদ হওয়ার সময় তাঁরা যে তৃপ্তি পান, তা পুনরায় পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হন, যদিও বাহ্যিকভাবে শাহাদতলাভ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হয়। আবার এমনও তো হতে পারে যে, তাঁরা পুনরায় শহীদ হওয়ার আকাংক্ষা করেন শাহাদতের মাধ্যমে তাঁরা যে নেয়ামত লাভ করেন তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ শহীদগণের নিকট ওই সময় আল্লাহ্র পথে জীবনদান করার চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত আছে বলে মনে হয় না। কাজেই তাঁরা আর অন্য কিছুই কামনা করেন না।

উপরে যে অবস্থার কথা বর্ণনা করা হলো তা হচ্ছে, আলমে বরযখের অবস্থা। আর আখেরাতে তো তাঁদের জন্য আল্লাহর দীদার পাওয়ার অঙ্গীকার আছেই। না হলে তাঁরা তা-ও কামনা করতেন। কেন না দীদারে এলাহী হচ্ছে সমস্ত নেয়ামতের ঊর্ধ্বে। হাদিসের প্রকাশ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শহীদগণের পরকালীন হায়াতটি প্রকৃত হায়াত এবং শারীরিক হায়াতই হবে। শুধু আধ্যাত্মিক ও আত্মিক হায়াত হবে না। কোনো কোনো আলেম এরকমই মনে করেন। শহীদগণের হায়াত সম্বন্ধে যা বলা হলো, নবীগণের হায়াত তার চেয়েও অধিক পূর্ণ ও উন্নততর। নবীগণের হায়াত সম্পর্কিত মাসআলা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে—'জযবুলকুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' গ্রন্থে। মাসআলাটির প্রতিটি দিক সম্বন্ধেই সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ চাহেন তো তার কিয়দাংশ 'রসুলেপাক স. এর ওফাত' শিরোনামে আলোচনায় আনা হবে।

বিঃ দ্রঃ উলামা কেরাম বলেছেন, পাখির দেহের মধ্যে তাঁদের আত্মাকে স্থান দেওয়া আত্মার বিশেষ সম্পৃক্ততার একটি পদ্ধতি। পাখি মানুষের আত্মাকে ধারণ করার যোগ্যতা রাখে না। এটা এক ধরনের অবনতিও বটে, যা পুরস্কৃত হওয়ার প্রতিবন্ধক। কারণ, মানুষই শ্রেষ্ঠ, পাখি নয়। সুতরাং শহীদের আত্মাকে পাখির অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর বিষয়টি হবে এরকম যেমন— মূল্যবান মনি-মুক্তা, যা সিন্দুক বা মূল্যবান কোনো পাত্রে রাখা হয়। তাঁদের আত্মাসমূহও এভাবে স্থাপন করা হবে। তবে এক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি উঁকি দিতে পারে যে, পাখির ভিতরে থেকে তাঁদের আত্মা বেহেশতের নেয়ামত ও লজ্জত তাহলে উপভোগ করবে কীভাবে? এখানে মাধ্যমটিকেই কি তাহলে অনুভূতির অস্তিত্ব প্রদান করা হবে? উত্তর— না, সেরকম নয়। বরং বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— বেহেশতী পাখিকে রাখা হবে মানুষের দেহের মতো করে। অর্থাৎ দৃশ্যত তা পাখির মতো হলেও তার মধ্যে থাকবে প্রবল মানবীয় অনুভূতিই। এ যেনো সেই পূর্বের মানুষই, কিন্তু আকৃতি হবে পাখির মতো। যেমন পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে, তেমনি বেহেশতের মধ্যে তাঁরা হবেন পাখির আকৃতিধারী। অবশ্য এর মধ্যে জন্মান্তরবাদের ধারণাটি আপনাআপনি চলে আসে। রুহ্ এক দেহ থেকে আরেক দেহে প্রবেশের কথাটিও স্মরণপথে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পার্থক্য থাকে শুধু এতটুকু যে, এ দেহের আকৃতি ওই দেহের আকৃতি থেকে ভিন্নতর। এমতো সন্দেহের নিরসনার্থে বলা যায়— তানাসুখ বা জন্মান্তরবাদ নিষিদ্ধ কেবল পৃথিবীতে, পরবর্তী পৃথিবীতে নয়। যদি তা না হয়, তবে তো হাশর নশরও বাতিল হয়ে যায়। আর তাদের এ অবস্থা তো হবে বরযখে। সেখানে আমানত হিসেবে তাঁদের আত্মাকে পাখির অভ্যন্তরে রেখে দেওয়া হবে। তারপর হাশর যখন হবে, তখন তো তাঁরা তাঁদের পৃথিবীর আসল দেহই ফিরে পাবেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শহীদদের আত্মাসমূহ পাখির দেহে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁদের একথা হাদিসের বাহ্যিক ভাষ্যের পরিপন্থী। কেননা নবী করীম স. বলেছেন, 'ইয়াদখুলু ফী জ্বাওফিত ত্বইউর' (পাখিদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবে)। তাই বলা যেতে পারে, আলমে বরযখে তাদেরকে পাখির মর্তবায় রাখা হবে এবং পরে যখন হাশর নশর হবে তখন তাদের আসল দেহ সৃষ্টি করে ইনসানী মর্তবায় পৌঁছে দেওয়া হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর বলেছেন, আমি 'মসনদে ইমাম আহমদ' গ্রন্থে এমন একটি হাদিস পেয়েছি, যাতে মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— মুসলমানদের আত্মাসমূহ বরযখী জীবনে বেহেশতে থাকে এবং সেখানে তারা পানাহার করে। সেখানকার সবুজ প্রান্তরে তারা বিচরণ করে— তারা সৌন্দর্য অবলোকন করে। যে জিনিস তারা পরে লাভ করবে, তা তখনই সেখানে দেখতে পায়। হাদিসটি সহীহ্ ও আযীয সনদে বর্ণিত হয়েছে। মাযহাবের চারজন ইমামের মধ্যে তিনজনই উক্ত মতের সঙ্গে একমত। সূত্রপরম্পরা এরকমঃ হাফেজ ইবনে কাছীর, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, যুহরী- আবদুর রহমান তাঁর পিতা কাআব ইবনে মালেক রসুলুল্লাহ স. থেকে। তিনি স. বলেছেন, মুমিনের আত্মা একটি পাখি, যা বেহেশতের বৃক্ষের ফল খায়। যেদিন তাকে তার শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হবে, সেদিন পর্যন্ত সে এভাবেই থাকে। এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুমিনের আত্মাও পাখির আকৃতিতে বেহেশতে অবস্থান করবে। আর শহীদদের রুহ সবুজ পাখির পেটের মধ্যে থাকবে। সুতরাং সাধারণ মুমিনদের তুলনায় শহীদদের আত্মা হবে আরোহীর মতো উন্নত স্তরের।

হজরত তালহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, উহুদ যুদ্ধ শেষে রসুলুল্লাহ স. ভাষণ প্রদান করলেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর মুসলমানদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে পুণ্য ও পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন, তার বিবরণ দিলেন। তারপর পাঠ করলেন— 'রিজালুন সদাক্বু মা আ'হাদূল্লাহা আ'লাইহি ফামিন হুম মান ক্বাদা নাহ্বাহু ওয়া মিন হুম মাইঁ ইয়ানতাযিরু' (মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সহিত তাহাদের কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করিয়াছে, উহাদের কেহ কেহ শাহাদাতবরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে) (৩৩ঃ২৩)।

হজরত আবু ফারওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসুলুল্লাহ্ স. উহুদের শহীদানের কবর যিয়ারতের জন্য বের হলেন। কবরের কাছে পৌঁছে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমিই ইবাদতের একমাত্র অধিকারী। নিঃসন্দেহে তোমার এই বান্দা ও রসুল সাক্ষ্য দিচ্ছে, এরা তোমার পরিতোষলাভার্থে শাহাদতবরণ

করেছে। তারপর জানালেন, যারা এদেরকে যিয়ারত করবে এবং এদেরকে সালাম দিবে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা এ সালামের জবাব পেতে থাকবে। বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. যখন উহুদের শহীদদের যিয়ারতে যেতেন, তখন বলতেন— 'আস সালামু আ'লাইকুম বিমা সবারতুম ফানি'মা উ'ক্ববাদ্দার' (সবর করার কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের আখেরাতের পরিণাম কতই না শুভ)। রসুলেপাক স. এর মহাতিরোধানের পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত ওমর ফারুকও এভাবে তাঁদেরকে যিয়ারত করতেন এবং সালাম দিতেন। ফাতেমা খাযাইয়া বলেন, একবার আমি উহুদ প্রান্তর অতিক্রমকালে বললাম— 'আস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া আ'ম্মা রসূলাল্লাহ্' (হে রসুলুল্লাহ্র চাচা! আপনাকে সালাম)। জবাব শুনতে পেলাম 'ওয়া আলাইকাস্ সালামু ওয়া রহমতুল্লাহি ও বারকাতুহ্' (তোমার উপরও শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)।

আত্তাফ ইবনে খালেদ মাখযুমী তাঁর মামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার আমি উহুদের শহীদানের যিয়ারতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলো কেবল আমারই ঘোড়ার তত্ত্বাবধানকারী দু'জন গোলাম। আর কেউ ছিলো না। আমার মনে পড়লো রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমরা উহুদের শহীদানকে সালাম প্রদান কোরো। তারা জীবিত। তারা সালামের জবাব দেয়। আমি তাঁদেরকে সালাম দিলাম। সালামের জবাব শুনতে পেলাম। একথাও শুনতে পেলাম— নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে চিনতে পেরেছি। বলাবাহুল্য, উহুদের শহীদানের মর্যাদা সম্পর্কে এরকম অনেক খবর ও আছারের বর্ণনা রয়েছে।

জীবনীবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন, ছেচল্লিশ বৎসর পর কোনো কারণে উহুদের কোনো কোনো শহীদের কবর উন্মোচন করার প্রয়োজন পড়লো। তখন কবর উন্মোচন করলে দেখা গেলো, তারা যেনো কাফনের ভিতর এক একটি ফুটন্ত তরুতাজা ফুল। দেখলে মনে হয় যেনো আজই তাঁদেরকে দাফন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কাউকে এমন দেখা গেলো যে, তাঁরা আপন হাত জখমের উপর রেখে শুয়ে আছেন। যখনই জখম থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া হয়, তখনই জখম থেকে তাজা রক্ত বের হতে থাকে। ছেড়ে দিলে ওই হাত আবার সেই জখমের জায়গায় ফিরে যায়। যে কারণসমূহের জন্য তাঁদের কবরসমূহ উন্মোচন করা হয়েছিলো, তার মধ্যে অন্যতম কারণ ছিলো এই— কোনো একজন শহীদের কবরে তাঁর নিকটজন ব্যতীত ভিন্ন পুরুষকে সঙ্গী করে দাফন করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে রসুলেপাক স. এর স্পষ্ট নির্দেশে, অথবা কিয়াস ও ইজতেহাদের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করে আলাদাভাবে দাফন করা হয়েছিলো। আবার কারও কারও কবর পুনর্খনন করতে হয়েছিলো তাঁদের কবরে পানি প্রবেশ করতে থাকার জন্য। খেজুর বাগানে পানি দিতে যে নালাগুলো ব্যবহার করা

হতো, ওগুলো থেকেই পানি চুয়ে চুয়ে তাঁদের কবরে প্রবেশ করছিলো। সে কারণে কিছু কিছু কবর ভেঙেও যাচ্ছিলো। তবে এ বিষয়টি ছিলো গৌণ। মুখ্য বিষয় ছিলো প্রথমোল্লেখিত কারণটিই। তাছাড়া আরেকটি কারণও ছিলো। তা হচ্ছে— হজরত মুআবিয়ার শাসনামলে মাশহাদ নামক এক স্থানে খাল খনন করা হয়েছিলো। সেই খালের পানি নেমে অধিকাংশ কবর থেকে শহীদগণের লাশ বের হয়ে গিয়েছিলো। তাই তাঁদেরকে তাঁদের কবর থেকে বের করে পুনরায় দাফন করতে হয়েছিলো।

'তারিখে মদীনা' গ্রন্থের বরাত দিয়ে ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী থেকে 'শেফাউল আসকাম' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, আমীর মুআবিয়ার নির্দেশে খাল খনন করা হচ্ছিলো। খালটি শহীদগণের কবরসমূহের নিকটে এলে এক খননশ্রমিকের কোদালের একটি কোপ সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা হজরত হামযার পবিত্র পায়ে গিয়ে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পা থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। ওই খালটি খননের প্রাক্কালে মদীনা মুনাওয়ারায় এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিলো যে, আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশে নহর খনন করা হচ্ছে। নহরের মুখে কারও প্রিয়জনের কবর যদি পড়ে, তবে তারা যেনো ওই কবরকে স্থানান্তরিত করে নেয়।

জীবনীবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান এবং মক্কার অন্যান্য মুশরিকরা উহুদ যুদ্ধ থেকে মক্কায় ফিরে যেতে যেতে আক্ষেপ করতে লাগলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো, আমরা খামাখা ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। সৈন্য সমাবেশ করলাম। মোহাম্মদকে উৎখাত করার সুযোগও পেয়েছিলাম। তার সাথীসঙ্গীদের অনেককে হত্যাও করতে পারলাম। কিন্তু পুরোপুরি কার্য সমাধা না করে ফিরে যাচ্ছি কেনো? চলো। আবার যাই। মোহাম্মদ ও তার লোকজনকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলি। তারপর মক্কায় যাই। আবু সুফিয়ানের মনোভাবও ছিলো এরকম। ইকরামা ইবনে আবু জাহেলও সমর্থন করলো তাকে। কিন্তু সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বেঁকে বসলো। বললো, তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। এমনও তো হতে পারে যে, পরাস্ত হয়ে তারা এখন প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কাছে পেলে তারা ক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাছাড়া আউস ও খাযরাজ গোত্রের সকল লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এবার হয়তো সকলে সংগঠিত হয়ে আসবে। জয়ী হওয়ার জন্য তখন তারা প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ফলে যা ভাবা হচ্ছে, অবস্থা হবে তার বিপরীত। যুদ্ধে তারা জয়ী হবে এবং আমরা হবো পরাভূত।

মুশরিকদের মক্কায় ফিরে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে রসুলেপাক স. তাদের কানে এই বিজ্ঞপ্তিটি পৌঁছে দিলেন যে, মুসলমানেরা পুনঃযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তাদের শক্তি-সামর্থ্য এতোটুকুও খর্ব হয়নি। সেদিন ছিলো রবিবার। তিনি ঘোষণা দিলেন, গতকাল যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু আমরা আজই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

পারি। তিনি স. হজরত বেলালকে বললেন, ঘোষণা দিয়ে দাও, আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর এ-ও জানিয়ে দাও, গতকালের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি, তাদের এখন প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার নেই। প্রস্তুতি কেবল তারাই নিবে, যারা গতকাল উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এরকম ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, মুশরিকরা যেনো বুঝতে পারে, গতকালের মুজাহিদেরা মোটেও ভীত ও ক্লান্ত নয়। কোনোরকম দুর্বলতাই তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাদের সাহস ও সামর্থ্য দু'টোই অটুট। তিনি স. বললেন, একথাটিও জনসাধারণ্যে এলান করে দাও, আউস ও খাযরাজ গোত্রের যে সকল লোক গতকাল যুদ্ধে যায়নি, আজও তাদেরকে যুদ্ধে যেতে হবে না। সাহাবীগণ আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ পালনার্থে পুনঃপ্রস্তুত হতে লাগলেন। আহতরা তাঁদের আপন আপন জখমের উপর পট্টি বেঁধে নিলেন। রসুলেপাক স.ও যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। মুসলমান বাহিনী তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো। তখন অবতীর্ণ হলো— 'আল্লাজীনাস্ তাজ্বাবূ লিল্লাহি ওয়ার্ রসূলি মিম্ বাআ'দি মা আসাবাহুমুল ক্বারহু লিল্ লাজীনা আহ্সানূ মিনহুম ওয়াত্ তাক্বাও আজ্বরুন আ'জ্বীম' (জখম হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ্ ও রসুলের ড়াকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে) (৩ঃ১৭২)।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্র ঘর বাড়ি দেখা শোনার কাজে নিয়োজিত থাকায় উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি আবেদন করলেন, আমাকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হোক। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো। এরকম অন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হলো না। রসুলেপাক স. আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে কুলছুমকে মদীনা মুনাওয়ারার দায়িত্ব দিলেন। হজরত আলী ইবনে আবু তালেবকে দিলেন যুদ্ধের পতাকা বহন করার দায়িত্ব। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীককে পতাকা বহনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হামরাউল আসাদ ছিলো মদীনা থেকে বাম দিকে তিন মাইল দূরে। সেখান থেকে যুল হুলায়ফার দিকে যাওয়ার রাস্তা চলে গিয়েছে। রসুলেপাক স. সেখানে গমন করলেন। রাত্রি হলো। তিনি স. সাহাবীগণকে পাঁচশ জায়গায় আগুন জ্বালাতে বললেন। এরকম করতে বললেন শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য। যেনো তারা দূর থেকে দেখে মনে করে, মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অনেক।

মা'বাদ ইবনে উম্মে মা'বাদ খাযায়ী তখনও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হননি। কিন্তু তিনি রসুলেপাক স. কে ভালোবাসতেন। কারণ বনী খাযায়ী গোত্রের সঙ্গে রসুলেপাক স. এর সন্ধি ছিলো। মা'বাদ খাযায়ী মক্কায় যাচ্ছিলেন। তিনি হামরাউল আসাদে পৌঁছে রসুলুল্লাহ্ স. এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং উহুদ

যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সাহাবীগণের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলো, মোহাম্মদের কোনো সংবাদ জানো কি? তিনি বললেন, উহুদের যুদ্ধে যারা হাজির ছিলেন, তারা ছাড়াও আরও অনেক লোককে একত্রিত করে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বাইরে চলে এসেছেন। আমি তাদেরকে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে দেখে এসেছি। লোকেরা বললো, তাই নাকি? মা'বাদ খাযায়ী বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ঠিকই বলছি। আমার মনে হচ্ছে, তোমরা এস্থান ত্যাগ করার আগেই মুসলিম বাহিনীর ঘোড়াসমূহের চেহারা দেখতে পাবে। তাদের আগমনের আওয়াজও শুনতে পাবে। বলা বাহুল্য, মা'বাদ খাযায়ী ঠিক বলেননি, যদিও তাদের কাছে কসম কেটেছেন। তাঁর এমতো বক্তব্যদানের কারণ নির্ণয়ার্থে বলা যেতে পারে যে, তিনি হয়তো এর মধ্যেই কল্যাণ দেখেছিলেন। অথবা তিনি তাঁর ধারণা অনুসারে কথা বলেছেন। প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে দেখেননি। কিংবা বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে এমনি এমনিই ওরকম করে বলে দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য যা-ই থাকনা কেনো, তাঁর কথা শুনে মুশরিকদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলো। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তারা মাক্কার দিকে চলে গেলো। মা'বাদ খাযায়ী সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠিয়ে দিয়ে রসুলেপাক স.কে সংবাদ জানিয়ে দিলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে ভয় দেখানোর জন্য আরেকটি দল সুসজ্জিত করে মদীনার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। তারাও হামরাউল আসাদ স্থানে পৌঁছে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করে দিলো। কিন্তু মুসলমানগণ তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের কথার জবাব দিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন— 'আল্লাজীনা ক্বালা লাহুমুন নাসূ ইন্নান নাসা ক্বাদ জ্বামাউ'লাকুম ফাখ্শাওহুম ফাযাদাহুম ঈমানাও ওয়া ক্বালূ হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াক্বীল' (ইহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর; কিন্তু ইহা তাহাদের ইমান দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক!)(৩ঃ১৭৩) এ থেকে এই শিক্ষাটি লাভ করা যায় যে, শত্রুপক্ষ থেকে কোনোপ্রকার ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে এই আয়াত পাঠ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্তায়ালা ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। দোয়া মাছুরার মধ্যে কিছু অংশ বেশী আছে। আর তা হচ্ছে— নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর (তিনি কতই উত্তম মাওলা এবং তিনি কতই না উত্তম সাহায্যকারী)।

হামরাউল আসাদে দু'জন কাফেরকে হত্যা করা হয়। তন্মধ্যে একজন ছিলো আরবের কবি আব্দুল উয্যা। সে ছিলো বদর যুদ্ধের একজন বন্দী। তাকে ফিদ্য়া

ব্যতীতই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো এই শর্তে যে, সে ভবিষ্যতে আর কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগহণ করবে না। কিন্তু সে শর্তভঙ্গ করে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলো এবং সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। রসুলেপাক স. তাকে কতল করে ফেলার হুকুম দিয়ে বললেন, 'লা ইউল্‌দাগুল মু'মিনু মিন হুজ্বরিম মার্‌রাতাঈন' (মুসলমানদেরকে এক গর্ত থেকে দু'বার দংশন করা যায় না)। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো মুআবিয়া ইবনে মুগীরা। সে সব সময় মুসলমানদেরকে যন্ত্রণা দিতো। উহুদ যুদ্ধে সে-ও বন্দী হয়েছিলো। রসুলেপাক স. তাকেও কতল করার হুকুম দিয়েছিলেন।

রাজী অভিযান

হিজরতের ছত্রিশতম মাসে সফর চাঁদে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। রাজী অভিযানটি পরিচালিত হয় হুযায়েল গোত্রের বসতির দিকে। স্থানটি মক্কা ও গাসফান এর মধ্যবর্তী হেজাজের দিকের একটি এলাকা। এ ঘটনাটি যেহেতু রাজী নামক স্থানের নিকটেই সংঘটিত হয়েছিলো, তাই এ নামেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এই বৃত্তান্তের মধ্যে আদল ও কারা গ্রাম দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানকার অপর অভিযানটির নাম বীরে মাউনা, যা চতুর্থ বৎসরে সংঘটিত হয়েছিলো। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। সেখানে রাআল ও যাকওয়ান গ্রামের কথা বলা হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, রাজী অভিযান হয়েছিলো হিজরতের তৃতীয় বৎসরে। আর বীরে মাউনার ঘটনা ঘটেছিলো চতুর্থ বৎসরের শুরুতে। এ দু'টি ঘটনাই খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিলো। জীবনচরিত-বিশারদগণ বলেন, রাজী এবং বীরে মাউনার সাহাবীগণের সংবাদ এক রাতেই এসেছিলো। বোখারীর পরিচ্ছেদবিন্যাসের ভাবধারাও এই ধারণাই দেয়। অর্থাৎ রাজী ও বীরে মাউনার অভিযান মূলতঃ একটিই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কেননা রাজী অভিযানে পাঠানো হয়েছিলো হজরত আসেম, খুবায়েব ও তাঁর সাথীসঙ্গীগণকে। আদল, কারা, বীরে মাউনা, রাআল ও যাকওয়ান এগুলি কাছাকাছি স্থান হিসেবে ইমাম বোখারী এ দু'টির বর্ণনা এক সাথে এনেছেন। তাই বলে বোখারীর উদ্দেশ্য এ নয় যে, ঘটনা দু'টি মূলতঃ একই।

ওই অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা এরকম— উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর সুফিয়ান ইবনে খালেদ হুযালী নামক এক নরাধম আদল ও কারার লোকদের সঙ্গে কুরায়েশদেরকে অধিকতর উল্লসিত করার জন্য মক্কায় পৌঁছলো। কেননা বাহ্যিকভাবে উহুদ যুদ্ধে তারা এক প্রকারের বিজয়ের মুখ দেখেছিলো। সে মক্কায় পৌঁছে শুনতে পেলো, তালহা ইবনে আবী তালহা, যে উহুদের যুদ্ধে কাফেরদের পতাকাধারী ছিলো, সে তার সন্তানাদিসহ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আরো শুনতে

পেলো, তার স্ত্রী সালাফা বিনতে সাআদ এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছে যে, যে তার স্বামী সন্তানের হত্যাকারী— আসেম ইবনে ছাবেতকে হত্যা করে তার মস্তক কেটে এনে দিতে পারবে, তাকে একশটি উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এই গ্রন্থের ভাষ্যমতে বুঝা যায়, সালাফা তার স্বামীর হত্যাকারী আসেম ইবনে ছাবেতের ব্যাপারেই বিশেষভাবে ঘোষণা দিয়েছিলো। তবে 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থের বর্ণনামতে জানা যায়, সালাফা বলেছিলো, যে আমার সন্তানদের কোনো একজন হত্যাকারীর মাথা কেটে আনতে পারবে, তাকেই একশ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। তার চার পুত্র ছিলো। তাদের মধ্যে দু'জনকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন হজরত আসেম ইবনে ছাবেত। একজনকে হত্যা করেছিলেন হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ও অপরজনকে জাহান্নামের বাসিন্দা বানিয়েছিলেন হজরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম। শেষোক্ত বর্ণনা অনুসারে মনে হয় না যে, সালাফার ঘোষণা কেবলমাত্র হজরত আসেম ইবনে ছাবেতের জন্যই সুনির্দিষ্ট ছিলো। হজরত আসেমের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, রসুলেপাক স. তাঁকে এ অভিযানের সঙ্গী বানিয়েছিলেন। যাহোক, সুফিয়ান ইবনে খালেদের মনে একশ' উট পুরস্কার পাওয়ার লালসা জাগ্রত হলো। সে তার সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে বেছে বেছে সাতজন দুষ্ট লোককে নির্বাচিত করলো। তাদেরকে মদীনায় প্রেরণ করলো। যাত্রার প্রাক্কালে তাদেরকে শিখিয়ে দিলো, তারা যেনো সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশ করে। আরও শিখিয়ে দিলো, তারা যেনো আবেদন জানায় তাদেরকে ইসলামের হুকুম-আহকাম শিখানোর জন্য সাহাবীগণের মধ্য হতে একটি দল তাদের সঙ্গে প্রেরণ করা দরকার। হতে পারে সালাফার সন্তানদের হত্যাকারীদের মধ্য হতে কেউ না কেউ তাদের সঙ্গে এসে যেতে পারে। আর তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফলও হয়ে যেতে পারে।

আদল ও কারা গোত্রের ওই সাতজন দুর্বৃত্ত মদীনায় এলো। বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা মুসলমান হয়েছি। আমাদের এলাকার একদল লোকও ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার সাহাবীগণের মধ্য হতে একটি দলকে আমাদের সঙ্গী করে দিন। তারা আমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিবে। ধর্মের বিধিবিধানের কথা জানাবে। সহীহ্ বোখারীতে এ ঘটনার উল্লেখ নেই। বোখারীর বর্ণনা এরকম— রসুলুল্লাহ্ স. অভিযাত্রীবাহিনী প্রেরণ করলেন। দলাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন হজরত আসেম ইবনে ছাবেতকে। অভিযাত্রীদল গাসফান এবং মক্কার মধ্যবর্তী স্থানের দিকে যাত্রা করলো। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে— সুফিয়ান ইবনে খালেদ তার কওমের সাতজন লোককে মদীনায় প্রেরণ করলো। তারা কপটাচরণের সাথে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানালো। সাহাবাকেরামের একটি জামাতকে তাদের সঙ্গে প্রেরণ

করার জন্য আবেদন করলো। রসুলেপাক স. হজরত আসেমকে একটি সারিয়ার সঙ্গে প্রেরণ করলেন। জীবনী গ্রন্থসমূহে ঘটনাটির আরও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এভাবে— মক্কা থেকে সাতজন লোক এসে হজরত আসেমের পিতা ছাবেত ইবনে আবুল আফলাহর বাড়িতে উঠলো। তাঁর পুত্র হজরত আসেমের সঙ্গে ভাব গড়ে তুললো। সকাল-সন্ধ্যায় তারা হজরত আসেমের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা বলতে লাগলো। বললো, এ কেমন কথা তুমি কেবল তোমার কওমের লোকদের সঙ্গেই থাকবে? অথচ আমাদের নবী তোমাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করতে মনস্থ করেছেন। অবশেষে রসুলেপাক স. দশজন সাহাবীকে মনোনীত করলেন। তাদেরকে ওই সাতজন লোকের সঙ্গে যেতে বললেন। ওই দশজনের মধ্যে ছিলেন হজরত আসেম ইবনে ছাবেত, হজরত খুবায়েব ইবনে আদী, হজরত মারছাদ, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে তারেক, হজরত খালেদ ইবনে আবু বকর এবং হজরত যায়েদ ইবনে দাছানা। বিশুদ্ধ মতানুসারে হজরত আসেমকে দলপতি বানানো হয়েছিলো। আবার অন্য এক মতানুসারে দলপতি নিযুক্ত করা হয়েছিলো হজরত মারছাদকে। নির্ধারিত দিনে ওই দশজন ধর্মপ্রচারক সাহাবী আদল ও কারা গোত্রের সাত মুনাফিকের সঙ্গে হাতিয়ার নিয়ে রওয়ানা দিলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা মক্কা ও গাসফানের মধ্যবর্তী বুধাহ্ নামক স্থানে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে সাতজন মুনাফিকের মধ্য হতে একজন পৃথক হয়ে সুফিয়ান ইবনে খালেদের সঙ্গে মিলিত হলো। তাদের কাছে সংবাদ পেয়ে সুফিয়ান ইবনে খালেদ দু'শ' লোকের এক বাহিনী নিয়ে ওই স্থানে এসে উপস্থিত হলো। অপর এক বর্ণনানুসারে একশ' তীরন্দাজ নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলো। দু'টি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে করা হয়েছে যে, সেখানে একশ' তীরন্দাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তীরন্দাজদের বাইরের লোকদেরকে গণ্য করা হয়নি। তাই একশ' জনের কথা অনুল্লেখিত থেকেছে। সকাল হলো। হজরত আসেম তাঁর সাথী-সঙ্গীগণকে নিয়ে রাজী নামক স্থানের কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে তাঁরা যাত্রাবিরতি করলেন। তাঁরা মদীনা থেকে খেজুর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানকার এক পাহাড়ে উঠে তাঁরা খেজুর দিয়ে আহার সেরে নিলেন। ইবনে সাআদের বর্ণনা এরকম— তাঁরা যখন অনুমান করতে পারলেন যে, তাঁদের সঙ্গে ধোকাবাজী করা হয়েছে, তখন তাঁরা ফাদফাদ নামক পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। প্রথম বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, সাতজন থেকে এক মুনাফিক অন্যত্র চলে গিয়েছিলো, তার এভাবে পৃথক হওয়ার কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন একথাও যে, ওই সাতজনের কেউই মুমিন নয়। সকলেই মুনাফিক। ওরা তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। বনী লেহইয়ান গোত্রের এক মহিলা সেখানে বকরী চরাচ্ছিলো। সে রাজী'র জলাশয়ের নিকট পৌঁছে সেখানে খেজুরের বীচি পড়ে থাকতে দেখে

বললো, আল্লাহ্‌র কসম! এগুলি তো ইয়াছরিবের খেজুর। মদীনার খেজুরের বীচি চিকন ও হালকা পাতলা হতো। সে-ই তখন এই সংবাদ কাফেরদের কাছে পৌঁছে দিলো। বললো, হে লোক সকল! তোমাদের কাংখিত দলটি জলাশয়ের কাছে রাত্রি যাপন করেছে। কাফেররা রাজী নামক স্থান থেকে পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। যে অভিশপ্তটি দল থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলো, সে সকলের আগে আগে চলতে লাগলো। খালেদ ইবনে আবু বকর হজরত আসেমকে বললেন, হে আবু সুলায়মান! তোমার মেহমানরা তো আমাদেরকে ধোকা দিয়েছে। হজরত আসেম তাঁর কথা সমর্থন করে অন্যান্য সাথী-সঙ্গীদেরকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দিলেন। বললেন, সাথীগণ! শাহাদতের মর্যাদাকে গনিমত মনে করো এবং দ্বীনের দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। কাফেররা যখন দেখলো, সাহাবীগণ যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়েছেন, তখন তারা বললো, খামাখা নিজেদেরকে ধ্বংস করে দিয়ো না। আমাদের সঙ্গে তোমরা পেরে উঠবে না। হজরত আসেম বললেন, আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না। আমরা তো সত্য ধর্মের সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। দ্বীনের পথে জীবন উৎসর্গ করাই আমাদের কাজ। কাফেররা বললো, হে আসেম! তাড়াহুড়া কোরো না। নিজেদেরকে হালাক করে দিয়ো না। আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। হজরত আসেম বললেন, হে আমার সাথীগণ! মুশরিকের দেওয়া নিরাপত্তা আমি চাই না। আমি কোনো কাফেরের হাতে হাত রাখবো না। আমরা তো আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকার করেছি, তাঁর কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোনো কাফের যেনো আমার শরীরের কোনো অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে। আমি শুনেছি তালহার স্ত্রী সালাফা নাকি মান্নত করেছে, সে আমার মস্তকের খুলিতে শরাব পান করবে। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের এহেন অবস্থার সংবাদ আমাদের নবীর কাছে পৌঁছে দাও। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। তাঁর সংবাদ রসুলুল্লাহ্ স. এর কাছে পৌঁছে দিলেন। রসুলেপাক স. সাহাবীগণের নিকট চরম বিপদের কথা জানিয়ে দিলেন। হজরত আসেম দোয়া করার পর তীর নিক্ষেপ শুরু করলেন। সব কটা তীর যখন শেষ হয়ে গেলো, তখন ধনুক দিয়ে তাদের মোকাবিলা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তাঁর ধনুকটিও ভেঙে গেলো। তারপর তিনি তলোয়ার দিয়ে তাদের মোকাবেলা করতে লাগলেন। দোয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমি প্রথম দিন থেকেই তোমার ধর্মের সাহায্য করেছি। শেষ দিন তুমি আমার শরীরকে কাফেরদের থেকে হেফাযত করো। কাফেরেরা বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ করতে লাগলো। হজরত আসেম শহীদ হয়ে গেলেন। 'হে আল্লাহ্! প্রথম দিন থেকেই আমি তোমার দ্বীনের সহায়তা করেছি, শেষ দিনে কাফেরদের হাত থেকে আমার শরীরকে হেফাযত করো' হজরত আসেমের এই প্রার্থনায় তাঁর আমলের বিনিময় চাওয়া হয়নি। বরং এ ছিলো তাঁর মনের আবেগময় আকাঙ্খা। কেননা

আল্লাহ্‌তায়ালা যখন অনুগ্রহ করে তাঁকে যে প্রথম দিন থেকে দ্বীনের সাহায্যে আত্মনিয়োগ করতে দিয়েছেন, কাজেই শেষ মুহূর্তে তিনি যেনো কাফেরদের থেকে তাঁর দেহখানা রক্ষা করেন। হাকীকতপন্থীদের তরীকাই এরকম যে, নৈকট্যের স্তরে তাঁরা কখনও কোনো বিনিময় তলব করেন না। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে তা এমনই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অঙ্গীকারের সত্যতার উপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্‌তায়ালাও তাই বলেছেন, 'ইন তানসুরুল্লাহা ইয়ানসুর্‌কুম' (যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন (৪৭ঃ৭)। আর আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আসেমকে এভাবেই সাহায্য করেছেন। দুর্ভাগাদের দল যখন হজরত আসেমের মস্তক কর্তন করে সালাফার নিকট নিয়ে যেতে চাইলো তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ভিমরুলের একটি ঝাঁক পাঠিয়ে দিলেন। তারা হজরত আসেমের শরীরকে ঘিরে ফেললো। তাদের কেউ যখন অগ্রসর হতে চাইলো, তখনই ভিমরুলের দল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে দংশন করে পর্যুদস্ত করে ছাড়লো। হজরত আসেমের মরদেহের কাছেই আসতে দিলো না। এভাবে দিবাবসান হলো। রাতে আল্লাহ্‌তায়ালা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ফলে প্লাবন দেখা দিলো। প্লাবনের প্রবল স্রোত তাঁর পবিত্র লাশ সেখান থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। শত্রুরা তাঁর লাশ স্পর্শই করতে পারলো না।

বর্ণিত হয়েছে, সুফিয়ান ইবনে খালেদ এবং তার সঙ্গীরা যখন সালাফা বিনতে সাআদের কাছে গেলো এবং তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ একশ' উট দাবী করলো, তখন সালাফা বললো, আমি তো শর্ত করেছিলাম, যে আমার সন্তানদের হত্যাকারীদের মধ্য থেকে কাউকে সশরীরে এনে দিতে পারবে, অথবা কেটে আনতে পারবে তার মস্তক, আমি তাকে পুরস্কৃত করবো। তোমরা তো কোনোটিই করতে পারোনি। আমি কেনো তোমাদেরকে উট দিবো? বলাবাহুল্য, তারা বঞ্চিত ও মর্মাহত হয়ে সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করলো।

এই সারিয়ার দু'জন সাহাবী কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। হজরত খুবায়েব ইবনে আদী, হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে তারেক এবং হজরত যায়েদ ইবনে দাছানাকে তারা নিরাপত্তা দানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাহাড়ের নিচে নামিয়ে আনলো। কিন্তু পাহাড় থেকে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো। তিন জনের হাত থেকে তীর ধনুক কেড়ে নিলো। তাঁদের ধনুক থেকে ফিতা খুলে নিয়ে তা দিয়েই তাঁদের হাত বেঁধে ফেললো। হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে তারেক তাদের অসৎ উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরে কোনোক্রমে হাতের বাঁধন খুলে ফেললেন এবং তরবারী উন্মুক্ত করে তাদের উপর হামলা করলেন। কাফেরেরা তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। এভাবে উপর্যুপরি পাথর নিক্ষেপ করে করে তাঁকে শহীদ করে দিলো। আর বিক্রয় করার জন্য হজরত খুবায়েব ও হজরত যায়েদ ইবনে দাছানাকে মক্কায় নিয়ে গেলো

তারা। হজরত খুবায়েবকে হারেছ ইবনে আমের ইবনে নওফলের বদলায় ক্রয় করা হলো। কারণ হজরত খুবায়েব বদর যুদ্ধে হারেছকে হত্যা করেছিলেন। হজরত যায়েদকে পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলো সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। জিলকদ মাসে তাদেরকে মক্কায় আনা হয়। তারপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হওয়ার অপেক্ষায় তাদের উভয়কে বন্দী করে রাখা হয়।

সহীহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, বন্দী হজরত খুবায়েবের কাছে আঙ্গুরের থোকা দেখা যেতো। অথচ সে সময় মক্কার কোথাও কোনোপ্রকার ফলই পাওয়া যেতো না। সুতরাং ওই আঙ্গুরগুচ্ছ ছিলো আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহমণ্ডিত রিযিক। নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁকে তানঈম নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। তানঈম হচ্ছে মক্কার কাছাকাছি হেরেমের বাইরে অবস্থিত একটি স্থান। কাফেরেরা হজরত খুবায়েব ও হজরত যায়েদকে শূলীতে চড়ানোর জন্য সেখানে নিয়ে গেলো। হজরত খুবায়েব কুরায়েশদের কাছে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করার অবকাশ চাইলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর এহেন অন্তিম বাসনা পূর্ণ করায় তাদেরকে সুমতি দান করলেন এ জন্য যে, এটি যেনো শহীদগণের জন্য একটি সুন্নত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। হজরত খুবায়েব বলেছেন, লোকেরা যদি এরূপ মনে না করতো যে, আমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি, তাহলে নামাজ আরও দীর্ঘায়িত করতাম। নামাজ শেষে তিনি কবিতার কয়েকটি চরণ পাঠ করলেন, যার অর্থ এরকম— আমি মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করছি। তাই মৃত্যুভয় আমার নেই। আমার প্রতিটি অঙ্গকে ছেদন করে করে আমার মৃত্যু ঘটানো হলেও। আমার মৃত্যু তো আল্লাহ্তায়ালার পরিতোষার্থেই। আল্লাহ্তায়ালা চাইলে আমার দেহের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহে বরকত নাযিল করতে পারেন। তারপর তিনি কাফেরদের উপর লানত করলেন এবং প্রার্থনা জানালেন, হে আল্লাহ্! এদের কাউকে তুমি ছেড়ে দিয়ো না। এদেরকে পৃথক পৃথকভাবে ধ্বংস করে দিয়ো। কাউকেই রেহাই দিয়ো না। জীবনীলেখকগণ বলেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। সেখানে যারা উপস্থিত ছিলো, তাদের অধিকাংশকে অল্পদিনের মধ্যেই আসমানী বালা নাযিল করে হালাক করে দিয়েছেন। হজরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান বলেছেন, আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম। আমার পিতা তখন খুবায়েবের প্রার্থনায় ভয় পেয়ে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলেন, যাতে আমার উপর তাঁর বদ দোয়ার আছর না পড়ে।

হজরত খুবায়েবকে মদীনামুখী করে শূলীতে চড়ানো হলো। কাবা শরীফ রইলো পশ্চাতে। তিনি কলেমা পাঠ করলেন এবং বললেন, 'ফা আইনামা তুওয়াল্লূ ফাছাম্মা ওয়াজ্‌হুল্লাহি' (আমার চেহারা তোমরা যেদিকেই ফিরাও না কেনো সেদিকেই আল্লাহ্ আছেন)। তারপর বললেন, মদীনা কাবারও হাকীকী কেবলা। কেননা রসুলুল্লাহ্ স. সেখানে রয়েছেন। পৌত্তলিকরা বললো, তুমি

ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে এসো, আমরা তোমাকে মুক্তি দিবো। তিনি বললেন, রব্বুল ইজ্জতের কসম! তোমরা যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীটাও দিয়ে দাও, তবু আমি সত্য ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবো না। একটি জীবন কেনো? একশ' জীবনও তো তার জন্য কোরবান করা যেতে পারে। তারা বললো, এ মুহূর্তে তোমার মনের বাসনা তো এরকম— তোমার জায়গায় মোহাম্মদ যদি থাকতো, আর তুমি যদি নিরাপদে আপনগৃহে অবস্থান করতে পারতে। তাই না? হজরত খুবায়েব বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো এরকমও পছন্দ করি না যে, আল্লাহ্‌র রসুলের পায়ে কাঁটা ফুটুক, আর আমি ঘরে বসে থাকি। পৌত্তলিকেরা এভাবে তাঁকে বিভিন্ন কথা বলে, নানা ধরনের ভয়-ভীতি দেখিয়ে, লোভ-লালসা প্রদর্শন করে উত্যক্ত করলো। কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শে রইলেন পর্বতের মতো অটল। অবশেষে তাঁকে কতল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। হজরত খুবায়েব বললেন, হে আল্লাহ্! এখানে আমি শত্রু ব্যতীত আর কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। এখানে আমার এমন কোনো বন্ধু নেই, যে আমার সংবাদ তোমার হাবীবের দরবারে পৌঁছে দিবে। হে আল্লাহ্! তুমি আমার সালাম তোমার রসুলের দরবারে পৌঁছে দিয়ো।

হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত বর্ণনা করেছেন, আমি আরো কয়েকজনের সঙ্গে রসুলেপাক স. এর মজলিশে বসেছিলাম। সহসা ওহী নাযিলের আলামত প্রকাশ পেলো। তিনি স. বললেন, ওয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তারপর বললেন, খুবায়েবকে কুরায়েশরা শহীদ করে দিয়েছে। জিবরাইল আমীন এই মাত্র তার সালাম আমার কাছে পৌঁছে দিলো। কুরায়েশরা বদরের যুদ্ধে যাদের নিকটজন নিহত হয়েছিলো তাদেরকে একত্রিত করলো। তাদের মধ্য থেকে চল্লিশ ব্যক্তি বর্শা তাক করে সামনে এগিয়ে গেলো। উপর্যুপরি বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগলো তারা। আঘাতে আঘাতে আন্দোলিত হতে লাগলো তাঁর শরীর। এভাবে এক সময় তাঁর পবিত্র চেহারা আপনা আপনি ঘুরে গেলো কাবা শরীফের দিকে। তিনি বললেন, প্রশংসা ওই পবিত্র সত্তার, যিনি আমার চেহারাকে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সন্তুষ্ট আছেন আমার প্রতি, আমার নবীর প্রতি এবং সমস্ত মুসলমানের প্রতি। যদিও তাঁর অন্তর কাবায়ে হাকীকীর দিকে ছিলো, তবুও তিনি চেয়েছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালা যেনো তাঁর যাহের, বাতেন, সুরত, রুহানী, হাকীকত ও শরীয়তকে একত্রে জমা করে দেন। হঠাৎ এক পৌত্তলিক তাঁর পবিত্র বক্ষে তীর ছুঁড়ে মারলো। তীরটি পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে গেলো। পবিত্র মুখ থেকে বারংবার উচ্চারিত হতে লাগলো কলেমা তাওহীদ। কলেমা তাইয়্যেবা পড়তে পড়তে অল্পক্ষণের মধ্যে ইহজগত ছেড়ে যাত্রা করলেন অনন্তধামের দিকে। এরপর হজরত যায়েদ ইবনে দাছানাকে আনা হলো। তিনিও হজরত খুবায়েবের মতো দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিলেন। পৌত্তলিকরা তাঁকেও হজরত খুবায়েবের

মতো বিভিন্নভাবে অযথার্থ কথা বলে উত্যক্ত করলো। তাঁকেও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে শহীদ করে দিলো। তিনিও এ জগতের মায়া ত্যাগ করে পরজগতের দিকে পাড়ি জমালেন। জীবনীলেখকগণ বলেছেন, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার ক্রীতদাস নাসতাম তাঁকে শহীদ করেছিলো। বর্ণিত হয়েছে, হজরত খুবায়েব ও হজরত যায়েদ শহীদ হওয়ার পর আবু সুফিয়ান বললো, আমরা মোহাম্মদের এরকম কোনো সহচরকে দেখিনি, যে রকম দেখলাম খুবায়েব ও যায়েদকে। মোহাম্মদের জন্য কীভাবে তারা জীবন বিসর্জন দিলো! অদ্ভুত! অভূতপূর্ব। হজরত খুবায়েবকে হজরত যায়েদের চেয়ে অধিক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিলো। তাই তিনি হজরত যায়েদের চেয়ে অধিক মর্যাদাধারী। তারা তাঁকে কয়েকদিন পর্যন্ত শূলীতে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিলো, যেনো তাঁর এভাবে মৃত্যুর সংবাদ সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। রসুলুল্লাহ স. তাঁর সংবাদ পেয়েছিলেন ওহীর মাধ্যমে। সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে খুবায়েবকে শূলী থেকে নামিয়ে আনতে পারো? বিনিময়ে লাভ করতে পারো জান্নাতের অধিকার? প্রস্তুত হলেন হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এবং হজরত মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ। মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন তাঁরা। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতেন। আর রাত্রিবেলা পথ চলতেন। কয়েকদিন পর তাঁরা তানঈম পৌঁছলেন। দেখলেন, হজরত খুবায়েবকে শূলীতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। রাতের অপেক্ষায় রইলেন তাঁরা। শূলীর চতুর্স্পার্শ্বে পাহারায় নিয়োজিত ছিলো চল্লিশজন পৌত্তলিক। সকলেই যখন ঘুমিয়ে পড়লো, তখন তারা হজরত খুবায়েবের মরদেহ সহজেই শূলী থেকে নামিয়ে নিতে সক্ষম হলেন। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁর লাশ ছিলো তাজা। তখনও ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। আর সে রক্ত থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মেশকের মতো সৌরভ। হজরত যুবায়েরের ঘোড়ার উপর হজরত খুবায়েবের পবিত্র মরদেহ উঠিয়ে দু'বন্ধু রওয়ানা দিলেন। অভিযান সফল হলো। কুরায়েশরা দেখলো লাশ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সত্তুর জন অশ্বারোহী তাঁদের পিছনে ধাওয়া করলো। এরা যখন তাঁদের খুব কাছাকাছি এসে গেলো, তখন হজরত যুবায়ের হজরত খুবায়েবের লাশ ঘোড়ার পীঠ থেকে নামিয়ে মাটির উপর রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাটি দু'ভাগ হয়ে হজরত খুবায়েবের লাশ তার বুকের ভিতর লুফে নিলো। কুদরতীভাবে তাঁর দাফনকার্য সমাধা হয়ে গেলো। এ কারণে হজরত খুবায়েবকে 'বালীগুল আরদ' (মাটি যাকে গলাধঃকরণ করেছে) বলা হয়। হজরত যুবায়ের কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যুবায়ের ইবনুল আওয়াম। আমার মাতা হচ্ছেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সুফিয়া। আমার সঙ্গে রয়েছে আমার বন্ধু মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ। আমরা দুই সিংহ এখানে উপস্থিত। আমরা পথের কাঁটা দূর করতে চাই। তোমাদের ইচ্ছে হলে অগ্রসর হও। আর না হয় মক্কায় ফিরে যাও। কাফেররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মক্কায়

প্রত্যাবর্তন করলো। তাঁরা উভয়ে রসুলেপাক স. এর দরবারে যখন পৌঁছলেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন হজরত জিবরাইল। তিনি রসুলুল্লাহ্ স.কে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার এ দু'জন সাহাবীর ব্যাপারে ফেরেশতারা আসমানে গৌরব প্রকাশ করে চলেছে।

আবু সালামা মাখযুমীর অভিযান

হিজরতের পয়ত্রিশতম মাসের প্রারম্ভে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এটি আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ মাখযুমীর অভিযান নামে খ্যাত। মুহাজির ও আনসার মিলিয়ে দেড়শ সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিলেন এই অভিযানে। হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, হজরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের এবং হজরত আরকাম ইবনে আবু আরকাম প্রমুখ ছিলেন এই অভিযানের স্বনামধন্য অংশগ্রহণকারী। তাঁদেরকে বনী আসাদ গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হয়েছিলো। এ অভিযানের পটভূমি ছিলো এরকম— রসুলেপাক স. এর নিকট সংবাদ পৌঁছলো, খুওয়ায়লেদের পুত্র তালহা এবং সালামা তাদের সম্প্রদায়ের লোককে রসুলুল্লাহ্ স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করছে। সম্ভবতঃ তারা মদীনা ও তার আশপাশের এলাকায় লুণ্ঠন চালাবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তারা সৈন্য সমাবেশ করে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়েছিলো। কিন্তু পথিমধ্যে তারা অনুতপ্ত হয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে। রসুলেপাক স. হজরত আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদকে ডেকে বললেন, তাদের জানার আগেই তোমরা সৈন্য নিয়ে তাদের বাহিনীর অগ্রভাগে পৌঁছে যাও এবং তাদের এলাকাতেই তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিয়ে এসো। হজরত আবু সালামা তাঁর বাহিনী নিয়ে কুতন নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। সেখানে বনী আসাদ গোত্রের একটি জলাশয় ছিলো। কেউ কেউ বলেন, কুতন বনী আসাদ গোত্রের পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ের নাম। তাঁরা সেখানে পৌঁছে পণ্য ও পশু যা পেলেন, হস্তগত করে নিলেন এবং যে সকল লোককে সেখানে পাওয়া গেলো, তাদেরকে বন্দী করে ফেললেন। অন্যান্যরা পালিয়ে গেলো। শত্রুদের মধ্যে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যার আধিক্যের সংবাদ ছাড়িয়ে পড়লো। বনী আসাদ গোত্রের লোকেরা আপন আপন পাড়া মহল্লা থেকে পালিয়ে গেলো। হজরত আবু সালামা তাঁর বাহিনী নিয়ে কাফেরদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তাদের ফেলে যাওয়া সম্পদ গনিমত হিসেবে হস্তগত করে নিলেন। সম্মুখসমরের প্রয়োজন পড়লো না। মুসলিমবাহিনী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো। গনিমতের মাল পাঁচভাগে ভাগ করে বণ্টন করা হলো। প্রত্যেক যোদ্ধা পেলেন সাতটি করে উঁট এবং কিছুসংখ্যক ছাগল। তবে এক বর্ণনায় এসেছে, বনী আসাদ গোত্রের লোকেরা হজরত আবু

সালামার বাহিনীকে প্রতিরোধ করলে হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এক মুশরিককে হত্যা করলেন। তারপর তকবীরধ্বনি দিয়ে ঘোষণা করলেন, আক্রমণ চালাও। হজরত আবু সালামা ও অন্যান্য সৈন্য একযোগে হামলা চালালেন। কাফেরবাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো। মুসলিমবাহিনী গণিমতের মাল নিয়ে নিরাপদে মদীনায় ফিরে এলো। তবে দশদিন পর্যন্ত হজরত আবু সালামার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়সের অভিযান

এ অভিযান পরিচালিত হয় হিজরতের পয়ত্রিশতম মাসের প্রারম্ভে। তখন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়সকে প্রেরণ করা হয়েছিলো সুফিয়ান ইবনে খালেদ হুযালীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। সে উরবা নামক স্থানে অবস্থান করছিলো। সুফিয়ান ইবনে খালেদ হুযালীর অপকীর্তির কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাকে হত্যা করে তার অনিষ্ট থেকে দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করাই ছিলো এই অভিযানের উদ্দেশ্য। ওই দুর্বৃত্তটি হজরত খুবায়েবকে শহীদ করে শূলীতে ঝুলিয়ে রেখেছিলো, আর হজরত আসেম ইবনে ছাবেত ও তাঁর সাথী-সঙ্গীদের কাউকে কাউকে বিক্রি করার ফন্দি করেছিলো। সে এ ধরনের অন্যায়-অপরাধ করার পরও চাচ্ছিলো একটি বাহিনী প্রস্তুত করে রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এ সংবাদ পাওয়ার পর রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়সকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ সুফিয়ান ইবনে খালেদকে চিনতেন না। তাই বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমাকে খালেদ ইবনে সুফিয়ানকে চিনবার আলামত বলে দিন। রসুলেপাক স. আলামত বলে দিলেন। আরো বললেন, সে কিন্তু খুবই চতুর। সুতরাং সাবধানে থেকো। সামনাসামনি সে কিন্তু খুবই বিনয়াচরণ করবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়স রসুলেপাক স. এর কাছে অনুমতি চাইলেন, যেভাবেই সম্ভব আমি যেনো তাকে ধোকায় ফেলতে পারি। তিনি স. অনুমতি দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ তরবারী নিয়ে কয়েক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে বতনে উরবা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি এমন এক ব্যাক্তিকে দেখতে পেলেন, যার মধ্যে রসুলেপাক স. কর্তৃক বর্ণিত আলামতসমূহ পাওয়া গেলো। সে সমস্ত আলামত দেখে তিনি তাকে চিনে ফেললেন। স্বগোতোক্তি করলেন, সাদাকাল্লাহু ওয়া রসুলুহু (আল্লাহ ও তাঁর রসুল সত্য বলেছেন)। সুফিয়ান ইবনে খালেদ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়সকে দেখে বললো, তুমি কে? হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি খাযামা গোত্রের লোক। শুনলাম আপনি নাকি মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। আমিও আপনার সঙ্গী হতে চাই। সে খুশী হলো। হজরত আবদুল্লাহ্কে তার

তাঁবুতে নিয়ে গেলো। হজরত আবদুল্লাহ্ নির্বিঘ্নে তার মাথাটি কেটে নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি গুহায় আত্মগোপন করে রইলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে একটি মাকড়শা গুহার মুখে জাল বিস্তার করলো। শত্রুপক্ষের লোকেরা তাকে অনেক খোঁজাখুজি করেও পেলো না। তারা চলে গেলে তিনি গুহা থেকে বের হয়ে গন্তব্যের দিকে রওয়ানা দিলেন। দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। আর পথ চলতেন রাতের বেলা। এভাবে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছলেন। রসুলেপাক স.কে পেলেন মসজিদে। কর্তিত মস্তকটি তাঁর পবিত্র পায়ের কাছে রেখে দিলেন। রসুলেপাক স. এবং উপস্থিত সকল সাহাবী আনন্দ প্রকাশ করলেন।

বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. তখন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়সকে একটি লাঠি দান করে বলেছিলেন, এই লাঠি সহকারে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তুমি এতে ভর করে চলবে। বলাবাহুল্য, তাঁর জান্নাতগমনের শুভ সংবাদ প্রদানই ছিলো এর উদ্দেশ্য। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, ওই লাঠি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিলো। অন্তিম সময়ে তিনি ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, এই লাঠি যেনো কাফনের সঙ্গে তাঁর কবরে দিয়ে দেওয়া হয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়েসের এ অভিযানের সময়কাল ছিলো আঠারো দিন।

চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী

বীরে মাউনার অভিযান

হিজরী চতুর্থ সনে সফর মাসে উহুদ যুদ্ধের চারমাস পর বীরে মাউনার ঘটনা ঘটেছিলো। এ অভিযানটির আরও দু'টি নাম আছে— সারিয়া মুনযির ইবনে আমর এবং সারিয়াতুল কুরা। বীরে মাউনা হুযায়েল অঞ্চলের একটি জায়গার নাম। জায়গাটি মক্কা ও আসফানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য জীবনীবিশেষজ্ঞগণ। ঘটনাটি এরকম— আবু বারা আমের ইবনে মালেক ইবনে জাফর 'মালায়েবুল আসনা' (কল্যাণের খেলোয়াড়) উপাধিতে ভূষিত ছিলো। সে বেশী যুদ্ধ করেছিলো সেনান গোত্রের সঙ্গে। গোত্রটি নজদ ও বনী আমেরের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করতো। সে মদীনায় এলো এবং রসুলুল্লাহ্ স. এর মজলিশে বসলো। তিনি স. তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করলো না। তবে সাইয়্যেদে আলম স. এর প্রশংসা করলো। বললো, আমি জানি আপনার দ্বীন সম্মানিত এবং আপনি হানীফ দ্বীনেরই অনুসারী। আমার কওমের লোক বড়ই মন্দ প্রকৃতির।

আপনি যদি দয়া করে আপনার সাহাবীগণের একটি দল আমার সঙ্গে নজদ এবং বনী আমের জনপদে প্রেরণ করেন, তাহলে তারা হয়তো এ সুদৃঢ় ধর্ম কবুল করবে। তার বক্তব্যের ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে— আমার তো ইচ্ছে আছে এ সত্য ধর্ম গ্রহণ করার, তবে আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকেও আমাকে মান্য করতে হয়। সুতরাং তাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পথে আনার জন্য সেখানে একটি প্রচারক দল পাঠানো জরুরী। রসুলেপাক স. বললেন, নজদীদের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আমার আশংকা হচ্ছে, তারা হয়তো অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে। আবু আমের বললো, আপনি আশংকা করবেন না। প্রচারকদল আমার আশ্রয়েই থাকবে। আমি নিজে তাদের হেফাজত করবো।

রসুলেপাক স. দরিদ্র সাহাবীগণের একটি দলকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। দলের সদস্যসংখ্যা ছিলো সত্তুর, মতান্তরে চল্লিশ বা তিরিশ। তাঁরা দিনের বেলা রসুলেপাক স. এর সহধর্মিণীগণের জন্য লাকড়ি ও পানি সরবরাহ করতেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা দিনের বেলায় ব্যবসা করতেন এবং তার লভ্যাংশ থেকে আসহাবে সুফ্‌ফার সাহাবীগণের জন্য খাদ্য কিনে আনতেন। আবার অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা রসুলেপাক স. এর জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতেন। আর রাত্রি অতিবাহিত করতেন নামাজ, জিকির ও কোরআন পাঠ করে। তাঁদেরকে ক্বুররায়ে সাহাবা (সাহাবীগণের মধ্যে বড় ক্বারী) বলা হতো। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সাহাবী ছিলেন আনসারী। রসুলেপাক স. প্রচারকদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন হজরত মুনযির ইবনে আমরকে। নজদ ও বনী আমেরের কতিপয় গোত্রনেতার নামে কয়েকটি চিঠি দিয়ে তিনি স. তাঁকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

আবু বারা আমের ইবনে মালেকের এক ভাতিজা ছিলো আমের ইবনে তুফায়েল ইবনে মালেক। সে ছিলো ধর্মবিরোধী, অবাধ্য ও মুসলমানদের শত্রু। তবে আবু বারা আমের সে রকম ছিলো না। প্রচারক দলটি বীরে মাউনা নামক স্থানে উপনীত হলো। তাদের উঁটগুলো দেখা শোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হলো আমর ইবনে উমাইয়া জামরী এবং হারেছ ইবনে সাম্মাকে। আবু বারা আমের ইবনে মালেক তাঁদের সঙ্গে উঁট নিয়ে মাঠে গেলো। রসুলেপাক স. এর চিঠি তাঁদের এক সাথী হারাম ইবনে মালহানের কাছে দেওয়া হলো। তিনি ছিলেন হজরত আনাস ইবনে মালেকের ফুফু— উম্মে সুলায়মের ভাই। বোখারীর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, তাঁকেই বনী আমেরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো। তবে জীবনীপ্রণেতাগণের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, এই অভিযানের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিলো হজরত মুনযির ইবনে আমরকে। যা হোক, রসুলেপাক স. এর চিঠি হজরত হারাম ইবনে মালহানকে দেওয়া হলো এই নির্দেশ দিয়ে যে, তিনি যেনো তা আমের ইবনে তুফায়েলের নিকট পৌঁছে দেন। তাঁরা আরো দুইজনকে সঙ্গে

নিয়ে যাত্রা করলেন। যথাসময়ে কথিত জনপদে পৌঁছে গেলেন। হজরত হারাম ইবনে মালহান তাঁর সাথীদ্বয়কে বললেন, তোমরা এখানেই থাকো। আমি একাই গিয়ে চিঠিটি দিয়ে আসি। তারা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, তবে আমি তোমাদেরকে ডেকে নিবো। আর যদি তারা আমাকে হত্যা করে, তবে তোমরা আমাদের অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। হজরত হারাম ইবনে মালহান তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা আমাকে আমান দাও। আমি রসুলুল্লাহর চিঠি নিয়ে এসেছি। আমের ইবনে তুফায়েল তাদের একজনকে ইশারা করলো। তৎক্ষণাৎ সে পিছন দিক থেকে হজরত হারাম ইবনে মালহানের দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। তীর তাঁর দেহ ভেদ করে চলো গেলো। রক্ত ছুটলো শরীর থেকে। তিনি রক্ত সাফ করতে করতে বললেন, 'আল্লাহু আকবার ফুযতু বিরব্বিল কা'বাতি' (আল্লাহু আকবার! কাবার প্রভুর কসম! আমি সফল)। অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। রসুলুল্লাহ্র হুকুম পালন করতে পেরেছি এবং শাহাদতের মর্যাদাও লাভ করলাম।

আমের ইবনে তুফায়েল প্রচারকদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনী আমেরের লোকদের কাছে সাহায্য চাইলো। বনী আমের গোত্র যেহেতু জানতো যে, এসব মুসলমান আবু বারা আমের ইবনে মালেকের নিরাপত্তায় আছে, আর সে কারণে আবু বারা তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হবে। তাই তারা বললো, আবু বারার নিরাপত্তাব্যবস্থা ভঙ্গ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা সকলেই মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলো। আমের ইবনে তুফায়েল তখন সুলায়ম, আসিয়া, রাআল ও যাকওয়ানের লোকদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদের কাছে সাহায্য চাইলো। সাড়া দিলো সকলে। বিশাল বাহিনী প্রস্তুত হলো অল্পক্ষণের মধ্যে। পুরো বাহিনী যাত্রা করলো বীরে মাউনার দিকে। জনগণকে নিয়ে তারা মুসলমানদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো। মুসলমানগণ দেখলেন সমূহ বিপদ। তাঁরা আল্লাহ্পাকের দরবারে মোনাজাত করতে লাগলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! আমরা তো এমন কাউকে দেখছি না, যে আমাদের সালামটুকু রসুলুল্লাহ্র কাছে পৌঁছে দিবে। তুমিই আমাদের সালাম তোমার রসুলের দরবারে পৌঁছে দিয়ো। তৎক্ষণাৎ হজরত জিবরাইল এসে তাঁদের সালাম রসুল স. এর কাছে পৌঁছে দিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বীরে মাউনার শহীদগণের সংবাদ সাহাবাকেরামের কাছে পৌঁছে দিয়ে বললেন, তোমাদের সাথীরা বিপদগ্রস্ত এবং তারা প্রার্থনা করছে, হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদের সংবাদ আমাদের সাথীদের নিকট পৌঁছে দাও। আমরা তোমার সন্তুষ্টি কামনা করি। তুমি যাতে তুষ্ট, আমরাও তাতে পরিতুষ্ট। অপর এক বর্ণনায় আছে, তাঁদের সম্পর্কে তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো এই আয়াত— 'বাললিগূ আ'ন্না ক্বাওমিনা আনা ক্বাদ লাক্বীনা রব্বানা

ফারাদিয়া আ'না ওয়া আরদনা' (আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের কওমের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাথে মোলাকাত করেছি, তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি আমাদেরকে করেছেন পরিতুষ্ট)। এই আয়াত কোরআন মজীদে কিছুকাল পর্যন্ত তেলাওয়াত হিসেবে জারী ছিলো। পরে এই আয়াতের তেলাওয়াত মনসুখ(রহিত) হয়ে যায়। যাই হোক, মুসলমানগণ বীরে মাউনার প্রান্তরে বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাথে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষে সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। বেঁচে রইলেন কেবল হজরত মুনযির ইবনে আমর। কাফেররা বললো, তুমি চাইলে আমরা তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারি। তিনি তাদের নিরাপত্তা গ্রহণ করলেন না। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। হজরত আমর ইবনে ওমায়ের যুমায়রী এবং হজরত হারেছ ইবনে সাম্মা দূরে এক মাঠে উঁট চরাচ্ছিলেন। উঁটগুলোকে যখন আস্তাবলে রাখতে গেলেন, তখন দেখলেন এক ঝাঁক পাখি উড়ছে। আরও দেখতে পেলেন ধূলি উড়ছে। কাফের সেনারা উঁচু স্থানের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। তাঁরা আরও অগ্রসর হলেন। দেখতে পেলেন, সাথীরা সকলেই শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন কী করা যায়। হজরত আমর বললেন, আমাদের উচিত রসুলুল্লাহ্‌র নিকট ফিরে গিয়ে সমস্ত অবস্থার বর্ণনা উপস্থাপন করা। হজরত হারেছ বললেন, না। শাহাদতের এ সুযোগকে আমাদের মূল্যবান মনে করা উচিত। তাঁরা কাফেরদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দু'জনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে কাফেররা তাঁদের দু'জনকে ঘিরে ফেললো। হজরত হারেছের মস্তক থেকে রক্ত ঝরছিলো। তৎসত্ত্বেও তিনি পুনরায় আক্রমণ শুরু করে দিলেন এবং তাদের আরও দু'জনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। শেষে শহীদ হয়ে গেলেন। আমের ইবনে তুফায়েল হজরত আমরকে শহীদ করলো না। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত করে দিলো। তার মাকে মুক্ত করার জন্য একজন বন্দীর দরকার ছিলো। তাই সে হজরত আমরকে ছেড়ে দিলো এবং মদীনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দিলো। বললো, তুমি কি তোমার সকল সাথীর পরিচয় জানো! তিনি বললেন, হাঁ। আমের তাঁকে শহীদদের কাছে নিয়ে গেলো। সকলের পরিচয় জানতে চাইলো। তিনি একজন একজন করে সকলের নাম ও বংশপরিচয় জানিয়ে দিলেন। সে বললো, তোমার এমন কোনো সাথী কি আছে, যাকে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছো না? তিনি বললেন, আমের ইবনে ফুহায়রার লাশ দেখতে পাচ্ছি না। তিনি হচ্ছেন আবু বকর সিদ্দীকের আযাদকৃত গোলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এখানে তাকে দেখছি না। আমের ইবনে তুফায়েল বললো, সে কেমন লোক ছিলো? তিনি বললেন, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি, প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। আমের ইবনে

তুফায়েল বললো, তাকে যখন শহীদ করা হলো, তখন আমি দেখতে পেলাম কে যেনো তাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

হজরত আমের ইবনে ফুহায়রা প্রথমে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার মায়ের গোলাম ছিলেন। রসুলেপাক স. যখন দারে আরকামে অবস্থান করছিলেন, তার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বনী কেলাব গোত্রের এক ব্যক্তি কাফেরদের মধ্যে অবস্থান করছিলো। তার নাম ছিলো জাব্বার ইবনে সালমা। তার ভাষ্য এরকম— আমি আমের ইবনে ফুহায়রাকে তীর মারলাম। তীরটি তার বক্ষ ভেদ করে চলে গেলো। তখন আমি শুনতে পেলাম, সে বলছে, 'ফুযতু ওয়াল্লাহি' (আল্লাহ্র কসম, আমি কৃতকার্য হয়েছি)। তারপর আমি দেখতে পেলাম তাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম, তার 'ফুযতু ওয়াল্লাহি' কথাটির অর্থ কী? এ বিষয়ে জানার জন্য যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কালাবীর নিকট গেলাম। সে বললো, কথাটির অর্থ— 'ফুযতু ওয়াল্লাহি বিল জান্নাত' (আল্লাহ্র কসম আমি বেহেশতে পৌঁছার মাধ্যমে কৃতকার্য হয়েছি)। আমি বললাম, আমাকে ইসলামের দিকে ডাকুন। তারপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। সুবহানাল্লাহ্! সৌভাগ্যশালীদের অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। আল্লাহতায়ালা তাই বলেছেন— 'ইন্নামা তুংযিরু মানিত্তাবাআ'জ্ জিকরা ওয়া খাশিইয়ার্ রহমানা বিল গাইবি ফাবাশ্শিরহু বিমাগ্ফিরাতিওঁ ওয়া আজ্বরিন কারীম' (তুমি কেবল তাহাকেই সতর্ক করিতে পার যে উপদেশ মানিয়া চলে এবং না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে। অতএব তাহাকে তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও) (৩৬ঃ১১)।

বর্ণিত আছে, হজরত যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রে জাব্বার ইবনে সালমার ইসলাম গ্রহণ এবং আমের ইবনে ফুহায়রাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ ছিলো। রসুলেপাক স. তখন বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে ফেরেশতারা তার দেহ দাফন করেছে এবং তার আত্মাকে ইল্লীনের সর্বোচ্চ স্তরে রেখে দিয়েছে। সহীহ্ বোখারীতে আছে, আমের ইবনে তুফায়েল বলেছেন, আমের ইবনে ফুহায়রাকে কতল করার পর আমি তাকে আসমানের দিকে নিয়ে যেতে দেখেছি। তারপর আমি তার লাশের দিকে এবং যমীনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকি। অবশেষে দেখলাম, তার লাশ আসমানে রেখে দেওয়া হয়েছে। আল্লামা কাসতালানী ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পবিত্র মরদেহকে মাটি লুকিয়ে রেখেছিলো। মুশরিকরা তাই তাঁকে দেখতে পায়নি। জীবনীরচয়িতাগণ বলেছেন, আবু বারা তার ভাতিজার এহেন গাদ্দারী দেখে খুবই চিন্তিত হয়েছিলো। অবশেষে আত্মগ্লানিতে ভুগেভুগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলো। সে ইসলামের মর্যাদা এবং নবী স. এর পূর্ণতার

ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পরও ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি। আবু বারা ও আমের ইবনে তুফায়েলের অবস্থা পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমের ইবনে তুফায়েলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো শয়তান, আর বারা ছিলো দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, রবীয়া ইবনে আবু বারা আমের ইবনে তুফায়েলের পিছু ধাওয়া করেছিলো। তার কওমের লোকদের সহযোগিতায় সে তার ভাতিজার দিকে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাড়া করেছিলো। ইচ্ছা করেছিলো তাকে চিরতরে শেষ করে দিবে। কিন্তু তার আশা পুরণ হয়নি। পরে সে উটের তাউন (প্লেগ) রোগের মতো এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। শেষে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। রসুলেপাক স. তাকে এই বলে বদ্‌দোয়া করেছিলেন— 'আল্লাহুম্মা আকফিনী আমিরান' (হে আল্লাহ্! আমের থেকে তুমি আমাকে পৃথক করে দাও)। আমের ইবনে তুফায়েল রসুলেপাক স.কে বলেছিলো, আপনি তিনটি বিষয় থেকে যে কোনো একটি গ্রহণ করুন। সাহলের মালিক হয়ে থাকুন। সাহল মানে নরম জমি। একথার অর্থ— আপনি যে অবস্থানে আছেন সেখানেই থাকুন। অথবা আপনি আহলে হদর বনে যান। তার মানে হচ্ছে, আমাদের দেশ ছেড়ে আপনি যে কোনো শহর বা গ্রামে দেশান্তরিত হয়ে চলে যান। কিংবা আপনি আমাকে আপনার প্রতিনিধিত্ব দান করুন, যাতে করে আমি গাতফান গোত্রের একচ্ছত্র নেতা হতে পারি। রসুলেপাক স. তখন আল্লাহ্তায়ালার কাছে দোয়া করেছিলেন— 'আল্লাহুম্মা আকফিনী আমিরান' হে আল্লাহ! আমের থেকে তুমি আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।

কুনুতে নাযেলা

রসুলে পাক স. দরিদ্র সাহাবীগণের শহীদ হওয়ার সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। এক মাস পর্যন্ত, মতান্তরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ফজরের নামাজে কুনুতে নাযেলা পাঠ করলেন। রাআল, যাকওয়ান ও আসিয়া এবং অন্যান্য নজদী জনপদের জন্য অপপ্রার্থনা করলেন। মুসলিম শরীফে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর অপপ্রার্থনায় বনী লেহ্ইয়ান গোত্রেরও উল্লেখ ছিলো। কুনুতে নাযেলা পাঠ করার ঘটনা বীরে মাউনার বেলায় ছিলো না। বরং রাজীর যুদ্ধের বেলায় ছিলো। রসুলেপাক স. তাঁর বদদোয়ায় তাদেরকেও শামিল করেছিলেন। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেছেন, সমস্ত ঘটনার কথা রসুলেপাক স. এর নিকট একই সময়ে পৌঁছেছিলো। তাই তিনি একই সঙ্গে সকল জনপদের কথাই উল্লেখ করেছিলেন। বোখারীর হাদিসেও লেহ্ইয়ান গোত্রের উল্লেখ আছে।

বনী নাযীরের যুদ্ধ

এ বৎসরই রসুলেপাক স. তাঁর প্রধান প্রধান সাহাবী যেমন মুহাজিরদের মধ্যে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত তালহা, হজরত যুবায়ের এবং আনসারদের মধ্যে হজরত সাআদ ইবনে মুআয, হজরত উসায়দ ইবনে হুযায়ের ও হজরত সাআদ ইবনে উবাদা প্রমুখ সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদীদের কবীলা বনী নাযীরদের বস্তির দিকে যাত্রা করলেন। জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, বনী নাযীরের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো চতুর্থ হিজরীতে বীরে মাউনার ঘটনার পর। ইবনে ইসহাকও এরকম বর্ণনা করেছেন। সুহায়লী বলেছেন, বনী নাযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো বদর যুদ্ধের ছ' মাস পর এবং উহুদ যুদ্ধের পূর্বে। বোখারী তাঁর গ্রন্থে এ যুদ্ধের বর্ণনা এনেছেন বদরের বর্ণনার শেষ অনুচ্ছেদে এবং কাআব ইবনে আশরাফ, হেজাজের ব্যবসায়ী আবু রাফের হত্যার ঘটনা এবং উহুদ যুদ্ধের বর্ণনার পূর্বে। তবে ইবনে ইসহাকের কথাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

যখন রসুলুল্লাহ্ স. সাহাবাকেরামকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদীদের বস্তিতে পৌঁছলেন তখন ইহুদীরা বললো, হে আবুল কাসেম! একটু বিলম্বে আসুন, যাতে করে আমরা আপনার ও আপনার সাহাবীগণের মেহমানদারী করতে পারি। ইহুদীরা তাঁকে পূর্ব থেকেই 'আবুল কাসেম' উপনাম দ্বারা সম্বোধন করতো। ইহুদীদের কিতাব যাবুর ও অন্যান্য সহীফাতে রসুলেপাক স. এর নাম যে মোহাম্মদ এসেছে, সে নামের সাথে তিনি যেনো সম্পৃক্ত হতে না পারেন, সে কারণেই তারা তাঁকে আবুল কাসেম বলে ডাকতো। ইহুদীদের উপরোক্ত কথা শোনার পর তিনি স. তাদের এক ঘরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চরম শত্রু ইয়াহ্ইয়া ইবনে আখতাব অন্যান্য ইহুদীদেরকে বলতে লাগলো, হে ইহুদী সম্প্রদায়! এমন সুযোগ আর কখনও আসবে না। তাকে এরকম একা আর কখনও পাওয়া যাবে না। এক্ষুণি ঘরের ছাদে উঠে একটি বড় পাথর নিয়ে তার মাথায় নিক্ষেপ করো। দেখবে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটবে। আমরা তার জ্বালাতন থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পাবো। আমর ইবনে জুহাশ বললো, আমি এ দায়িত্ব পালন করবো। সালাম ইবনে আশকাম এবং আরও কিছু লোক তাকে এহেন কুচিন্তা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিলো। বললো, সাবধান! এরকম করতে চাইলে তাঁকে এখনই আসমান থেকে তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ার হয়ে যাবেন। রসুলেপাক স. সাহাবাকেরামকে কিছু একটা বলেই যেনো কোনো বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে এরকম ভাব দেখিয়ে সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং মদীনার দিকে চললেন। এদিকে মদীনার সাহাবীগণ তাঁর ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর কাঁছে

পৌঁছতেই তিনি স. সাহাবীগণকে বনী নাযীরদের কুমতলব সম্পর্কে জানালেন। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানুজ্‌কুরূ নি'মাতাল্লাহি আ'লাইকুম ইজ হাম্মা ক্বাওমুন আইঁ ইয়াব্‌সুত্বূ ইলাইকুম আইদিয়াহুম ফাকাফ্‌ফা আইদিয়াহুম আ'নকুম' (হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের হাত তোমাদিগ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন) (৫ঃ১১)।

ইহুদীরা যখন রসুলেপাক স. এর প্রত্যাগমন সম্পর্কে জানতে পারলো, তখন তাদের এক আহবার ও আলেম কেনানা বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি জানি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের এহেন গাদ্দারীর সংবাদ মোহাম্মদকে জানিয়ে দিয়েছেন। হে লোকসকল! তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনায় পতিত হয়ো না। অবশ্যই তিনি আল্লাহ্‌র রসুল এবং সর্বশেষ নবী। তোমরা আশা করছিলে, সর্বশেষ নবী হবেন হারুনের বংশধর। কিন্তু তা হয়নি। আল্লাহ্‌তায়ালা এ নেয়ামত যাকে ইচ্ছা তাকেই প্রদান করেন। আমি তওরাত কিতাবে সর্বশেষ নবীর যতগুলো বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী পেয়েছি তার সবগুলিই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। আমার তো মনে হচ্ছে তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে তিনি তোমাদেরকে দেশান্তরিত করে দিবেন। এখন দু'টি কাজ থেকে যে কোনো একটি করা তোমাদের জন্য সমীচীন হবে। তবে সবচেয়ে উত্তম কাজটি হবে মোহাম্মদের উপর ইমান আনা। এর মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। যদি এরকম না করো, তবে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও। তাহলে তোমাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে। ইহুদীরা বললো, আমরা দেশান্তরিত হওয়াকেই কবুল করে নিবো, তবু মুসার ধর্ম পরিত্যাগ করবো না।

রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বনী নাযীরের লোকেরা অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো। সে অঙ্গীকার তারা ভঙ্গ করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের যখন বিজয় হলো, তখন তারা বললো, ইনি ওই নবী যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তওরাত কিতাবে। কিন্তু উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের যখন সাময়িক পরাজয় হলো, তখন তারা পূর্বের সন্দেহের সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। তারা গোপনে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলো। তার মিত্র হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে বনী নাযীর গোত্রে প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানে গিয়ে ঘোষণা দিলেন, তোমরা অতিসত্ত্বর মদীনা ছেড়ে চলে যাও। কারণ, তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো। তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হলো। এরপর তোমাদের কাউকে মদীনায় পাওয়া গেলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। তারা দেশান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। ক্রয় করলো অনেক উট। কিছু কিছু উট ভাড়াও করলো। মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল বনী নাযীরের লোকদেরকে বলতে লাগলো, যেয়ো না। স্বগৃহেই অবস্থান করো।

চিন্তা কোরো না। আমি দু'হাজার যোদ্ধা নিয়ে তোমাদের সহায়তা করবো। তাছাড়া বনী কুরায়যার লোকেরাও তাদের মিত্র বনী গাতফান গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে তোমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। বনী নাযীর গোত্রের ইহুদীরা মুনাফিকদের মিথ্যা আশ্বাসের প্রবঞ্চনায় পড়লো। তারা রসুলেপাক স. এর কাছে দূত পাঠিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলো, আমরা কোথাও যাবো না। আপন আপন ঘর বাড়িতেই থাকবো। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। রসুলেপাক স. উচ্চস্বরে তকবীর উচ্চারণ করলেন। সাহাবাকেরামও সজোরে তকবীর বললেন। তাঁর নির্দেশে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগলো। রসুলুল্লাহ স. মদীনার প্রতিনিধি নির্ধারণ করলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে কুলছুমকে। পতাকা বহনের দায়িত্ব দিলেন হজরত আলী মুর্তযাকে। তারপর রণসাজে সজ্জিত হয়ে মদীনার বাইরে চলে গেলেন। বনী নাযীরের বস্তির ময়দানে আসরের নামাজ আদায় করলেন। এ বস্তিটি ছিলো মদীনা শরীফের নিকটবর্তী। ইহুদীরা মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী দেখে দুর্গের ভিতরে আশ্রয় নিলো। দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়ে ভিতর থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। এশার ওয়াক্ত পর্যন্ত এরকমই চললো। এশার নামাজ আদায় শেষে রসুলেপাক স. কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে এক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সমস্ত সৈন্যবাহিনীর তদারকীর দায়িত্ব দিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক অথবা হজরত আলীকে। সকাল পর্যন্ত মুসলিমবাহিনী ইহুদীদেরকে ঘেরাও করে রাখলো।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর তাঁবুটি বনী হাতমা ময়দানে স্থাপন করা হলো। ইহুদী তীরন্দাজদের মধ্যে গরুরা নামের এক লোক ছিলো। তার নিক্ষিপ্ত একটি তীর রসুলেপাক স. এর তাঁবুর কাছাকাছি এসে পড়লো। তাঁবুটি সেস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র স্থাপন করা হলো। হজরত আলী ওঁৎ পেতে ছিলেন। দেখতে পেলেন, গরুরা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে খোলা তরবারীসহ বেরিয়ে আসছে। হজরত আলী সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রসুলেপাক স. এর সামনে এনে হাজির করলেন। রসুলেপাক স. হজরত সুহায়েল ও হজরত আবু দাজানাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলেন অবশিষ্ট লোকদের প্রতিহত করতে। ইহুদীদেরকে পনেরো দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলেন তিনি স.। মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল বা অন্যান্য কোনো সম্প্রদায় বনী নাযীরের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো না। রসুলেপাক স. আবু বালওয়া মাযেনী এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামকে হুকুম দিলেন ইহুদীদের খেজুর বাগানের গাছগুলো কেটে ফেলার জন্য। অপর এক বর্ণনায় আছে, তখন খেজুর বাগানসমূহ জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি স.। হুকুম পেয়ে হজরত আবু বালওয়া ইহুদীদের আজওয়া জাতের খেজুর গাছগুলো কাটতে লাগলেন। তিনি বলেছেন, আজওয়া জাতের

খেজুর গাছ কর্তন করাটা ছিলো ইহুদীদের কাছে চরম অসহ্যকর। কারণ, আজওয়া ছিলো মদীনার সবচেয়ে উন্নতমানের খেজুর। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম নিম্নমানের জাতের খেজুর গাছগুলো কাটতে লাগলেন। ভাবলেন, অচিরেই ইহুদীদের সমগ্র ভূখণ্ড মুসলমানদের হস্তগত হবে। উত্তম জাতের গাছগুলো তো তখন মুসলমানদেরই হবে। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এসেছে, রসুলেপাক স. ইহুদীদের আজওয়া বৃক্ষ ব্যতীত অন্য সকল বৃক্ষ কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাহাবীগণও তাই করেছিলেন। শেষোক্ত বর্ণনাটি পূর্বোক্ত বর্ণনার বিপরীত। এর সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে যে, তিনি স. প্রথমে সাধারণভাবে বৃক্ষ কর্তন করা বা জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। পরে আজওয়া বৃক্ষ কর্তনের হুকুম দেন। জীবনীলেখকগণ বলেছেন, তখন বনী নাযীরের ইহুদীরা মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা মুসলমান হয়ে একি করছো। তোমরা তো বৃক্ষ কর্তন করতে পারো না। মোহাম্মদ তো ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে মানুষকে বারণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ কেউ বললেন, আমরা নির্দেশ পালন করবোই। আবার কেউ কেউ বললেন, আমাদের তো বিরত থাকাই সমীচীন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন— 'অমা ক্বাত্বা'তুম মিল লীনাতিওঁ আও তারাক্তুমূহা ক্বাইমাতান আ'লা উসূলিহা ফাবিইজ্নিল্লাহি ওয়ালি ইউখ্যিয়াল ফাসিক্বীন' (তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলো কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ, তাহা তো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে; এবং এই জন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন) (৫৯:৫)।

'মাওয়াহেব' রচয়িতা সুহায়লী থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন কোনো কোনো মুসলমানের মনে দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই আল্লাহ্তায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেছিলেন। সুহায়লী বলেন, লীনা এক প্রকারের খেজুর, যা আজওয়া ও বরনী খেজুরের চেয়ে নিম্নমানের। আয়াতে ওই প্রকারের খেজুর গাছ কাটার কথা বলা হয়েছে। রসুলেপাক স. সব খেজুর গাছ কর্তন করার নির্দেশ দেননি। শুধু লীনা, যা ইহুদীদের আহার্য ছিলো, তাই কর্তন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই বলা হয়েছে 'মা ক্বাত্বা'তুম মিল লীনাতিন', 'মিন নাখলাতিন' বলা হয়নি, যা সাধারণভাবে সকল খেজুরকে বুঝায়। সাধারণভাবে গাছ কর্তন করা মাকরুহ। কেননা এর মাধ্যমে বৃক্ষজাতই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 'কাশ্শাফ' রচয়িতা এর তাফসীর করেছেন বৃক্ষগুলোকে কেটে নিচু করে দাও। বায়যাবীও এরকম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আয়াতটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফেরদের ঘর-বাড়ি এবং বস্তি বিরাণ করে দিয়ে এবং তাদের গাছপালা কেটে ছেঁটে তাদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করা। 'সাররাহ' গ্রন্থে আছে, লীনা হচ্ছে খেজুরের একটি

প্রজাতি। অভিধান গ্রন্থে আছে লীনা 'লাউনুন' থেকে উদ্ভূত। খেজুর পরিপক্ক হওয়ার রঙ আসার পূর্বেকার খেজুরকে লীনা বলা হয়। বোখারী ও মুসলিম পুস্তকে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বনী নাযীরদের খেজুরের বাগান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ উক্ত ঘটনার মাধ্যমেই নাযীর গোত্রের লোকদের অন্তরে আল্লাহ্তায়ালা ভয়-ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। তারা রসুলেপাক স. এর নিকট প্রস্তাব করেছিলো, আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দিন। আমরা আপনার শহর ছেড়ে চলে যাবো। চলে যাবো অনেক দুরের কোনো শহরে। রসুলেপাক স. বললেন, এ আবেদনের এখন কোনোই গুরুত্ব নেই। বাঁচতে যদি চাও, তবে সকল অস্ত্রশস্ত্র রেখে, যা হাতের কাছে আছে তাই নিয়ে এই মুহূর্তে দেশত্যাগ করো। তারা সম্মত হলো। এ ব্যাপারে এক আয়াতে এসেছে— 'হুয়াল লাজী আখ্রাজাল্ লাজীনা কাফারূ মিন আহ্লিল্ কিতাবি মিন দিইয়ারিহিম লিআও্ওয়ালিল্ হাশরি মা যানানতুম আইঁ ইয়াখরুজু ওয়া যান্নূ আন্নাহুম মানিআ'তুহুম হুসূনুহুম মিনাল্লাহি ফাআতাহুমুল্লাহু মিন হাইছু লাম ইয়াহ্তাসিবূ ওয়া ক্বাজাফা ফী কুলূবিহিমুর রু'বা ইউখরিবূনা বুয়ূতাহুম বিআইদীহিম ওয়া আইদিল মু'মিনীনা ফা'তাবিরূ ইয়া উলিল আব্সার' (তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাহাদের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্গগুলো উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ্ হইতে; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদের ধারণাতীত এবং উহাদের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর) (৫৯ঃ২)।

বনী নাযীরের ইহুদীরা দু'শ' উট বোঝাই মালমাত্তা নিয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেলো। কেউ চলে গেলো শাম দেশে। কেউ খায়বরের দিকে, আবার কেউ কেউ অন্যান্য স্থানে। বলাবাহুল্য, তারা নিজেদের অপস্বভাব এবং অপকর্মের কারণেই লাঞ্ছিত হলো। মুসলমানেরা তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেলেন। যেমন বলা হয়ে থাকে— 'ইন্নাল মাদীনাতা তানফী কামা ইয়ান ফীল কাওয়ারু খাবাছাল হাদীদ' (মদীনা অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেয়, যেমন রেত লোহার ময়লা দূর করে)। জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, বনী নাযীরের ইহুদীরা বের হওয়ার সময় সাজ-সজ্জা করে গান-বাজনা করতে করতে মদীনা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো।

যুদ্ধ-জেহাদ শরীয়তসম্মত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেরদের ক্ষতি ও ফাসাদ থেকে ইসলামী ভূখণ্ডকে পাক-পবিত্র রাখা। দৃষ্টান্তটি বৃক্ষের অতিরিক্ত ডাল-পালার মতো। যে ডাল-পালায় ফল হয় না, বরং যা গাছের জন্য বাড়তি ঝামেলা, তাকে

কেটে ছেঁটে দিলে গাছের কল্যাণই হয়। কেউ যদি প্রশ্ন করে, উদ্দেশ্য যদি তাই হয়, তবে ইহুদীদেরকে কতল করা হলো না কেনো? তাহলে তো ক্ষতি ও ফাসাদের মূল উৎপাটিত হয়ে যেতো। দেশান্তরিত করা সত্ত্বেও তো অকল্যাণের মূল রয়েই গেলো। এর উত্তরে বলা যায়, তারা ছিলো শঠ ও অঙ্গীকারভঙ্গকারী। তাই শাস্তিস্বরূপ দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। আর যারা যুদ্ধ করার মতো ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদেরকে তো হত্যাই করা হয়েছে। যুদ্ধ ছাড়া যুদ্ধের নির্দেশদান ইসলামসম্মত নয়। দেশান্তরিত করাই ছিলো আল্লাহ্‌র হুকুম। তাই এব্যাপারে উচ্চবাচ্য করা ঠিক নয়। যুদ্ধ করার হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে আলোচনাটি এসেছে। যুদ্ধ অথবা দেশান্তরণ— দু'টো নির্দেশই তো আল্লাহ্‌র।

ওদের রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ 'ফায়' এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ফায় ওই সম্পদ, যা জেহাদ ছাড়াই মুসলমানদের হস্তগত হয়। আর গণিমত বলা হয় ওই সম্পত্তিকে, যা পাওয়া যায় যুদ্ধ করে। ফায় এর সমস্ত মাল রসুলেপাক স. এর জন্য নির্ধারিত। এ ক্ষেত্রে খুমুস বা পঞ্চমাংশে ভাগ করার কোনো অবকাশ নেই। রসুলেপাক স. ফায় এর মাল খরচ করতেন নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য, তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য মুসলমানদের জন্য। জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, বনী নাযীর থেকে পাওয়া গিয়েছিলো— বর্ম পঞ্চাশটি, শিরস্ত্রাণ পঞ্চাশটি এবং তরবারী তিনশত চল্লিশটি। এগুলো তিনি স. তাঁর পছন্দ মতো একে ওকে দিয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. যখন মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তখন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন আনসারদের। অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরই গৃহে। অবশ্য আনসার ও মুহাজির সবার বিষয়ে তিনি খোঁজ-খবর রাখতেন। তাঁদেরকে তিনি স. ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। আনসারগণ তাঁদের সহায়-সম্পদ, বাগ-বাগিচা সব কিছুতেই তাঁদের মুহাজির ভ্রাতাগণকে শরীক করে নিয়েছিলেন। অবস্থা এমনও হয়েছিলো যে, আনসারদের কারও একাধিক স্ত্রী থাকলে তাঁরা কাউকে কাউকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিতেন।

রসুলেপাক স. যখন বনী নাযীরদের সম্পদ হস্তগত করলেন, তখন তিনি আনসারদের প্রশংসা করলেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করলেন। যারা মুহাজিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা যদি চাও, তবে আমি বনী নাযীরদের সকল সম্পদ কেবল তোমাদের মধ্যেই বণ্টন করে দিবো। মুহাজিরগণ পূর্বের মতো তোমাদের বাড়িতেই থাকবে। আর যদি বলো, এ সম্পদ মুহাজিরদেরকে

দিয়ে তোমাদের থেকে তাদেরকে পৃথক করে দিবো, তবে তা-ই করবো। তাদের আলাদাভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিবো, যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে। তোমাদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আনসারদের নেতা হজরত সাআদ ইবনে মাআয এবং হজরত সাআদ ইবনে উবাদা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা চাই, আপনি এ সম্পদ আমাদের মুহাজির ভ্রাতাগণকে দান করুন। কারণ, তাঁরা দ্বীনের মহব্বতে আপন আপন গৃহ, পরিবার-পরিজন ও সকল আপনজন ছেড়ে এসে এখানে অনটনের জীবন যাপন করছেন। আর তাঁদেরকে আমাদের ঘর-বাড়িতেই পূর্বের মতো বসবাস করার অনুমতি দিন। কারণ তাঁদের উসিলায় আমাদের ঘরবাড়ি সমুজ্জ্বল ও বরকতময় হয়েছে। সকল আনসার তাঁদের নেতৃদ্বয়ের প্রস্তাবে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। রসুলেপাক স. পরিতুষ্ট হলেন। দোয়া করলেন— 'আল্লাহুম্মা আরহামিল আনসারা ওয়া আমবাইল আনসারা ওয়া আমবা আমবাইল আনসারি' (হে আল্লাহ! তুমি আনসারদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ করো। রহমত বর্ষণ করো তাদের উত্তরপুরুষদের উপরেও)। তারপর তিনি স. বনী নাযীরদের সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। কিছু কিছু মুহাজিরকে দান করলেন ভূমি। কাউকে দিলেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইবনে আবুল হাকীকের একটি উন্নতমানের তরবারী ছিলো। তিনি স. তরবারীটি দিলেন হজরত সাআদ ইবনে মাআযকে।

কতিপয় আপনজনের অন্তিমযাত্রা

এ বৎসর রসুলেপাক স. এর দৌহিত্র এবং হজরত ওছমানের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্‌র ইনতেকাল হয়। জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, একটি মোরগ তাঁর চোখে ঠোকর মেরেছিলো। তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওই অবস্থাতেই তিনি দুনিয়া থেকে চলে যান।

এ বৎসর উম্মুল মুমিনীন হজরত যয়নব বিনতে খুযায়মারও ইনতেকাল হয়। আর এ বৎসরেই তিনি স. বিবাহ করেন হজরত উম্মে সালমাকে। তাঁর পূর্বস্বামী আবু সালমা ইবনে আবদুল আসাদ মুখযুমী মারা যান এর আগের বছর। এ বৎসরে আরো ইন্তেকাল করেন হজরত আলীর মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদ ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ। রসুলেপাক স. বলেছিলেন, তাঁর অন্তিমকালে যেনো আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়। তাঁর ইন্তেকাল হলে রসুলেপাক স. বললেন, এঁর জন্য জান্নাতুল বাকীতে কবর খনন করো। কবর খনন যখন শেষ হলো, তখন রসুলেপাক স. কবরে প্রবেশ করলেন। সেখানে উপবেশন করলেন। কিছুক্ষণ কোরআন পাঠ করলেন। কবরের পাশেই তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করলেন নয় তকবীরের সাথে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সত্তুর তকবীর দিয়ে নামাজ

আদায় করেছিলেন তিনি স.। তাঁর সম্পর্কে বললেন, ফাতেমা বিনতে আসাদ ব্যতীত কেউ কবরের আযাব থেকে সুরক্ষিত নয়। সাহাবীগণ বললেন, আপনার পুত্র কাসেমও কি সুরক্ষিত নয়? তিনি তো শিশুকালেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। রসুলেপাক স. বললেন, কাসেমের কথা কি বলছো, তার চেয়ে আরও কম বয়সে যে ইবরাহিম ইনতেকাল করেছিলো সে-ও নয়। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. তাঁর সহচরবৃন্দ পরিবেষ্টিত ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে খবর দিলো, জাফর, আলী ও আকীলের মাতা ইনতেকাল করেছেন। তিনি স. বললেন, চলো আমরা আমাদের মায়ের কাছে যাই। তিনি রওয়ানা করলেন। সাহাবাকেরামও অত্যন্ত বিনয় ও নীরবতার সাথে তাঁর অনুসরণ করলেন। রসুলেপাক স. ফাতেমা বিনতে আসাদের গৃহে পৌঁছলেন। আপন শরীর থেকে জামা খুলে দিয়ে বললেন, নাও। গোছল দেওয়ার পর এই জামা দিয়ে কাফন বানিয়ে নিয়ো। গোসল ও কাফনকার্য সমাধা করার পর যখন তাঁর পবিত্র মরদেহ নিয়ে সাহাবীগণ বাইরে এলেন, তখন রসুলেপাক স. জানাযার খাটের একটি হাতল নিজের পবিত্র কাঁধে তুলে নিলেন। সমস্ত রাস্তায় কখনও সামনে, কখনও পিছনে গিয়ে খাট বহন করলেন তিনি স.। কবরের কাছে আসার পর কবরের ভিতর নামলেন। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, বিসমিল্লাহে ওয়া আ'লা ইসমিল্লাহ্। এবার লাশ কবরে নামাও। সাহাবাকেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা ফাতেমা বিনতে আসাদের ব্যাপারে দু'টি বিষয় অবলোকন করলাম, যা অন্য কারও বেলায় ঘটতে দেখিনি। একটি হচ্ছে আপনি আপনার পবিত্র জামা দিয়ে তাঁর কাফন বানিয়ে দিলেন। আর অপরটি আপনি নিজে তাঁর কবরে নেমে সেখানে কিছুসময় অতিবাহিত করলেন। তিনি স. বললেন, তাঁকে আমি আমার জামা পরিয়েছি এই উদ্দেশ্যে যেনো জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ না করে। আর আমি তাঁর কবরে নেমেছি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, আল্লাহ্তায়ালা যেনো তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, আবু তালেবের পর তিনি ব্যতীত পুণ্যকর্মে আমাকে অধিক সহায়তা কেউ করেননি। আমি তাঁকে আমার জামা পরিধান করিয়েছি এজন্য যাতে তিনি জান্নাতী দোপাট্টা পান। আর তাঁর কবরে অবস্থান করেছি কবরের আযাব থেকে তাঁর পরিত্রাণপ্রাপ্তির জন্য। হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, হজরত ফাতেমা বিনতে আসাদের অন্তিমকাল উপস্থিত হলে রসুলেপাক স. তাঁর কাছে গেলেন। তাঁর শিয়রের কাছে বসে 'হে আমার মা' 'হে আমার জননী' বলে সম্বোধন করলেন। তারপর তাঁর অনেক প্রশংসা করলেন এবং মৃত্যুর পর নিজের জামা মুবারক দিয়ে তাঁর কাফন বানিয়ে দিলেন। তারপর হজরত উসামা ইবনে যায়েদ, হজরত আবু আইয়ুব আনসারী এবং হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে বললেন, তোমরা তাঁর কবর

খনন করো। তিনি নিজেও তাঁর কবরখননের কাজে অংশগ্রহণ করলেন। নিজ হাতে কবরের মাটি ওঠালেন। কবর খননের কাজ শেষ হলে তিনি কবরে প্রবেশ করলেন এবং পাঠ করলেন— 'আল্লাহুল লাজী ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লা ইয়ামূতু ইগ্‌ফির লিউম্মী ফাত্বিমাতা বিনতি আসাদিওঁ ওয়া ওয়াসিআ' আ'লাইহি মাদখালাহা বিলহাক্কি নাবিয়্যিকা ওয়াল আমবিআই ক্বাবলী ফাইন্নাকা আরহামুর রহিমীন' (আল্লাহ্ ওই সত্তা, যিনি জীবন ও মৃত্যুদান করেন। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। হে আল্লাহ! আমার মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করে দাও। তাঁর প্রবেশস্থলকে প্রশস্ত করে দাও। তোমার নবীর উসিলায় এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উসিলায়। নিশ্চয়ই তুমি আরহামুর রহিমীন)। তারপর চার তকবীর বলে তাঁকে কবরে নামালেন। হজরত আব্বাস এবং হজরত আবু বকরও তাঁর সঙ্গে কবরে নামলেন। হজরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. কেবল পাঁচ ব্যক্তির কবরে নেমেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন নারী, আর দু'জন পুরুষ। তাঁরা হচ্ছেন— ১. হজরত খাদীজাতুল কুবরা ২. হজরত খাদীজার এক ছেলে (যিনি রসুলে পাক স. এর গৃহেই লালিত-পালিত হতেন) ৩. হজরত আবদুল্লাহ্ মযনী যাকে যুননাজাদাইন বলা হতো। ৪. হজরত আয়েশা সিদ্দীকার মাতা হজরত উম্মে রুমান এবং ৫. হজরত ফাতেমা বিনতে আসাদ (রাদ্বিয়াআল্লাহু তাআ'লা আনহুম আজ্মাঈন)।

এ বৎসরই রসুলেপাক স. এর প্রিয় দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, সাধারণ রমণীদের মতো হজরত ফাতেমার হায়েয ও নেফাস হতো না। সে কারণে তাঁকে হুরে জান্নাত বলা হতো।

বদরে সুগ্‌রার যুদ্ধ

এ বৎসর বদরে সুগ্‌রা বা ছোট বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পটভূমি ছিলো এরকম— আবু সুফিয়ান উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বলেছিলো, আগামী বৎসর বদর প্রান্তরে দেখা হবে। তখন হজরত ওমর ফারুক রসুলেপাক স. এর অনুমতিক্রমে উত্তর দিয়েছিলেন, হাঁ! ইনশাআল্লাহ্ দেখা হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এরকম করে জবাব দিয়েছিলেন অন্য একজন সাহাবী। বায়যাবীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, রসুলেপাক স.ই বলেছিলেন, হাঁ।

আবু সুফিয়ান পরবর্তী বৎসর যুদ্ধের সামান ও অস্ত্রপাতি প্রস্তুত করতে শুরু করলো। মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিবার জন্য লোকদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলো। তবে সে এরকম উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলছিলো তার জানোয়ারটিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ব্যাপারটি এরকম নয় যে, মক্কার মুসলমানদের সামনে দাঁড়াতে

সে ভয় পায়। নাঈম ইবনে মাসউদ আশজায়ী নামক এক ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কায় পৌঁছে মুসলিমবাহিনীর শান-শওকতের কথা কুরায়েশদেরকে অবহিত করলো। বললো, মদীনায় মুসলমানদের সৈন্য-সামন্ত এমনভাবে গিজগিজ করছে, যেমন আনার ভরপুর থাকে দানায় দানায়। আবু সুফিয়ান বললো, আমরা তো উহুদের ময়দানে মোহাম্মদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলাম, পরবর্তী বৎসর তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করবো। কিন্তু এ বৎসর আমাদের এমন কড়া দুর্ভিক্ষ হলো যে, আমাদের প্রাণীগুলোও চারণভূমিতে খাবার পাচ্ছে না। আপনি মদীনায় পৌঁছে মোহাম্মদ ও তার অনুসারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন, যেনো তারা ভয়ে মদীনা থেকে বের না হয়। তাহলে আমরা আপনাকে তিন বছর বয়সী বিশটি উট উপঢৌকন দেবো। নাঈম মদীনায় পৌঁছে এমনভাবে মস্তক মুড়িয়ে নিলো যেনো মনে হয় সে ওমরা করে এসেছে। কাশ্‌শাফ গ্রন্থকার বলেন, বাস্তবিকই সে ওমরা পালন করতেই গিয়েছিলো। সে কুরায়েশদের রণপ্রস্তুতি এবং তাদের সৈন্যবাহিনীর শান-শওকতের কথা মুসলমানদের কাছে বললো। এই ইঙ্গিতও দিলো যে, এহেন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের মদীনা থেকে বের হওয়া ঠিক হবে না। বললো, আমার ধারণা, তোমরা যদি তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করো, তবে আর ফিরে আসতে পারবে না। তবে যারা পলায়ন করবে তাদের কথা ভিন্ন। নাঈমের কথা সত্য মনে করে মুসলমানগণ বের হতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। এমনকি অবস্থা এমন হলো যে, কেউ যেনো এ যুদ্ধে যাবেনই না। রসুলেপাক স. সব কিছু শুনলেন। দেখলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুক রসুলেপাক স. এর কাছে বসে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করলেন। তিনি স. আনন্দিত হলেন। বললেন, শপথ ওই মহান সত্তার, যাঁর কুদরতী হস্তে আমার জীবন, আমি অবশ্যই যুদ্ধে যাবো, অন্য কেউ না গেলেও। রসুলেপাক স. এর একথা শুনে সকল সাহাবী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের উপর থেকে শয়তানের অপপ্রভাব দূর হয়ে গেলো। অন্তর্জগত অধিকতর শক্তিময় হলো। রসুলেপাক স. হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহাকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করলেন। পতাকা তুলে দিলেন হজরত আলীর হাতে। অতঃপর দেড় হাজার বীরযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। জীবনীগ্রন্থসমূহে সৈন্যসংখ্যা এরূপই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে 'কাশ্‌শাফ' প্রণেতা সৈন্যসংখ্যা সত্তুর বলেছেন। বায়যাবীও তাঁর অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁদের মন্তব্য সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে রসুলেপাক স. মাত্র সত্তুর জন সৈন্য নিয়ে বের হবেন, তা হয় না। তবে বিষয়টি এমন হতে পারে যে, তিনি স. প্রথমে সত্তুর জন নিয়েই বের হয়েছিলেন। পরে পর্যায়ক্রমে অন্যান্যরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এ যুদ্ধে ঘোড়ার সংখ্যা দশের উপর ছিলো না। মুসলমানগণ এ যুদ্ধ থেকে অনেক

গণিমতের মাল সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এবং বদর প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে অনেক পণ্যসামগ্রী ক্রয়ও করেছিলেন। ব্যবসায় তাঁদের লাভও হয়েছিলো অনেক। আনন্দ ও শান্তির সাথেই তাঁরা প্রত্যাবর্তন করেছিলেন মদীনায়। তাঁদেরকে সেখানে মুশরিকদের সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতে হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত— 'আল্লাজীনা ক্বালা লাহুমুন্ নাসু ইন্নান নাসা ক্বাদ জ্বামাউ' লাকুম ফাখ্শাওহুম ফাযাদাহুম ঈমানাওঁ ওয়া ক্বালূ হাস্বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল ফাংক্বালাবূ বিনি'মাতিম মিনাল্লাহি ওয়া ফাদলিল্ লাম ইয়াম্সাস্হুম সূউন' (ইহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর; কিন্তু ইহা তাহাদের ইমান দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক! তারপর তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই) (৩ঃ১৭৩-১৭৪)।

জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান দু'হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা হলো। তাদের সঙ্গে পঞ্চাশটি ঘোড়া ছিলো। মক্কা থেকে সাত-আট মাইল দূর 'মাররুয্যাহ্রান' নামক জায়গায় পৌঁছে তারা টাল-বাহানা শুরু করলো। বলতে লাগলো, এখানেও তো দুর্ভিক্ষ, ঘাস-পানির ব্যবস্থা নেই। পশুদের খাবার জুটছে না। আমাদেরও দুধ মিলবে না। এ সব অজুহাত দিয়ে তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলো। কিন্তু মূল কারণ এরূপ ছিলো না। তারা মুসলমানদের শৌর্যবীর্য দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিলো। সফওয়ান ইবনে উমাইয়া বললো, অধিনায়ক! আপনি একি করছেন? মোহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে আপনি ওয়াদা করেছিলেন। অথচ যুদ্ধ না করেই ফিরে যাচ্ছেন। এরকম করলে তারা তো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে।

এরপর তারা খন্দকের যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে থাকে, যার বর্ণনা একটু পরেই করা হবে। মক্কার লোকেরা এ অভিযানকে 'জায়শুস্সাবীক' নাম দিয়েছিলো। সাবীক মানে ছাতু। এ অভিযানকালে তারা ছাতু ছাড়া আর অন্য কিছুই খেতে পায়নি। মক্কার লোকেরা আবু সুফিয়ানকে তিরস্কার করে বলেছিলো, আপনি কি আমাদেরকে ছাতু খাওয়ানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য গজওয়ায়ে সাবীক ইসলামের ইতিহাসে অপর একটি যুদ্ধের নাম। তখনও তারা ছাতু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো। পলায়নকালে তারা ছাতু নিক্ষেপ করতে করতে প্রত্যাবর্তন করেছিলো।

ছঙ্গেছারের বিধান

এ বৎসর আর একটি ঘটনা ঘটেছিলো এরকম— এক লোক কোনো এক ইহুদী রমণীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হলো। রসুলেপাক স. ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে উভয়কে ছঙ্গেছার (প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা) করার নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই ছিলো অমুসলিম। তারা বললো, আমরা আমাদের ধর্মানুসারে কাজ করবো। আমাদের তওরাত কিতাবের বিধান এরকম— ব্যাভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কে মুখে কালি মাখিয়ে উটের উপরে বসিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাতে হবে। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তওরাত কিতাবেও ব্যাভিচারের শাস্তি ছঙ্গেছার। কোরআন ও তওরাতে এ ব্যাপারে কোনো ভিন্নতা নেই। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ইহুদীদের ধর্মযাজক ছিলেন। রসুলেপাক স. এর মদীনায় আগমনের পর পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিও তাদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, যাও। তওরাত নিয়ে এসো। তারা তওরাত কিতাব এনে পাঠ করতে লাগলো। যখন ছঙ্গেছারের আয়াতে পৌঁছলো, তখন ওই আয়াতের উপর হাত রেখে পাঠ করতে লাগলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ওই আয়াত নিজে পাঠ করে শোনালেন। তারা আর ছঙ্গেছার থেকে বাঁচতে পারলো না।

এ বৎসর রসুলেপাক স. হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে তওরাতের ভাষা শিখতে নির্দেশ দিলেন। ইহুদীরা তাদের বিভিন্ন পুস্তিকা ও কিতাবে ধর্মের বিধান পরিবর্তন করেছিলো। সেগুলির যথার্থতা যাচাই করার জন্যই এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত পনেরো দিনের মধ্যে ইব্রানী শিখে ফেললেন। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে, হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে তওরাত শেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো ওই ছঙ্গেছারের পরিপ্রেক্ষিতেই। তবে অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে বললেন, ইহুদীরা আমাদের কাছে পত্র লিখে। আমরাও তাদের পত্রের উত্তর দেই। বিভিন্ন সময়ে আমরা তাদেরকে বিভিন্ন রকম ফরমানও পাঠিয়ে থাকি। তাদের ভাষা তো আমরা বুঝি না। তারা কী বলে না বলে তা যাচাইও করতে পারি না। আর আমরা তাদের উপর ভরসাও করতে পারি না। সুতরাং তাদের ভাষা শেখা জরুরী, যাতে তাদের ধোকাবাজী থেকে আমরা রক্ষা পাই। বলাবাহুল্য, হজরত যায়েদকে ইব্রানী শেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো এ কারণেই।

হাত কাটার বিধান প্রবর্তন

এ বৎসর তাইমা ইবনে ইবরীক নামক এক ব্যক্তির চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়। সে বনী যফর গোত্রের লোক ছিলো। সে তার প্রতিবেশী হজরত কাতাদা ইবনে নোমান আনসারীর ঘর থেকে একটি বর্ম চুরি করলো। তার সঙ্গে চামড়ার থলেতে আটা ভর্তি করে চুরি করে নিয়ে গেলো। থলেটিতে ছিদ্র ছিলো। ওই ছিদ্র দিয়ে আটা পড়ে যাচ্ছিলো। এ অবস্থা দেখে সে ভয় পেয়ে গেলো। তাই সে আটার থলেটি যায়েদ ইবনে সামীন নামক এক ইহুদীর ঘরে রেখে চলে গেলো। অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সে বর্ম ও আটার থলেটি ওই ইহুদীর ঘরে সেদিনকার মতো রেখে দিয়েছিলো। পরের দিন যায়েদের বাড়ি থেকে থলেটি উদ্ধার করা হলো। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। যায়েদ ইবনে সামীন বললো, এ কাজতো আমি করিনি। এটা নিশ্চয় তাইমার কাজ। মনে হয় সে কাল রাতে থলেটি আমার ঘরে রেখে গিয়েছে। ইহুদীদের একদল লোক এ বিষয়ে সাক্ষীও প্রদান করলো। হজরত কাতাদা এবং যায়েদ উভয়েই তাইমার কাছে গেলেন। বললেন, এ কাজ কি তুমি করেছো? সে অস্বীকার করলো। তার প্রতিবেশীরা জানতো, চুরি করা তার অনেক দিনের অভ্যাস। তাকে যখন রসুলেপাক স. এর নিকট হাজির করা হলো, তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে নির্দোষ বলে আখ্যায়িত করলো। বললো, এ অপরাধ করেছে যায়েদ। তারা মনে করলো, যেহেতু তাইমা মুসলমান, কাজেই রসুলেপাক স. তাকে রক্ষা করবেন। রসুলেপাক স. ইহুদী লোকটিকে শাস্তি দিতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাযিল হলো— 'ইন্না আন্যালনা ইলাইকাল কিতাবা বিল হাক্কি লিতাহ্কুমা বাইনান্ নাসি বিমা আরাকাল্লাহু ওয়া লা তাকুল্ লিল্খাইনীনা খাসীমা' (আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-মিমাংসা কর এবং বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করিও না) (৪ঃ১০৫)।

অতঃপর রসুলেপাক স. ইবনে সামীনকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত রইলেন। পক্ষান্তরে তাইমার হাত কাটার হুকুম দিলেন। তাইমা মদীনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গেলো। সেখানে গিয়েও সে চুরি করলো। লোকেরা যখন তার সম্পর্কে জানতে পারলো, তখন তারা একদিন তাকে হত্যা করে ফেললো। এক বর্ণনায় আছে, সে একদিন এক বাড়ির দেয়ালে সিঁধ কাটলো। হঠাৎ দেয়ালটি ভেঙে তার গায়ের উপর পড়লো। ওই দেয়াল চাপা পড়েই তার মৃত্যু হলো। 'কাশ্শাফ' প্রণেতা বলেছেন, সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং চুরি করার কাজেই তার জীবন শেষ হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে, মদীনা থেকে পালিয়ে এসে সে এক স্থানে একটি নৌকায় আরোহণ করলো। নৌকা থেকে একজনের থলে চুরি করার কারণে লোকেরা তাকে সাগরে

নিক্ষেপ করলো। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, চুরির অভ্যাস যদি অস্থিমজ্জায় মিশে যায়, তবে তা মৃত্যু পর্যন্ত পৃথক হয় না। অবশ্য অধিকাংশ পাপ এবং বদঅভ্যাসের অবস্থা এরকমই।

নিষিদ্ধ হলো মদ্যপান

প্রখ্যাত বর্ণনানুসারে শরাব পান নিষিদ্ধ হয়েছিলো হিজরী চতুর্থ বৎসরে। অপর এক বর্ণনানুসারে ষষ্ঠ বৎসরে। আরেক বর্ণনা মতে অষ্টম সালে। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, মদ্যপানের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম এই আয়াত অবতীর্ণ হয়— 'ওয়া মিন ছামারাতিন নাখীলি ওয়াল আ'নাবি তাত্তাখিজূনা মিনহু সাকারাওঁ ওয়া রিযক্বান হাসানা' (এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হইতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক) (১৬ঃ৬৭)। এ আয়াতটি বৈধতার প্রতি আম ছিলো। সকল লোকই ব্যাপক হারে উক্ত ফলসমূহ খেতো। আবার তা থেকে তৈরী পানীয়ও পান করতো। কিন্তু সুমতিসম্পন্ন কতিপয় সাহাবী এ থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তা পান করা থেকে বিরত থাকতেন। যেমন হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওছমান। তাঁরা মুর্খতার যুগেও মদ্যপান করেননি। এরপরে অবতীর্ণ হয়— 'ইয়াস্আলূনাকা আ'নিল খামরি ওয়াল মাইসিরি কুল ফীহিমা ইছমুন কাবীরুওঁ ওয়া মানাফিউ' লিন্ নাসি ওয়া ইছ্মুহুমা আকবারু মিন নাফই'হিমা' (লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক) (২ঃ২১৯)।

রসুলেপাক স. বলেছেন, এ আয়াতটিই শরাব পানের নিষিদ্ধতার প্রাথমিক ঘোষণা। এ আয়াত পাঠ করে হজরত ওমর ফারুক বললেন, 'আল্লাহুম্মা বাইয়িল লানা বাইয়ানা শাফিআন ফিল্ খামরি' (হে আল্লাহ্! শরাবের ব্যাপারে আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিন)। এরপর থেকে সাহাবাকেরাম শরাব পান থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত হয়ে গেলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, যে জিনিসের মধ্যে উপকারের চেয়ে অপকার বেশী তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। তবে কিছু কিছু লোক এর মাঝে যেহেতু উপকারিতা রয়েছে— এ মনে করে তখনও তা পান করতো। অবস্থা এমনই চলছিলো। কিন্তু একদিন ঘটলো এক বিচিত্র ঘটনা। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ একটি জিয়াফতের অনুষ্ঠান করলেন। সেখানে সাহাবীগণ শরাব পান করে মত্ত হয়ে গেলেন। মাগরিবের নামাজের সময় হলো। সে নামাজে ইমাম সূরা 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' পড়তে গিয়ে 'লা' শব্দটি বাদ দিয়ে দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো— 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা

আমানূ লা তাক্বরাবুস্ সালাতা ওয়া আংতুম সুকারা হাত্তা তা'লামূ মা তাক্বলূন' (হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার) (৪ঃ৪৩)।

একদল সাহাবী বললেন, যে জিনিস নামাজ ত্যাগের দিকে নিয়ে যায় এবং যা নামাজ অবস্থায় জায়েয নয়, তা আমরা কেমন করে ব্যবহার করতে পারি? সেদিন থেকে তাঁরা মদ্যপান একেবারেই পরিত্যাগ করলেন। আবার কেউ কেউ তখনও মদ্যপান করে যাচ্ছিলেন। নামাজের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত তাঁরা পরিমিত পান করতেন, যাতে নেশা না হয়। অবস্থা এমনই চলছিলো। একদিন এক আনসারী সাহাবী জিয়াফতের আয়োজন করলেন। অতিথি আপ্যায়ন করলেন উটের ভূনা গোশত দিয়ে। খাওয়ার পর শরাব পান করলেন তাঁরা। এক পর্যায়ে মত্ত হয়ে গেলেন। শুরু করলেন নিজ নিজ গোত্রের গৌরবগাথা, কবিতাপাঠ। হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যাতে ছিলো আনসারদের নিন্দা এবং তাঁর স্বগোত্রের স্তুতি। তাই শুনে এক আনসার সাহাবী রেগে গেলেন। উটের উচ্ছিষ্ট হাড় দিয়ে হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের মাথায় আঘাত করলেন। ফলে তাঁর মাথা ফেটে গেলো। তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে গিয়ে ওই আনসারীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। ঘটনা জানতে পেরে হজরত ওমর ফারুক প্রার্থনা করলেন— 'আল্লাহুম্মা বাইয়িল লানা বাইয়ানান্ শাফিইআন ফিল খামরি' (হে আল্লাহ্! শরাবের বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান করে দিন)। তখন অবতীর্ণ হলো— 'ইয়া আইয়ুহাল লাজীনা আমানূ ইন্নামাল খাম্‌রু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আন্‌সাবু ওয়াল আয্‌লামু রিজ্বসুম্ মিন আ'মালিশ্ শাইত্বানি ফাজ্বতানিবূহু লাআ'ল্‌লাকুম তুফলিহূনা। ইন্নামা ইউরিদুশ্ শাইত্বানু আইঁ ইউক্বিআ' বাইনাকুমুল আ'দাওয়াতা ওয়াল বাগ্‌দাআ ফিল খামরি ওয়াল মাইসিরি ওয়া ইয়াসুদ্দাকুম আ'ন জিক্‌রিল্লাহি ওয়া আ'নিস্ সালাতি ফাহাল আংতুম মুনতাহূন' (হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর— যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?) (৫ঃ৯০-৯১)।

এই আয়াতে শরাবপানের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এ হচ্ছে, রসুলেপাক স. কর্তৃক পেশকৃত দশটি সনদের অন্যতম। তিনি স. নির্দেশ দিলেন, মদীনার বাজারে অলিতে গলিতে ঘোষণা দিয়ে দাও— আজ থেকে শরাবপান হারাম।

এরপর থেকে সকল মুসলমান মদ্যপান পরিত্যাগ করলেন। যাদের ঘরে শরাবের মটকা ছিলো, তাঁরা তা ভেঙে চুরমার করে দিলেন। মদীনার অলিতে গলিতে দেখা দিলো শরাবের প্লাবন। শরাব পানের নিষিদ্ধতা ও তার শাস্তির ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত উন্নীত। হাদিস গ্রন্থসমূহ এ সম্পর্কিত বিবরণে ভরা।

পঞ্চম বৎসরের ঘটনাসমূহ

এ বৎসর রসুলেপাক স. আল্লাহ্পাকের নির্দেশে উম্মুল মুমিনীন হজরত যয়নব বিনতে জাহাশকে বিবাহ করেন। জীবনীকারগণের বর্ণনানুসারে তাঁর বাসরকালেই পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইনশাআল্লাহ্ 'আয্ওয়াজে মুতাহ্হারত' পর্বে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা করা হবে।

মুরায়সী'র যুদ্ধ

এ বৎসর মুরায়সী'র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুরায়সী হচ্ছে বনী খাযাআ গোত্রের একটি কূপের নাম। একে বনী মুস্তালিক যুদ্ধও বলা হয়। মুস্তালিক ছিলো এক ব্যক্তির উপাধি, যার আসল নাম ছিলো খুযায়মা ইবনে সাআদ ইবনে আমর। সে ছিলো বনী খাযাআর বংশোদ্ভূত। এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসের তিন তারিখ সোমবারে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, সেদিন ছিলো শনিবার। মুসা ইবনে উকবা বলেছেন, হিজরীর চতুর্থ বৎসরে এ যুদ্ধ হয়েছিলো। জীবনীকারগণ বলেছেন, এটা মুসা ইবনে উকবার লিপিভ্রম। ভুল করে তিনি পাঁচের স্থলে চার লিখে ফেলেছেন। গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে, যুদ্ধটি পঞ্চম বৎসরই সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের পটভূমি এরকম— ওই গোত্রের সরদার হারেছ ইবনে আবী দারার আরবের কোনো কোনো গোত্রকে রসুলুল্লাহ্ স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহবান জানালো। সংবাদটি রসুলেপাক স. এর কানে পৌঁছলে তিনি বিখ্যাত সাহাবী হজরত বুরায়দা ইবনুল হাসীব আসলামীকে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করলেন। 'আল হারবু খেদআতুন' (যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণা) এ কথাও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। হজরত বুরায়দা তাদের নিকট পৌঁছে বললেন, তোমরা নাকি মোহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও? যদি করো, তবে আমিও তোমাদের দলে যোগ দিবো। তারা তাঁকে খুব সমাদর করলো। বললো, হাঁ। তুমি যোগ দিতে পারো। আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। আমরা তো এ ব্যাপারে পাক্কা এরাদা করেছি। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক, আমি আমার লোকজনকে প্রস্তুত করে নিয়ে আসি। এ কথা বলেই তিনি

সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং রসুলেপাক স. এর কাছে সবকিছু খুলে বললেন। রসুলেপাক স. মুসলামানদের বাহিনী প্রস্তুত করে সেদিকে যুদ্ধযাত্রা করলেন। মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে। মুহাজিরদের পতাকা বহন করতে দিলেন হজরত আলীকে। অপর এক বর্ণনানুসারে হজরত আবু বকর সিদ্দীককে। আর আনসারদের পতাকা দিলেন হজরত সাআদ ইবনে উবাদাকে। সম্মুখভাগের দায়িত্ব পেলেন হজরত ওমর। এ যুদ্ধে মুহাজিরদের ঘোড়া ছিলো তিরিশটি। আর বিশটি ঘোড়া ছিলো আনসারদের। গণিমত ও দুনিয়াবী লাভের উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক মুনাফিকও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। পথিমধ্যে কাফেরদের কিছু গুপ্তচর ধরা পড়লো। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। প্রথমে তারা কিছু বলতে অস্বীকার করলো। পরে হজরত ওমরের ভয়ে সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হলো তারা। রসুলেপাক স. তাদেরকে হত্যা করার হুকুম দিলেন।

হারেছ যখন জানতে পারলো, রসুলেপাক স. তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন, তখন বনী মুস্তালিকের লোকেরা ভয় পেলো খুব। এদিক ওদিক থেকে এসে যারা হারেছের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো, তারা পালিয়ে যেতে লাগলো তাদের আপন আপন ঘর বাড়ির দিকে। হারেছের পাশে বনী মুস্তালিকের লোকজন ছাড়া আর কেউ রইলো না। রসুলেপাক স. সেখানে পৌঁছে মুরায়সী নামক কূপের নিকট অবস্থান গ্রহণ করলেন। এ যুদ্ধে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই সহধর্মিণী— হজরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং হজরত উম্মে সালমা। কাফেররা সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো। উভয় বাহিনী যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলো, তখন রসুলুল্লাহ্ স. এর নির্দেশে হজরত ওমর ঘোষণা দিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' পাঠ করো। তাহলে তোমাদের জান ও মাল নিরাপদ হয়ে যাবে। তারা কলেমা পাঠ করতে অস্বীকার করলো। মুসলিমবাহিনী প্রথমে তাদের উপর আক্রমণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিশানবাহী লোকটি ধরাশায়ী হয়ে গেলো। অবিশিষ্টরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করলো। দশজন মারা গেলো। অবশিষ্ট পুরুষ ও নারী হলো বন্দী। বিভিন্ন প্রকারের গণিমত মুসলমানদের হস্তগত হলো। মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হলেন কেবল এক জন।

সহীহ্ বোখারীর হাদিসে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। তারা তখন তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাবার কাজে ব্যস্ত ছিলো। হঠাৎ হামলা হতে দেখে কেউ কেউ অস্ত্রধারণ করলো। তাদেরকে হত্যা করা হলো। অন্যেরা অস্ত্র ধারণাবস্থায়ই বন্দী হয়ে গেলো। শিশুদেরকেও বন্দী করা হলো। জীবনীবিশেজ্ঞগণ বর্ণনা

করেছেন, যুদ্ধের অগ্নি যখন প্রশমিত হলো, তখন বনী মুস্তালিকের এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলো। বললো, যুদ্ধ চলাকালে আমি ময়দানে শাদা পোশাক পরিহিত কিছুসংখ্যক লোককে দেখেছি। তারা শাদা কালো বর্ণের ঘোড়ায় আরোহণ করে মুসলিমবাহিনীর মধ্যে তৎপর ছিলো। আমি এ ধরনের লোক ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। জুওয়ায়রিয়াও উম্মুল মুমিনীনগণের মধ্যে ছিলেন যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে। তিনি হারেছ ইবনে যারারের কন্যা ছিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, গনিমতের সম্পদ এবং যুদ্ধবন্দীদের বণ্টনকার্য সমাপ্ত হলো। রসুলেপাক স. আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটি কূপের কাছে বসেছিলেন। অকস্মাৎ হারেছ ইবনে যারারের কন্যাকে আনা হলো সেখানে। তিনি ছিলেন রূপসী। তাকে দেখলে সহজেই আকৃষ্ট হতে হয়। আমি আশংকা করলাম, রসুলুল্লাহ্ না জানি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। অবশেষে আমার আশংকাই সত্য হলো। জুওয়ায়রিয়া বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্নাকা রসুলুহু। আমি গোত্রাধিনায়ক হারেছ ইবনে যারারের কন্যা। এখন আমি মুসলিমবাহিনীর বন্দিনী। ভাগে পড়েছি ছাবেত ইবনে কায়েসের। সে আমাকে মাকাতেব (চুক্তিবদ্ধ বাঁদী) বানিয়েছে। চুক্তির মূল্য পরিশোধ করার মতো সম্পদ আমার নেই। আশা করি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাকে অবশ্যই সহযোগিতা করবো এবং তার চেয়েও ভালো ব্যবহার করবো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তার চেয়েও ভালো ব্যবহার কী? তিনি স. বললেন, চুক্তি থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করবো এবং তোমাকে আমার একান্ত সান্নিধ্যধন্য করবো। একথা বলেই রসুলুল্লাহ্ স. হজরত ছাবেত ইবনে কায়েসের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁর পাওনা পরিশোধ করে দিলেন। এরপর তিনি তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিলেন। সাহাবায়েকেরাম যখন এ বিষয়ে অবহিত হলেন, তখন তাঁরা পরস্পরে চিন্তাভাবনা করে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রসুলেপাক স. যাঁকে তাঁর অঙ্কশায়িনী করে নিয়েছেন, তাঁর প্রিয়জন এবং আত্মীয়স্বজনকে আমরা গোলাম করে রাখতে পারি না। এমতো সিদ্ধান্তের ফলে সকল যুদ্ধবন্দী মুক্ত হয়ে গেলো। বনী মুস্তালিকের বন্দীগণের সংখ্যা ছিলো একশ নব্বইয়ের অধিক। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, খায়ের ও বরকতের দিক দিয়ে জুওয়ায়রিয়ার চেয়ে অধিক সম্মানিতা কোনো নারী নেই। তাঁর কারণে পুরো একটি সম্প্রদায় মুক্তি পেয়েছে।

জীবনীলেখকগণ লিখেছেন, হজরত জুওয়ায়রিয়া বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ বনী মুস্তালিকে আগমন করার পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি চন্দ্র ইয়াছরিব থেকে উদয় হয়ে ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে আসছে। এক পর্যায়ে চন্দ্রটি আমার কোলে এসে বসে গেলো। আমি ওই স্বপ্নের কথা কাউকেই বলিনি। অবশেষে সে স্বপ্ন আমার মধ্যেই প্রতিফলিত হলো। হজরত জুওয়ায়রিয়ার নাম ছিলো বারাহ

(কল্যাণ, পুণ্য)। রসুলেপাক স. তাঁর নাম রেখেছেন জুওয়ায়রিয়া। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো, তিনি মানুষের অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখতেন। বারাহ নামের অর্থ ভালোই। কিন্তু এর মধ্যে কিছু সমস্যাও রয়েছে। যেমন, কেউ যদি বলে, ঘরে কি 'বারাহ' আছেন? তার উত্তরে যদি বলতে হয়, না, তাহলে তো অর্থ দাঁড়ায়, এ ঘরে কোনো কল্যাণ নেই। তদ্রূপ কারও নাম যদি রাখা হয় মাফলাহ বা (কৃতকার্যের আধার) বা ইয়াসার (খোশহালী) তাহলে এধরনের নাম ডাকার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হয়। রসুলেপাক স. বলেছেন, এমন নাম রাখতে হবে যা ডাকার কারণে অকল্যাণমূলক কিছু প্রকাশ না পায়।

এ যুদ্ধের সময় মুনাফিকদের অগ্রণী আবুল ফযল, যার আসল নাম ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল, সে বলেছিলো, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সম্মানিতজনেরা অপদস্থদেরকে অবশ্যই সেখানে থেকে বের করে দিবে। তার এরকম বলার কারণ এরকম— সেনান ইবনে ওবুর জুহানী খাযরাজ গোত্রের পক্ষ থেকে আমর ইবনে আউফ নামক এক ব্যক্তির মিত্রতা ছিলো। অপর পক্ষে জাহাজাহ ইবনে সাঈদ গেফারী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের কর্মচারী। ওই দু'জনের মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় নিয়ে ঝগড়া হলো। একবার তাদের উভয়ের বালতি একটি কূপে পড়ে গেলো। দু'টো বালতিই ছিলো এক রকমের। একটি বালতি কূপ থেকে ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সেনান বললো, এটা আমার বালতি। জাহাজাহ বললো, এটি আমার। জীবনীলেখকগণ বলেছেন, বালতিটি ছিলো সেনানের। ঝগড়ার এক পর্যায়ে জাহাজাহ সেনানের মুখের উপর এক ঘুষি মেরে বসলেন। তার মুখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। সেনান যে আনসারদের মিত্র ছিলো, তাদের কাছে আশ্রয় চাইলো। জাহাজাহ সাহায্য চাইলো মুহাজিরদের। দু'পক্ষের লোকই হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে এলো। দু'পক্ষেরই যুদ্ধংদেহী ভাব। মুহাজিরদের একদল লোক সেনানকে তার দাবী প্রত্যাহার করে নিতে বললেন। সেনান তাঁদের কথা অনুযায়ী আপন দাবী থেকে সরে গেলেন। এ সংবাদ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছলো। সে ছিলো আনসারদেরই দলে। তাই মুহাজিরদের লোক জাহাজাহর প্রতি ভয়ানক রুষ্ট হলো। সে রসুলুল্লাহ্ স.কে মুহাজিরদের পক্ষাবলম্বনকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করলো। তার অনুসারী মুনাফিকদের পক্ষ হয়ে সে বললো, দ্যাখো, মুহাজিরদের সাহস তো যুগিয়েছি আমরাই। তারা তো আমাদের উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু তারা একথা ভুলে গেছে। তাই তারা আমাদের সঙ্গে এরকম ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। সাধে কি লোকে বলে 'সাম্মিন কালবাকা ইয়াকুলুকা' (তোমার কুকুরকে যদি বেশী মোটা-তাজা বানাও, তাহলে সে একদিন তোমাকেই কামড়াবে)। মদীনাতে আমাদের সম্মানই বেশী। তারা তো বহিরাগত, তাই

তারা হেয়। আমরা মদীনায় ফিরে গেলে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিবো। কোরআন মজীদে তার বক্তব্যটির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এভাবে— 'ইয়াক্বূলূনা লাইন রাজ্বা'না ইলাল মাদীনাতি লাইখ্‌রিজ্বান্নাল আআ'য্‌যু মিনহাল আযাল্লা'। সে অধিক সম্মানিত বলে বুঝিয়েছিলো নিজেদেরকে। আর অপদস্থ বলে বুঝিয়েছিলো রসুলেপাক স. এবং তাঁর অনুসারীদেরকে (নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্মানিত কারা, সে কথা আল্লাহ্‌তায়ালাই বলে দিয়েছেন এভাবে— 'ওয়া লিল্লাহিল ই'য্‌যাতু ওয়ালিরসূলিহী ওয়ালিল্ মু'মীন ওয়ালা কিন্নাল মুনাফিক্বীনা লা ইয়া'লামূন' (সম্মান আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং তাঁর অনুসারী মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না)। যে মজলিশে বসে ওই অভিশপ্ত উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলো, সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম। তিনি যা কিছু শুনলেন তা রসুলেপাক স. এর নিকট বিবৃত করলেন। তখন সেখানে ছিলেন হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর। রসুলেপাক স. হজরত যায়েদ ইবনে আরকামের কথা শুনে বললেন, মনে হয় তুমি ভুল শুনেছো। তিনি কসম করে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করলেন। কথাটি পুরো বাহিনীর মধ্যে প্রচার হয়ে গেলো। আনসারদের কতিপয় লোক হজরত যায়েদ ইবনে আরকামকে ধমক দিয়ে বললো, তুমি তো এক গোত্রাধিপতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো। তিনি বললেন, আমি কসম করে বলছি, আমি স্বয়ং একথা শুনেছি। আমি আশা করছি আল্লাহ্‌তায়ালা হয়তো এ বিষয়ে তাঁর নবীকে প্রত্যাদেশ করবেন। হজরত ওমর ফারুক বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুমতি দিন, আমি ওই মালউনের গর্দান উড়িয়ে দেই। রসুলেপাক স. বললেন, না। এরকম করলে লোকে বলবে, মোহাম্মদ তার সাথীদেরকে হত্যা করে। একথা বলার পর তিনি স. তপ্ত আবহাওয়া হওয়া সত্ত্বেও সাথীগণকে সেখান থেকে প্রস্থান করার নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, সাহাবাকেরাম যেনো মুনাফিকদের ব্যাপারে সব জল্পনা-কল্পনা বন্ধ করে দেন। হজরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এতো উত্তপ্ত আবহাওয়ায় আপনি যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন যে। তিনি স. বললেন, তোমরা কি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কথা শোনোনি? হজরত উসায়েদ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি চাইলে আমরা তাকেই মদীনা থেকে বের করে দিবো। কেননা সবচেয়ে সম্মানিত তো আপনি, আর সবচেয়ে অপদস্থ অভিশপ্ত হচ্ছে সে। সম্মান তো আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং মুমিনদের জন্য। আপনি বরং তার প্রতি সদয় হোন। কেননা আপনি মদীনায় আগমন করার পূর্বে এখানকার সকল লোক তাকেই মদীনার আমীর বানাতে চেয়েছিলো। আপনার আগমনের কারণে তার আমীর হওয়ার সম্ভাবনা রহিত হয়ে গেছে। আর সে কারণেই আপনার প্রতি তার এহেন হিংসা।

কোনো কোনো আনসার রসুলেপাক স. এর মজলিস থেকে বের হয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে বললো, আল্লাহ্‌র রসুল তোমার অপমন্তব্যের কথা জেনেছেন। তুমি তাঁর কাছে মাফ চেয়ে নাও। আর যদি এরকম না বলে থাকো, তাহলে তা-ও জানাও এবং কসমও করে নিয়ো। তবে সাবধান! মিথ্যার আশ্রয় নিয়ো না। তাহলে কিন্তু তোমার নিন্দায় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে কসম করে বললো, আমি এ ধরনের কথা বলিনি। যায়েদ ঠিক বলেনি। হজরত যায়েদ বলেন, আমি তখন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মানসিক অবস্থা হলো বিপর্যস্ত। তখনই সুরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ হলো। রসুলেপাক স. আমাকে ডেকে এনে বললেন, শুভসংবাদ শোনো। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে সত্যায়িত করেছেন এবং ওই মুনাফিককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। তারপর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সামেত ইবনে উবাইয়ের কাছে গিয়ে তাকে তিরস্কার করে বললেন, ওঠো! রসুলেপাক স. এর কাছে যাও। তিনি হয়তো তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। ইবনে উবাই তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দিলো না বরং জোরে-শোরে মাথা ঝুঁকিয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন অবতীর্ণ হলো— ‘ওয়াইযা ক্বীলা লাহুম তাআ’লাউ ইয়াস্‌তাগফিরলাকুম রসূলুল্লাহি লাও্ওয়াউ রুঊসাহুম ওয়ারাআইতাহুম ইয়াসুদ্‌দূনা ওয়াহুম মুসতাকবিরূন’ (যখন উহাদিগকে বলা হয়, তোমরা আইস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিবেন’ তখন উহারা মাথা ফিরাইয়া লয় এবং তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাও, উহারা দম্ভভরে ফিরিয়া যায়) (৬৩ঃ৬)। বর্ণিত আছে, ইবনে উবাইয়ের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ ছিলেন খাঁটি ইমানদার। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুসলিমবাহিনী প্রত্যাবর্তনকালে আকীক নামক উপত্যকায় তিনি তাঁর পিতার পথরোধ করে দাঁড়ালেন। তার ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, বলো, আদমসন্তানগণের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত মোহাম্মদ, আর সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে অপদস্থ ব্যক্তি তুমি। এ দৃশ্য দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন, পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে তার পথরোধ করে আছেন। পিতা বলে যাচ্ছে, আমি শিশুদের চেয়ে নিকৃষ্ট। নারীদের চেয়ে অধম। রসুলেপাক স. বললেন, ছেড়ে দাও। তাকে অগ্রসর হতে দাও। এবার পুত্র তার পিতার পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন।

জীবনীপ্রণেতাগণ বলেছেন, বনী মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনায় প্রবল ধূলিঝড় উঠলো। মানুষ মনে করলো, মদীনায় শত্রুদল হামলা করেছে এবং লুট-তরাজ চালাচ্ছে। রসুলেপাক স. বললেন, ভয় কোরো না, সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ থেকে মদীনা সুরক্ষিত। মদীনার এমন কোনো প্রান্ত কোনো অলি-গলি নেই, যেখানে ফেরেশতারা পাহারা না দিচ্ছে। আজ মদীনায়

এক বড় মুনাফিকের মৃত্যু হয়েছে। ওই মুনাফিকটির নাম ছিলো যায়েদ ইবনে রেফাআ। সে ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের বন্ধু। তার মৃত্যুতে ইবনে উবাই খুব দুঃখ পেয়েছিলো। হাদিস শরীফে এরকম বর্ণনা এসেছে। তবে এই বিষয়টি বোধগম্যের অন্তরালেই রয়ে গেলো যে, ধূলিঝড়ের সঙ্গে লুট-তরাজের কী সম্পর্ক ছিলো। তাছাড়া এটাও বোঝার উপায় নেই যে, মুনাফিকের মৃত্যুর সাথে ধূলিঝড়ের সম্পর্কই বা কী? আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন। এ যুদ্ধে রসুলেপাক স. আটাশ দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

তায়াম্মুমের আয়াত

এ বৎসরেই তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমরা রসুলুল্লাহ্ স. এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম— এর পরে তিনি তায়াম্মুমের আয়াত সংক্রান্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। 'ফতহুল বারী'তে ইবনে আবদুল বার থেকে বর্ণিত হয়েছে, তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছিলো বনী মুস্তালিক যুদ্ধ চলাকালে। ইবনে সাআদ এবং ইবনে হেব্বান এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

হার হারানোর ঘটনা

'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, বনী মুস্তালিক সফরে অথবা অন্য কোনো এক সফরে উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার গলার হার হারিয়ে যায়। স্থানটি ছিলো মদীনার নিকটবর্তী। নাম সুলসুল। হার হারিয়ে যাওয়ার কারণে রসুলেপাক স. সেখানে বিলম্ব করেছিলেন। সেখানে কোনো পানির ব্যবস্থা ছিলো না। নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হলো। কেউ কেউ হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ব্যাপারে অনুযোগ করলেন। বললেন, তাঁর কারণেই বিপদে পড়তে হলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে গেলেন। দেখলেন, রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর কোলে মাথা রেখে আরাম করছেন। তিনি রোষান্বিত অভিব্যক্তি নিয়ে তাঁর কন্যার কটিদেশে হাত দ্বারা আঘাত করলেন। কিন্তু হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রসুলুল্লাহ্ স. এর বিশ্রাম বিঘ্নিত হওয়ার ভয়ে নড়াচড়া করলেন না।

সকাল হয়ে গেলো। আল্লাহ্তায়ালা দয়াপরবশ হয়ে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। সাহাবীগণ তায়াম্মুম করে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। হজরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের বললেন, হে আবু বকরের ফরযন্দ! এটাইকি তোমাদের সর্বপ্রথম বরকত? একথার অর্থ— তোমাদের মাধ্যমে মুসলমানদের

অনেক বরকত লাভ হয়েছে (এটাই সর্বপ্রথম নয়)। হজরত আয়েশা বলেছেন, তারপর যাত্রাকালে যখন উটকে ওঠানো হলো, তখন উটের শরীরের নিচ থেকে হার বেরিয়ে এলো। মনে হয় এর মধ্যে নিহিত ছিলো আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ হেকমত। শরীয়তের বিধানকে অধিকতর সহজসাধ্য করাই হয়তো আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্য ছিলো। তাই তিনিই এ ঘটনার অবতারণা ঘটিয়েছেন।

আযলের মাসআলা

বনী মুসতালিক যুদ্ধে মুসলমানগণ অনেক ক্রীতদাসী লাভ করেছিলেন। দীর্ঘদিন আপন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তাঁদের মধ্যে যৌনবাসনা তীব্র হয়ে উঠেছিলো। তাই তাঁরা ওই ক্রীতদাসীদের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং আযল করতেন। আযল অর্থ সঙ্গমকালে স্ত্রীঅঙ্গের বাইরে বীর্যস্খলন। উদ্দেশ্য গর্ভনিরোধন। সাহাবাকেরাম বলেন, রসুলেপাক স. আমাদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁকে না জিজ্ঞেস করেই আযল করে যাচ্ছিলাম। পরে আমরা তাঁর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলাম। তিনি স. বললেন, আযল করো আর নাই করো, যে আসবার সে এসেই যাবে। এ কথার দ্বারা বৈধ-অবৈধতার স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। তাই ফেকাহ্ এর মাযহাব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ক্রীতদাসীর সঙ্গে আযল করা জায়েয, কিন্তু স্বাধীনাগণের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুমতি ছাড়া আযল করা জায়েয নয়। আর কেউ যদি কোনো ক্রীতদাসীকে বিবাহ করে, তবে তার প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে তার সঙ্গে স্বামীর আযল করা জায়েয হবে না।

ইফকের ঘটনা

বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময়েই উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ইফকের ঘটনা সংঘটিত হয়। ইফক অর্থ মিথ্যা। কেউ কেউ বলেছেন, ইফক অর্থ চরম মিথ্যা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, অপবাদ। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ইফকের ঘটনা বড়ই বেদনাদায়ক। সহীহ্ বোখারীতে এ ঘটনার বর্ণনা বিভিন্নভাবে এসেছে। 'গাযওয়া' অধ্যায়ে একটি বর্ণনা এসেছে, যার বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা হবে। তার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা অন্যান্য অধ্যায় থেকেও সংযোজন করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে শিহাব জুহুরী উরওয়া এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলেপাক স. কোনো সফরে যাত্রা করার পূর্বে লটারীর মাধ্যমে তাঁর সফরসঙ্গিনী নির্ধারণ করতেন। লটারীতে যাঁর নাম আসতো, তিনিই হতেন তাঁর সফরসঙ্গিনী। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, ওই যুদ্ধেও তিনি লটারী করলেন, যে যুদ্ধে তিনিই ছিলেন সর্বাধিনায়ক।

বোখারীর হাদিসে বর্ণনাটি এসেছে অস্পষ্টভাবে। তবে হাদিসব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, ওই যুদ্ধ ছিলো বনী কুরায়জা অথবা বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ। জননী আয়েশা বলেন, লটারীতে আমার নাম উঠলো। তাই তখন আমিই হলাম তাঁর সফরসঙ্গিনী। ইতোমধ্যে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমার জন্য উটের পিঠে হাওদা বসানো হলো। আমি সে হাওদার ভিতরে বসে অনেক পথ অতিক্রম করলাম। যুদ্ধ শেষ হলো। প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানে যাত্রাবিরতি করা হলো। সেখান থেকে রাতেই রওয়ানা হবেন বলে রসুলেপাক স. সহযাত্রীদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। ঘোষণার পর আমি হাওদা থেকে নেমে এলাম। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে একাই একদিকে বেরিয়ে গেলাম এবং কার্য সমাধার পর দেখলাম গলা খালি খালি লাগছে। হাত দিয়ে দেখলাম, হার নেই। মনে হলো কোথাও হয়তো ছিঁড়ে পড়ে গেছে। আমি পুনরায় সেখানে গেলাম। সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হারটি পেলাম না। এদিকে অনেক বিলম্ব হয়ে গেলো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা আরো বলেন, ইতোমধ্যে হাওদা বহনকারীরা আমার হাওদাটি উঠিয়ে উটের উপর রেখে দিলো। তারা ধারণা করলো, আমি সম্ভবত হাওদার ভিতরেই আছি। আমি ছিলাম হালকা পাতলা। তাই তারা আমার অনুপস্থিতির বিষয়টি টের পেলো না। আমার হাওদাটি উটের উপর বসিয়ে দেওয়ার পর উট চলতে শুরু করলো। আমি সেখানে গিয়ে কাউকে পেলাম না। বাধ্য হয়ে একা বসে রইলাম। ভাবলাম, হাওদায় যখন আমাকে পাওয়া যাবে না, তখন নিশ্চয়ই আমাকে কেউ খুঁজতে আসবে। বসে থাকতে থাকতে নিদ্রাক্রান্ত হলাম। একসময় ঘুমিয়েও পড়লাম। সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল সুলানী নামক এক ব্যক্তির দায়িত্ব ছিলো লশ্করের পিছনে পিছনে থাকা। সৈন্যরা কাপড়-চোপড় বা তৈজসপত্র ফেলে গেলে তা কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। ভোরের আলো যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন সফওয়ান আমাকে দেখে ফেললো। প্রথমে ভাবলো, আমি হয়তো কোনো সৈন্য। ঘুমিয়ে থাকার কারণে পিছনে পড়ে গিয়েছি। একটু পরে সে আমাকে চিনতে পারলো। কারণ পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেছিলো। সে আমাকে চিনতে পারা মাত্রই বলে উঠলো 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন'। সফওয়ান ইবনে মুআত্তালের ইন্না লিল্লাহ্ পাঠ করার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার এভাবে মরুভূমিতে একা পড়ে থাকাটা ছিলো একটি বিরাট মুসিবত। তাই তিনি ইন্নালিল্লাহ্ পাঠ করেছিলেন। অথবা তাঁর কারণে মুসলমানদের বিরাট মুসিবতের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। কিংবা তাঁর হয়তো কোনো আপদ ও ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত সফওয়ান মনে করেছিলেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা ইনতেকাল করেছেন। তাই তিনি ইন্নালিল্লাহ্ পাঠ করেছিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, সফওয়ানের ইন্নালিল্লাহ্ পাঠের শব্দে

আমার ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙতেই আমি উঠে বসলাম। মুখ ঢেকে নিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি ইন্নালিল্লাহ্‌ পাঠ করা ছাড়া আমার সঙ্গে আর একটি কথাও বলেননি। একটি শব্দও আমি তার কাছ থেকে শুনিনি। সফওয়ান তার উট আমার কাছে আনলেন। উটটিকে বসালেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং উটের পিঠে আরোহণ করলাম। তিনি উটের রশি ধরে হেঁটে চললেন। এভাবে একসময় আমরা আমাদের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন সকলে ছিলেন বিশ্রামরত। আমি মুনাফিকদের একটি দলের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে ছিলো আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীরা। তারা আমার সম্পর্কে যা বলার বললো এবং যারা ধ্বংস হওয়ার, তারা ধ্বংস হয়ে গেলো।

এই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে সবচেয়ে বেশী রটনা করেছিলো আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। সে অতি উৎসাহের সঙ্গে আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ ছড়াতে লাগলো। এভাবে মানুষকে নিপতিত করতে লাগলো ভিত্তিহীন জল্পনা-কল্পনায় ও দ্বিধা-সন্দেহে। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, কতিপয় মুসলমানও এ বিষয়ে মুনাফিকদের সুরে সুর মিলালো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হজরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত, মেতাহ ইবনে আছাছা, যিনি ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খালাতো বোনের পুত্র। আরো ছিলেন হজরত হেমনা বিনতে জাহাশ, উম্মুল মুমিনীন হজরত যয়নব বিনতে জাহাশের বোন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরও কিছু লোক, যাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত উরওয়া বলেন, তাদের নাম আমার মনে নেই। তবে শুধু এতোটুকু বলতে পারি যে, তারা ছিলো এক উসবা। যেমন কোরআন পাকে বলা হয়েছে— 'ইন্নাল লাজীনা জ্বাউ বিল্‌ইফকি উ'সবাতুম মিনকুম' (যাহারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদেরই একটি দল;) (২৪ঃ১১)। আরবীতে দশ থেকে চল্লিশজন লোকের দলকে উসবা বলা হয়।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, মদীনায় পৌঁছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। পুরো এক মাস অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলাম। মিথ্যা রটনাকারীরা আমার নামে অপপ্রচার চালিয়েই গেলো। মানুষের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। অথচ আমি তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলাম না। কিন্তু রসুলুল্লাহ্‌র স্বভাবে-আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। অসুস্থতার জন্য তিনি আমার প্রতি কোনো সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন না। আমি এর কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। কেবল চিন্তিত ও মর্মাহত হলাম।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, তিনি গৃহে প্রবেশ করে গৃহবাসীদেরকে সালাম করতেন। তাঁর স্বভাব এরকমই ছিলো। এরপর হয়তো জিজ্ঞেস করতেন, ওমুক মহিলা কেমন আছে? একবার কেবল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছো? বাস, এতোটুকুই। এভাবে ঘরে প্রবেশ করে পরক্ষণেই চলে যেতেন। আমার

কাছে আসতেন না। বসতেনও না। তাঁর এহেন নির্লিপ্তি আমার হৃদয়কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতো। অথচ প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমার কোনো অবগতিই ছিলো না। এভাবে চলতে থাকায় আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেলো। এক রাতে আমি মেসতাহর মায়ের সঙ্গে মানাসার দিকে গেলাম। যেস্থানে প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদন করা হয়, সে স্থানকে বলে মানাসা। আরব দেশে তখন শৌচাগারেরর প্রচলন ছিলো না। লোকেরা খোলা ময়দানে প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদন করতো। আমি প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বের হলাম রাতে। ফেরার পথে মেসতাহর মায়ের পা তারই কাপড়ে জড়িয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, মেসতাহ ধ্বংস হোক, সে অধোবদনে ভূপাতিত হোক। আমি বললাম, যে ব্যক্তি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তাকে তুমি গালি দিচ্ছো কেনো? এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা তখন বলেছিলেন, যে প্রথম বারের হিজরতকারী, তাকে তুমি গালি দিচ্ছো? মেসতাহর মাতা তখন বললেন, হে অবুঝ বালিকা আয়েশা! আপনি কি শোনেননি, মেসতাহ আপনার নামে কী সব বলে বেড়াচ্ছে? তারপর তিনি সব কথা খুলে বললেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, তারপর আমার ব্যাধি আরও বেড়ে গেলো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, তার কথা শোনার পর আমার মাথার উপর ধোঁয়ার কুণ্ডলির মতো কী যেনো উড়তে লাগলো। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, রসুলুল্লাহ্ স. শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বললেন, এখন কেমন আছো? আমি বললাম, আপনি কি আমাকে পিত্রালয়ে যেতে দিবেন? আমার একথা বলার উদ্দেশ্য ছিলো, পিত্রালয়ে গিয়ে আমি হয়তো এ সম্পর্কে আরো বেশী কিছু জানতে পারবো। তিনি স. অনুমতি দিলেন। আমি পিত্রালয়ে গিয়ে আমার মাকে বললাম, একি শুনছি? মা বললেন, কন্যা! ধৈর্য ধারণ করো, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না। আল্লাহ্র শপথ! এমন স্ত্রী খুব কমই আছে, যে তোমার মতো সুন্দরী, চরিত্রবতী, মর্যাদাসম্পন্না, স্বামীর সঙ্গে গভীর ভালোবাসায় আবদ্ধা। তোমার সম্পর্কে লোকেরা নানা কথা তৈরী করেছে। মন্দলোক তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি তখন বললাম, লোকেরা কি সত্য সত্যই আমার নামে এসব বলেছে? এ সকল কথা কি রসুলুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছেছে? আমার পিতাও কি এগুলো শুনেছেন— বলেই কাঁদতে শুরু করলাম আমি। সারা রাত ধরে কাঁদলাম। সকাল হলো। তবুও আমার চোখের পানি বন্ধ হলো না। রাতে চোখে সুরমাও লাগাইনি। এক ফোঁটা ঘুমুতেও পারিনি। দিনও কাটলো এভাবে। চোখের পানি ঝরছে তো ঝরছেই। আমার পিতা অন্য কামরায় কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছিলেন। আমার কান্নার আওয়াজ উচ্চ হলে তিনিও কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, আয়েশা! ধৈর্য ধারণ করো। কেঁদো না। অপেক্ষা করো। দ্যাখো, আল্লাহ্তায়ালা কী সিদ্ধান্ত

দেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, রসুলুল্লাহ্ যখন আমার বিষয়ে পেরেশান হতেন এবং আমার দুরবস্থার কথা ভাবতেন, তখন তিনি অধিকাংশ সময় চিন্তিত হয়ে ঘরে বসে থাকতেন। ওহী নাযিল হওয়ার বিষয়টিও বিলম্বিত হচ্ছিলো। এমতাবস্থায় আলী ও উসামা বিন যায়েদের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। উসামা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনার পরিবার-পরিজনের মধ্যে মঙ্গল ও সৌন্দর্য ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। আলী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্তায়ালা আপনার সহধর্মিণীর অভাব রাখেননি। আপনার তো আরও অনেক সহধর্মিণী রয়েছেন। আপনি সে বান্দীর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। এ কথার দ্বারা তিনি হজরত বারীরার কাছে জিজ্ঞেস করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যিনি ছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার খাদেমা। অর্থাৎ তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। রসুলুল্লাহ্ হজরত বারীরাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, হে বারীরা! আয়েশার ব্যাপারে এমন কোনো কিছু কি দেখতে পেয়েছো, যা তোমার কাছে মনে হয়েছে সন্দেহজনক? বারীরা বললেন, শপথ ওই সত্তার যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর মধ্যে মন্দ কিছুই দেখিনি। আর তিনি তো অবুঝ কিশোরী। তাঁর অবস্থা হচ্ছে এরকম যে, তিনি ঘুমিয়ে থাকেন, আর ওদিকে বকরী এসে আটা খেয়ে চলে যায়। তিনি তা খেয়ালও রাখতে পারেন না। তার কথার স্পষ্ট অর্থ এই যে, বালিকাসুলভ অন্যমনস্কতা ব্যতীত তাঁর মধ্যে মন্দ বলতে আর কিছুই নেই। সহীহ্ বোখারীতে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো জীবনচরিতপ্রণেতা বলেছেন, রসুলেপাক স. এ ব্যাপারে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এবং হজরত ওছমান ইবনে আফফানের সঙ্গেও পরামর্শ করেছিলেন। তাঁরাও হজরত আলীর মতো জবাব দিয়েছিলেন। তবে হজরত ওমর ফারুক জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার পবিত্র শরীরে তো মাছিও বসে না, যেহেতু মাছি বসে অপবিত্র কোনোকিছুর উপর। তা হলে এটা কেমন করে হতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা এরকম বিষয় থেকে আপনাকে হেফাজত করবেন না, যা কথিত অপবিত্রতার চেয়েও অধিক জঘন্য। হজরত ওছমান বললেন, আপনার পবিত্র শরীরের ছায়া মাটিতেও পতিত হয় না। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে এভাবেই হেফাজত করেন। আর আপনার সম্মানিতা গৃহবাসিনীকে কি তিনি হেফাজত করবেন না? হজরত আলী বললেন, নামাজরত অবস্থায় আপনার পবিত্র পাদুকায় নাপাকী লেগে থাকাকে আল্লাহ্তায়ালা পছন্দ করেননি। আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সুতরাং নিশ্চিত থাকুন, এ বিষয়ের যথাঅবহিতিও নিশ্চয় অবতীর্ণ হবে। এ সকল মন্তব্য শুনে তিনি স. মসজিদে প্রবেশ করলেন। ভাষণ দিলেন। শেষে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছো, যে আমাকে সাহায্য করবে এবং ওই ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণে

এগিয়ে আসবে, যে আমার পরিবারকে কষ্ট দিয়েছে? আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিলো তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পবিত্রতা ছাড়া আর কিছু দেখিনি। লোকেরা যার সম্পর্কে বলছে, তার মধ্যেও অশুভ কিছু নেই। একথা দ্বারা তিনি সফওয়ান ইবনে মুআত্তালকে বোঝালেন। মুনাফিকরা তাঁকে অপকর্মের হোতা সাব্যস্ত করেছিলো। অথচ তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর উপরে অপবাদ আরোপের অবকাশই নেই। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাও একথা ভালো করে জানে। কিন্তু ইবনে উবাই যে চূড়ান্ত পর্যায়ের মুনাফিক, চরম স্তরের হিংসুক। তাই শয়তান তার জ্ঞানের চক্ষু সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখতে পেরেছিলো। ফলে জঘন্য মিথ্যা রটনা করতে সে এতোটুকুও দ্বিধান্বিত হয়নি। আর হেমনার এধরনের হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টিও বিস্ময়কর কিছু নয়। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, হজরত হাস্সান ও হজরত মেসতাহ এই দু'জন সাহাবীর তৎপরতার বিষয়টি। আল্লাহ্ই ভালো জানেন, কেনো যে তাঁরা এভাবে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছিলেন। এরপর অবশ্য তাঁরা খুবই অনুতপ্ত হন এবং খাঁটি তওবাও করেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিলো আউস গোত্রভূত। রসুলেপাক স. যখন তার সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলেন, তখন আউস গোত্রের নেতা হজরত সাআদ ইবনে মাআয উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনাকে সাহায্য করবো এবং তার প্রতিশোধ নিবো। অপবাদ রটনাকারী যদি আমাদের গোত্রের হয়, তাহলে আমি নিজ হাতে তার মস্তক ছেদন করবো। আর যদি সে আমাদের ভাইদের গোত্রের (খাযরাজ গোত্রের) হয়ে থাকে, তবে আপনি আমাকে হুকুম করবেন। আমি হুকুম পালন করবো। খাযরাজ গোত্রের নেতা হজরত সাআদ ইবনে উবাদা হজরত সাআদ ইবনে মাআযকে বললেন, তুমি অন্যায় কথা বলছো। তখন হজরত সাআদ ইবনে মাআযের চাচাতো ভাই হজরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের উঠে দাঁড়িয়ে হজরত সাআদ ইবনে উবাদাকে লক্ষ্য করে বললেন, অন্যায় কথা বলছো তুমি। তুমিই মুনাফিকের পক্ষ নিচ্ছো। অযথা কলহ করছো। এভাবে শয়তানের প্ররোচনায় আউস ও খাযরাজ গোত্রের পুরানো ঝগড়া মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার উপক্রম হলো। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে থামিয়ে দিলেন। তাঁরাও চুপ হয়ে গেলেন।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি আমার পিতৃগৃহে ছিলাম। সেখান থেকে সকলের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। কেবল কান্নাই আমার সাথী হলো। কাঁদতে কাঁদতে আমি শক্তিহীন হয়ে পড়লাম। মনে হলো, এ কান্না আমার কলিজাকে ছিঁড়ে ফেলবে। এভাবে দু'দিন দু'রাত অতিবাহিত হলো। জাগ্রত থাকা এবং কান্নাকাটি করা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ রইলো না। আমার পিতা-মাতা আমার সঙ্গে বসে রইলেন। আমি যখন কান্নায় ভেঙে পড়তাম, তখন তাঁরাও

আমার সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়তেন। একদিন আমার একান্ত অনুরক্তা এক আনসারী রমণী আমার কাছে এলেন। তিনিও কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সহসা রসুলুল্লাহ্ ঘরে প্রবেশ করলেন। সালাম দিলেন। আমার পাশে বসলেন। একমাস ধরে তিনি এভাবে আমার পাশে বসেননি। এই এক মাসের মধ্যে তাঁর কাছে কোনো ওহীও আসেনি। তিনি স. বললেন, কেমন আছো? আমার মাতা বললেন, আমাদের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। তিনি কলেমা শাহাদত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আয়েশা! আমার নিকট তোমার বিষয়ে এরকম এরকম কথা পৌঁছেছে। তুমি যদি সাধ্বী হও, তবে অচিরেই আল্লাহ্তায়ালা এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করবেন। যদি ভুল করে থাকো, তবে আল্লাহ্তায়ালার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গফুরুর রহীম। রসুলুল্লাহ্র কথা শুনে আমার চোখের পানি বন্ধ হয়ে গেলো। আমি তাঁর কথায় খুশির আভাষ পেলাম। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি তখন আমার পিতাকে বললাম, আমার পক্ষ থেকে রসুলুল্লাহ্র কথার জবাব দিন। আমার পিতা বললেন, আমি সাহস পাচ্ছি না। কী বলবো? তখন আমি আমার মাকে বললাম, রসুলুল্লাহ্ যা বললেন, তার উত্তর দিন। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে কথা বলবো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, তখন আমি নিজেই কথা বললাম। বললাম, আমি অল্পবয়স্কা। কোরআন মজীদও বেশী পড়িনি। আল্লাহ্র শপথ! আমার সম্পর্কে আপনি যা কিছু শুনেছেন, তা কি বিশ্বাস করেছেন? যদি করেন, তবে আমার কথায় আর আস্থা রাখবেন কীভাবে? আপনি তো কেবল চান, আমি আমার অপরাধ স্বীকার করি। অথচ আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন যে, আমি নির্দোষ। তাই আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আমাকে এখন ওরকম কথাই বলতে হবে, যেরকম বলেছিলেন আল্লাহ্র নবী ইউসুফ তাঁর প্রিয়তম পুত্রের অন্তর্ধানের পর। বলেছিলেন,— 'ফাসাবরুন জ্বামীলুন ওয়াল্লাহুল মুসতাআ'নু আলা মা তাসিফূন' (সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল) (১২:১৮)।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা তখন ছিলেন মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত। তাই হজরত ইয়াকুবের নাম স্মরণ করতে পারেননি। এক বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত ইয়াকুবের স্থলে হজরত ইউসুফের নামোচ্চারণ করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, নবী ইউসুফ বলেছেন 'ফাসাবরুন জামীল'। আবার কোনো কোনো সংকলনে আছে, ভুলবশতঃ তিনি ইয়াকুবের পিতা বলেছেন। তবে বোখারীর কোনো কোনো বিবরণে নবী ইয়াকুবের নামও এসেছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, এতোটুকু বলেই আমি আমার বচন স্থগিত করলাম। আল্লাহ্তায়ালার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম। কারণ তিনিই জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ পবিত্র। আমার দৃঢ় প্রতীতী ছিলো আল্লাহ্তায়ালা আমার পবিত্রতার বিষয়ে

বর্ণনা করবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! একথা আমার মনেও আসেনি যে, আমার সম্পর্কে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবে এবং তা কোরআন হিসেবে পাঠ করা হবে। এরকম সৌভাগ্যের কথা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। ধারণা ছিলো, আমার বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা হয়তো তাঁর রসুলকে কোনো স্বপ্ন দেখাবেন, যার মাধ্যমে বিষয়টির যথার্থতা তিনি জানতে পারবেন। আল্লাহ্‌র কসম! রসুল স. আমার কাছ থেকে উঠেও যেতে পারলেন না। মজলিস থেকে আমার পরিবারের কেউ কেউ চলে যাবার উপক্রম করলেন। এমন সময় রসুলুল্লাহ্‌র উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা প্রকাশ পেলো। তাঁর ললাটদেশে মোতির দানার মতো স্বেদবিন্দু দেখা দিলো। কিছুক্ষণ এভাবেই অতিবাহিত হলো। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে ফুটে উঠলো মৃদু হাসির আভা। বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার পবিত্রতার সংবাদ দিয়েছেন। অপবাদ থেকে তোমাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন। তোমার সম্পর্কে কোরআন নাযিল করেছেন। মা বললেন, ওঠো। আল্লাহ্‌র রসুলের কাছে যাও। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর কাছে যাবো না। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেন, পিতা তখন বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্‌র রসুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমি বললাম, না। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো কেবল ওই মহান প্রভুপালকের প্রতি, যিনি আমাকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছেন এবং আমার বিষয়ে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি তখন এরকম বলেছিলেন কেবল রমণীসুলভ অভিমান প্রকাশার্থে। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, তখন রসুলুল্লাহ আমার হাত ধরলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! মুনাফিক ও মিথ্যাবাদীদের মুখ কালো হলো। রসুলেপাক স. পাঠ করলেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। 'ইন্নাল লাজীনা জ্বাউ বিল ইফকি উ'সবাতুম মিনকুম লা তাহ্‌সাবূহু শাররাল লাকুম বাল হুয়া খাইরুল লাকুম' (যাহারা এই অপবাদ রচনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদেরই একটি দল; ইহাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিওনা; বরং ইহা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর) (২৪ঃ১১)

সদ্য অবতীর্ণ আয়াতগুচ্ছ পাঠ করে তিনি খুশি মনে মসজিদে চলে গেলেন। সাহাবাকেরামকে একত্রিত করে একটি ভাষণ দিলেন। ওই ভাষণের এক পর্যায়ে আয়াতগুচ্ছ পুনরায় পাঠ করে শোনালেন। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. যখন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার পবিত্রতা সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের পাঠ শেষ করলেন, তখন অপবাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ডাকা হলো। তাদের উপর অপবাদ রটনার শাস্তি প্রয়োগ করা হলো। প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হলো। শাস্তিপ্রাপ্তরা ছিলেন চারজন— হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত, হজরত মেসতাহ

ইবনে আছাছাহ, হজরত হেমনা বিনতে জাহাশ এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই। কোনো কোনো বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের শাস্তিপ্রাপ্তির উল্লেখ নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, রসুলুল্লাহ্ উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাশের নিকট আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি এ বিষয়ে কী জানো এবং কী মনে করো? যয়নব বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার কান ও চোখ হেফাযতে রয়েছে তাঁর সম্পর্কে কিছু শোনা ও দেখা থেকে। এখনও আমার কান ও চোখ নিরাপদ। আল্লাহ্র শপথ! তার ব্যাপারে যা দেখেছি এবং শুনেছি, তা ভালো ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, ইনি ওই যয়নব, যিনি সপত্নীগণের মধ্যে রূপে-গুণে নিজেকে আমার সমকক্ষ ভাবতেন। তবে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে আমার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা ও হিংসা করা থেকে হেফাজত করেছেন। তিনি আমার ব্যাপারে মুখ থেকে একটি মন্দ বাক্যও বের করেননি। কিন্তু তাঁর বোন হেমনা বিনতে জাহাশ একারণেই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলো। এরকম দুরভিসন্ধির কারণেই সে পৌঁছে গিয়েছিলো ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত ওরওয়া বলেন, যাঁকে জড়িয়ে এরকম অকথ্য কথা রটনা করা হলো, সেই সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল বলেছেন, সুবহানাল্লাহ্! শপথ ওই সত্তার, যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, আমি কখনোই কোনো নারীর আবরণ উন্মোচন করিনি। একথার অর্থ— নারীসম্ভোগের কোনো ঘটনাই তাঁর জীবনে নেই। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতালানী বলেছেন, এ কথা নির্ভরযোগ্যতার স্তরে পৌঁছেছে যে, হজরত সফওয়ান ছিলেন নপুংশক।

হজরত ওরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, সফওয়ান হাস্সান ইবনে ছাবেতকে মন্দ বলতেন। হজরত ওরওয়া বলেন, আমি একবার হাস্সানকে জননী আয়েশা সিদ্দীকার সামনে গালমন্দ করলাম। জননী বললেন, তাকে গালি দিয়ো না। সে তো আল্লাহ্র রসুলের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে। পৌত্তলিকতার নিন্দা করে।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী) বলেন, হজরত হাস্সানের বিষয়টি বিস্ময়কর। রসুলেপাক স. তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'ইন্নাল্লাহা ইউআইয়িদু হাস্সানান বিরূহিল কুদুস মা দামা ইউনাফিখু আর্ রসূলিল্লাহি' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা হাস্সানকে জিবরাইল ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন, যতক্ষণ সে আল্লাহ্র রসুলের পক্ষ থেকে কাফেরদের সঙ্গে বাকযুদ্ধ করবে)। এরপরেও তিনি যে কীভাবে এ ধরনের প্রবৃত্তির খপ্পরে পড়লেন এবং শয়তানের ধূম্রজালে জড়িয়ে গেলেন। অবশ্য হাদিস শরীফে হজরত জিবরাইলের সাহায্যের কথা বলা হয়েছে এই শর্তসহযোগে যে, তিনি সাহায্য পাবেন তখনই, যখন

কাফেরদের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হবেন। তাঁর সকল অবস্থা এরকম হবে না। কাব্যচর্চায় অতিরঞ্জন তো আছেই। তাই ভাবতে হয় কাব্যচর্চাই কি তাঁকে এরকম মন্দের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো? নাঊযু বিল্লাহি মিন জালিক।

জীবনচরিতরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, এ ঘটনার পর হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গিয়েছিলেন এই আশায় যে, অতীতের অন্যায়ের সামান্যতম ক্ষতিপূরণও যদি এতে হয়। অবশ্য ভুল ও অন্যায়ের প্রকৃত প্রতিকারের উপায় এটা নয়। আত্মসংশোধনের প্রকৃত উপায় হচ্ছে সলজ্জিত ও সানুতপ্ত প্রত্যাবর্তন (তওবা)। স্বনামধন্য তাবেয়ী মাসরুক ছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার অনেক হাদিসের বর্ণনাকারী। তিনি বর্ণনা করেছেন, পরবর্তীতে হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি কবিতার কিয়দংশের সারমর্ম এরকম— সাইয়্যেদা আয়েশা নিষ্পাপ, পুতঃপবিত্রা, মর্যাদাসম্পন্না, বুদ্ধিমতী এবং দূরদর্শিনী, সন্দেহ ও অপবাদের ঊর্ধ্বে। তিনি ভুলক্রমেও কখনও কোনো রমণীর গোশত ভক্ষণ করেননি। অর্থাৎ কোনোপ্রকার গীবত করেননি। কোরআন মজীদে গীবত করাকে মুসলমান ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে এরকম— 'আইউহিব্বু আহাদুকুম আইঁ ইয়া'কুলা লাহমা আখীহি মাইতা' (তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাইতে চাহিবে?) (৪৯ঃ১২)। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, 'লাকিন্নাকা লাসতা কাজালিকা' (হাস্‌সান! তুমি কিন্তু সেরকম নও)। অর্থাৎ তুমি অন্যান্য রটনাকারীদের মতো নও। মাসরুক বলেন, আমি হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে জিজ্ঞেস করলাম, এতোকিছুর পরেও আপনি হাস্‌সান ইবনে ছাবেতকে আপনার দরবারে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন কেমন করে? অথচ আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন— 'ওয়াল্ লাজী তাওয়াল্লা কিবরাহু মিনহুম লাহু আ'যাবুন আলীম' (এবং উহাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি) (২৪ঃ১১)। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, অন্ধ হয়ে যাওয়ার চেয়ে অধিক কঠিন পার্থিব শাস্তি আর কী হতে পারে? উল্লেখ্য, ওই ঘটনার পর হজরত হাস্‌সান অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যদর্শন করতে অসমর্থ হয়েছিলেন বলেই হয়তো তাঁকে ওই শাস্তি বরণ করে নিতে হয়েছিলো।

মেসতাহ্ ইবনে আছাছা ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খালাত বোনের ছেলে। শিশুকালেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। হজরত আবু বকর সিদ্দীকই তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। তিনি তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতেন এবং তার খাওয়াপরার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু তিনি যখন ইফকের অপবাদে ইবনে উবাইয়ের

অনুসরণ করলেন, হজরত আবু বকর কসম করে বললেন, মেসতাহকে তিনি আর আর্থিক সহায়তা দিবেন না। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত— 'ওয়ালা ইয়া'তালি উলুল ফাদ্বলি মিনকুম ওয়াস্ সাআ'তি আইঁ ইউ্তূ উলিল ক্বুরবা ওয়াল মাসাকীন ওয়াল মুহাজ্বিরীনা ফী সাবীলিল্লাহি' (তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যাহারা হিজরত করিয়াছে তাহাদিগকে কিছুই দিবে না) (২৪ঃ২২)। একথার অর্থ—নিকটজন, মিসকিন, অভাবী ও আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরতকারীদের জন্য অর্থ ব্যয় না করার শপথ করা ঠিক নয়। মেসতাহ ছিলেন মিসকীন এবং মুহাজির। এ ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা আরো বলেন— 'ওয়াল ইয়া'ফূ ওয়াল ইয়াস্ফাহূ আলা তুহিব্বূনা আইঁ ইয়াগ্ফিরাল্লাহু লাকুম ওয়াল্লাহু গফূরুর রহীম' (তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমারা কি চাহনা যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) (২৪ঃ২২)। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, আল্লাহ্র বাণী সত্য। আমার প্রভুপালক যা পছন্দ করেন, আমিও তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হজরত মেসতাহর দৈনিক ভাতা পুনরায় চালু করে দিলেন। বললেন, এই সহায়তা আমি আর বন্ধ করবো না।

মাশায়েখগণ বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতের অনুরাগী মানুষ সাধারণতঃ চার প্রকারের— ১. নিরপরাধ মানুষকে অযথা কষ্ট দেয়। এ শ্রেণীটি নিকৃষ্টতম, বরং এরা মানুষই নয়। ২. যে বদলা গ্রহণ করতে যেয়ে মানুষকে কষ্ট দেয় এবং শরীয়তের ঘোষণা অনুযায়ী যথা শাস্তি দেয়। এরা সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান। ৩. যে ক্ষমা করে। কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার প্রতি প্রতিশোধের হাত বাড়ায় না। বিশেষ মর্যাদার মুসলমানের স্বভাব এরকম। ৪. যে দুর্ব্যবহার পেয়েও ভালো ব্যবহার করে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও অন্যায়কারীর প্রতি সদাচরণ করে। আবার তার উপকার করে। এরা বিশেষতম ব্যক্তি। সিদ্দীকগণের দলভূত কামালিয়াতের স্তর থেকে তাঁরা কখনই বাহিষ্কৃত হন না।

হজরত মেসতাহর অবস্থাও ছিলো তদ্রূপ। তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী, তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সহায় হয়েছেন। হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা বলেন— 'ইন্নাল্লাহা আত্বত্বলাআ' আ'লা আহলি বাদ্রিন ফাক্বালা ই'মালূ মা শি'তুম ক্বাদ গাফারতু লাকুমূ' (নিশ্চয়ই বদরযোদ্ধাগণকে আল্লাহ্তায়ালা জেনে নিয়েছেন। বলেছেন তোমরা যাই করো না কেনো আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম)। আর সে কারণেই হজরত আয়েশা সিদ্দিকা হজরত মেসতাহর মাকে

বলেছিলেন তুমি ওই ব্যক্তিকে তিরস্কার করছো, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত অবশ্য মনে করেন উপরোক্ত আয়াতে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের মর্যাদাই প্রকাশ পেয়েছে।

সন্দেহ নিরসন

কেউ কেউ ধারণা করেন, হজরত আলী ইফকের ঘটনায় রসুলেপাক স.কে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্পাকই অবগত। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে দেখা যায়, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এবং হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফান তখন কিছুটা অস্পষ্টভাবে হলেও রসুলুল্লাহ্ স.কে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হজরত আলী সে রকম করেননি। কিন্তু তাঁর থেকে না'লাইন শরীফের ঘটনাও উল্লেখিত হয়েছে। ইফকের ঘটনার প্রথম দিকে রসুলেপাক স. তাঁর সঙ্গে এবং হজরত উসামা ইবনে যায়েদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তো আপনাকে কোনো সংকীর্ণতায় আবদ্ধ রাখেননি। হজরত আয়েশা ছাড়া আপনার তো আরও অনেক পত্নী রয়েছেন। তাঁদের সকলের কথার মূল উদ্দেশ্য ছিলো রসুলুল্লাহ্ স.কে সান্ত্বনা প্রদান করা। দুশ্চিন্তা দূর করা। আল্লাহ্র রসুলের প্রতি অগাধ ভালোবাসার কারণেই তারা তাঁকে ওভাবে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, রসুলেপাক স. এর প্রতি তাঁদের যেরূপ ভালোবাসা ছিলো, হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি সেরূপ ছিলো না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি রসুলুল্লাহ্ স. ও জননী আয়েশার দাম্পত্যসম্পর্কের পবিত্রতাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না কেনো? হজরত আলী আমাদের রীতি অনুসারে কথা বলেছেন। বলেছেন 'লা, ওয়াল্লাহি' এ ব্যাপারে হজরত আলী বারীরাকে জিজ্ঞেস করার কথাও বলেছেন। কেননা তিনি তাঁর সঙ্গে রাত যাপন করতেন। সুতরাং তিনিই এ সম্পর্কে ভালো বলতে পারবেন। রসুলেপাক স. যখন সাহাবাকেরামের কাছে পরামর্শ চাইলেন, তখন সকল সাহাবীই হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কল্যাণ ও সৌন্দর্যের বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন। এরকম আরো অনেক হাদিস রয়েছে। তার মধ্য থেকে সহীহ্ গ্রন্থসমূহের বর্ণিত হাদিসগুলিই আমি এখানে সন্নিবেশিত করলাম। এমতো সন্নিবেশন ছাড়া আমার আর কোনো দায়িত্বও আসলে নেই। সকল যিম্মাদারী বর্ণনাকারীগণের। নবীপরিবারের প্রতি বিশুদ্ধ ভালোবাসা এবং পরিশুদ্ধ উদ্দেশ্যই আমার সম্বল। ইফকের ঘটনা সম্পর্কে জুহুরী থেকে বর্ণিত হাদিস সংকলন করেছেন ইমাম বোখারী। বর্ণিত আছে, জুহরী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী। তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ের সকল হাদিস একত্রিত করে তিনি একটি সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া আরেকটি বিবরণে তিনি বলেছেন, আমাকে ওলীদ ইবনে

আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান একবার প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছে এমন কোনো হাদিস কি পৌঁছেছে, যা থেকে মনে হয় হজরত আলীও জননী আয়েশার উপরে অপবাদ আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? আমি বললাম, না। তবে আমার কাছে এ ব্যাপারে একটি সংবাদ দিয়েছেন তোমাদের সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি— আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারেছ ইবনে হেশাম। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তিনি একজন বড় আলেমও। মদীনার সাতজন ফকীহ'র মধ্যে তিনিও একজন। আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানও প্রখ্যাত আলেম ও মদীনার সপ্ত ফকীহ'র অন্যতম। জুহুরী বলেন, তাঁরা উভয়েই আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আলী আমার বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। আবু যর, যিনি বোখারীর বর্ণনাকারীগণের অন্যতম, তিনি বলেছেন, হজরত আলী এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। বোখারীর আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, অন্তিমযাত্রার কালে রসুলুল্লাহ্‌র শরীর মোবারক যখন ভার হয়ে গেলো এবং রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেলো তখন আমি তাঁর অন্যান্য বিবিগণকে তাঁদের পালা প্রত্যাহার করে নিতে বললাম। তিনিও তাঁদের কাছে অনুমতি চাইলেন; যাতে তিনি কেবল আমার কাছেই থাকতে পারেন। আমিও যেনো পূর্ণ সময় তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি। সকলেই তাঁদের পালা প্রত্যাহার করে নিলেন। কেবল আমার কক্ষে থাকার অনুমতি দিলেন। প্রতিদিন তিনি স. আমার প্রকোষ্ঠ থেকে দু'জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে যেতেন। শরীরের পুরোপুরি ভার ওই দু'জনের কাঁধেই থাকতো। তাঁর পবিত্র পদযুগল মাটিতে কোনোরকমে চলতো। ওই দু'জন ছিলেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্য হজরত আব্বাস এবং তাঁর আহলে বাইতের মধ্য থেকে যে কোনো একজন। হাদিসের বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি যা কিছু হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছ থেকে শুনেছি, হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে তা-ই বর্ণনা করেছি। হজরত ইবনে আব্বাস একবার আমাকে বললেন, তুমি কি জানো, আহলে বাইতের ওই একজন কে ? জননী আয়েশা সিদ্দীকা কিন্তু তাঁর নাম বলেননি। আমি বললাম, আমি জানি না। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, তিনি ছিলেন হজরত আলী ইবনে আবী তালেব। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা হজরত আলীর নামোচ্চারণ কেনো করেননি— সে কথা নিয়ে মতপৃথকতা রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, তাঁদের মধ্যে সুক্ষ্ম মনোমালিন্য ছিলো। সেকারণেই জননী আয়েশা তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু সঠিক কারণ এটা নয়। তাঁর কথার অর্থ— হজরত আব্বাস নির্দিষ্ট ছিলেন। কিন্তু অপরজন নির্দিষ্ট ছিলেন না। কখনও থাকতেন হজরত আলী, আবার কখনও থাকতেন

হজরত ফযল ইবনে আব্বাস। আবার কখনও কখনও থাকতেন হজরত উসামা ইবনে যায়েদ। তাঁরা সকলেই আহলে বাইতের অন্তর্ভূত। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার নির্দিষ্ট করে কারো নাম না বলার কারণ আসলে এটাই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

খন্দক যুদ্ধ

হিজরতের পঞ্চম বৎসরের আরেকটি বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে খন্দক যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। তখন মদীনার চতুর্দিকে খন্দক বা পরিখা খনন করা হয়েছিলো বলেই এ যুদ্ধের নাম খন্দক যুদ্ধ। আর আহযাব বহুবচন 'হিযবুন' এর। 'হযবুন' অর্থ দল। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের লোক সম্মিলিত হয়ে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো। তাই এ যুদ্ধকে বলা হয় আহযাবের যুদ্ধ। আরব দেশে খন্দক খনন করার প্রচলন ছিলো না। খন্দক খনন করার প্রস্তাব দেন পারস্য দেশে জন্মগ্রহণকারী সাহাবী হজরত সালমান ফারসী। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করে শত্রুদেরকে ঠেকানো যায়। পারস্যে এই সমরকৌশলটির প্রচলন রয়েছে। রসুলেপাক স. তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সাহাবীগণকে মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করার নির্দেশ দিলেন। নিজেও এ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। তখন ক্ষুধার কারণে কখনো কখনো তাঁকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়েছিলো। খনন কাজে তিনি স. নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে সাহাবা কেরামের উৎসাহ-উদ্দীপনা গিয়েছিলো বেড়ে। সুরা আহযাবের প্রথম কিছু আয়াত এ বিষয়ে নাযিল হয়। এ যুদ্ধের সাল ও তারিখ নিয়ে জীবনীবিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুসা ইবনে উকবা বলেছেন, এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, পঞ্চম হিজরীতে। অন্যান্য ঐতিহাসিক এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বোখারী মুসা ইবনে উকবার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে দলিল হিসেবে নিয়েছেন হজরত ইবনে ওমরের হাদিসটিকে। তিনি উহুদ যুদ্ধের সময় রসুলেপাক স. সকাশে নিবেদন করেছিলেন, যেনো তাঁকে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁর বয়স ছিলো চৌদ্দ বৎসর। রসুলেপাক স. তাঁকে ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেননি। খন্দক যুদ্ধে তিনি অনুমতি পেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স পনেরো বৎসর পূর্ণ হয়েছিলো। সুতরাং জানা গেলো, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক বৎসরের বেশী ছিলো না। উহুদের যুদ্ধ তৃতীয় বৎসরে সংঘটিত হয়েছিলো। সুতরাং খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো চতুর্থ বৎসরে। তাঁর এ দলিলটি পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা এ বিষয়টি সুসাব্যস্ত যে, খন্দক যুদ্ধ পঞ্চম বৎসরেই সংঘটিত হয়েছিলো। এমনও হতে পারে যে, হজরত ইবনে ওমর

উহুদ যুদ্ধের সময় চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করেছিলেন আর খন্দকের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স পনেরো বৎসর পূর্ণ হয়েছিলো। বায়হাকী এরকম বলেছেন। শায়েখ ওলীউদ্দীন ইরাকী বলেছেন, প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, এ যুদ্ধ চতুর্থ বৎসরই হয়েছিলো। তবে আমরা যেহেতু 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকের অনুসরণ করে সন নির্ধারণ করেছি, আর তিনি যেহেতু পঞ্চম বৎসরই লিখেছেন, তাই আমরা এ যুদ্ধ পঞ্চম বৎসরে সংঘটিত হওয়ার পক্ষে।

যুদ্ধের পটভূমি

রসুলেপাক স. ইহুদী বনী নাযীরের একটি দলকে দেশান্তরিত করলেন। দেশান্তরিত ইহুদীরা বিভিন্ন শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করলো। একটি ছোট্টদল বসতি স্থাপন করলো খায়বরে। তারা সেখান থেকে মক্কায় গিয়ে কুরায়েশদের কাছে বললো, আমরাও মোহাম্মদের বিরুদ্ধে। আমরা তোমাদের মিত্র হতে চাই। তখন আবু সুফিয়ান বললো, মারহাবান বিকুম ওয়া আহলান। আমাদের কাছে এর চেয়ে পছন্দনীয় আর কোন বিষয় হতে পারে যে, তোমরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করবে। তারা কাবাগৃহের গিলাফের কাছে গেলো এবং অঙ্গীকার করলো। আবু সুফিয়ান বললো, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা তো আহলে কিতাব। তোমাদের মধ্যে তোমাদের উলামা ও আহবার রয়েছেন। তোমরা বলো তো দেখি কার ধর্ম শ্রেষ্ঠ? আমাদের, না মোহাম্মদের? আমরা তো কাবাগৃহ আবাদ রাখার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। উঁচু উঁচু পৃষ্ঠধারী উট যবেহ করে মেহমানদারী করে যাচ্ছি। বাইতুল্লাহ্‌র হাজীদের পানাহার এবং দুধ সরবরাহ করে যাচ্ছি। আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের প্রদর্শিত ধর্মানুসারে মূর্তিসমূহের পূজাও করে যাচ্ছি। এখন মোহাম্মদ নতুন ধর্মের প্রকাশ ঘটিয়েছে। নতুন নতুন কথার উদ্ভব করেছে। এখন বলো, আমরা সঠিক পথে আছি, না মোহাম্মদ? ইহুদী সম্প্রদায়, যারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই বিক্রি করে দিয়েছিলো, তারা বললো, তোমরাই সঠিক পথে আছো। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হয়—'আলাম তারা ইলাল্ লাজীনা উতূ নাসীবাম্ মিনাল কিতাবি ইউ'মিনূনা বিল্ জ্বিবতি ওয়াত্ব ত্বগূতি ওয়া ইয়াকূলূনা লিল লাজীনা কাফারূ হাউলাই আহদা মিনাল্ লাজীনা আমানূ সাবীলা উলাইকাল লাজীনা লাআ'নাহুমুল্লাহু ওয়া মাইঁ ইয়াল আ'নিল্লাহু ফালান তাজ্বিদা লাহু নাসীরা' (তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল; তাহারা জিব্‌ত ও তাগুতে বিশ্বাস করে; তাহারা সত্যপ্রত্যাখানকারীদিগের সম্বন্ধে বলে যে, ইহাদের পথ বিশ্বাসীদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ যাহাকে অভিসম্স্লাত করেন, তুমি কখনও তাহার কোনো সাহায্যকারী পাইবে না) (৪ঃ৫১-৫২)।

ইহুদীরা কুরায়েশদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে গেলো গাতফান গোত্রের বসতিতে। তাদেরকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করলো। চুক্তি করলো এই মর্মে যে, তারা খায়বরের এক বৎসরের উৎপাদিত খেজুর গাতফান গোত্রের লোকদেরকে দান করবে। তারপর কুরায়েশদের সৈন্যবাহিনী বের হলো। সে বাহিনীর সেনাপতি হলো আবু সুফিয়ান ইবনে হারব। তার সঙ্গে ছিলো তিনশ' ঘোড়া ও একহাজার উট। মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলো তাদের সৈন্যবাহিনী। মাররুয্‌যাহরান নামক জায়গায় আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোক তাদের সঙ্গে যোগ দিলো। ওই গোত্রগুলির নাম আসলাম, আশজা, আবু মুররা, কেনানা, ফারাযা এবং গাতফান। বিশাল বাহিনী প্রস্তুত হলো। সংখ্যা দাঁড়ালো দশ হাজারে। বিপরীত পক্ষে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র তিন হাজার। ঘোড়া ছিলো মাত্র ছত্রিশটি। রসুলেপাক স. মুহাজির ও আনসারদেরকে ডাকলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালেন। পরামর্শসভায় হজরত সালমান ফারসীর পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত হলো, পরিখা খনন করতে হবে। রসুলেপাক স. খননের স্থানসমূহ চিহ্নিত করে দিলেন। মদীনার কোনো কোনো দিক দালান কোঠা ও হাটবাজার দ্বারা সুরক্ষিত ছিলো। সুতরাং পূর্ব দিকে সেলা পাহাড়ের দিকে যে সকল স্থান ফাঁকা ছিলো, সে সকল স্থানে পরিখা খনন করার জন্য বাছাই করা হলো। মুসলিমবাহিনীর একটি দলকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো সেলা পাহাড়ের পাদদেশে। সেখানে একস্থানে রসুলেপাক স. এর জন্য লাল রঙের চামড়ার তাবু স্থাপন করা হলো। প্রত্যেক দশ জনের জন্য চল্লিশ গজ করে পরিখা খনন করা হলো। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, প্রত্যেক দশজনের জন্য দশগজ করে ভাগ করা হয়েছিলো। হজরত সালমান ফারসী দশজনের সমান কাজ করে যাচ্ছিলেন। জীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেন, তিনি দৈনিক পাঁচগজ করে পরিখা খনন করতেন এবং তার গভীরতাও পাঁচগজ হতো। মুহাজির ও আনসারগণের সকলেই চাইলেন সালমান ফারসী তাঁদের দলে থাকুন। রসুলেপাক স. বলতেন, 'সালমানু মিন্না আহলিল বাইত (সালমান আমার আহলে বাইতভূত)।

জীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, কায়স ইবনে সা'সাআ নামক এক ব্যক্তির ছিলো নজর লাগার দোষ। সে একবার হজরত সালমান ফারসীকে বদ্‌নজর করলো। হাদিস শরীফে আছে, 'আল আইনু হাক্কুন' (নজর লাগা সত্য)। তাই হজরত সালমান ফারসী অসুস্থ হয়ে গেলেন। বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। রসুলেপাক স. এ সংবাদ শুনে বললেন, কায়স ইবনে সা'সাআকে ওজু করাতে হবে। ওজুতে ব্যবহৃত পানি একটি পাত্রে জমা করতে হবে। তারপর ওই পানি সালমানের শরীরে ঢেলে দিতে হবে। আর পাত্রটিকে ছিদ্র করে দিতে হবে পেছন থেকে। তাই করা হলো। হজরত সালমান ফারসী সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলেন।

এরকম আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো। আমের ইবনে রবীয়া সাহল ইবনে হানীফকে গোছল করতে দেখলেন। দেখা মাত্রই আমেরের শরীরে সাহলের নজর লেগে গেলো। তিনি বললেন, আমি এরকম সুন্দর ও মসৃণ শরীরওয়ালা কাউকেই কখনও দেখিনি। এমনকি পর্দানশীন কোনো মেয়েলোকও দেখিনি। আমের শুধু এতোটুকুই বললেন। তাতেই সাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলেন। লোকেরা রসুলেপাক স. এর কাছে গিয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। মাথা ওঠাতে পারছে না। তিনি স. বললেন, কেউ নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধে কিছু বলেছে। লোকেরা বললো, হাঁ। আমের এরকম করে বলেছে। তিনি স. বললেন, তোমরা আমেরকে গোছল করাও। তার মুখ ধৌত করাও, দু'হাত ও কনুই, দু'পা রানসহ, পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং লুঙ্গির অভ্যন্তরিস্থ স্থানও ধৌত করাও। তারপর সেই গোছলের পানি সাহলের শরীরে প্রবাহিত করে দাও। তাই করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

খন্দক যুদ্ধের বর্ণনায় আবার ফিরে আসা যাক। সাহাবাকেরাম পরিখা খননের কাজে মশগুল হয়ে গেলেন। খননের জিনিষপত্র যেমন কোদাল, খন্তা, হাতুড়ি, শাবল ইত্যাদি বনী কুরায়যার ইহুদীদের কাছ থেকে ধার করা হলো। বনী কুরায়যা তখন মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ছিলো। তখন পর্যন্ত সন্ধিচুক্তি মেনেও চলছিলো তারা। কুরায়েশদের মদীনা আক্রমণও তাদের পছন্দ ছিলো না। তখন খুব বেশী ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিলো। সাহাবাকেরাম ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁরা পরিখাখননের কাজে মশগুল ছিলেন। কাঁধে ও মাথায় করে মাটি বহন করে নিচ্ছিলেন। কাজ করানোর জন্য তাদের কোনো গোলাম ছিলো না। রসুলেপাক স. সাহাবাকেরামের এরূপ কষ্ট ও ক্ষুধার যন্ত্রণা দেখে উচ্চ আওয়াজে বলে যাচ্ছিলেন 'আল্লাহুম্মা লা আ'ইশা ইল্লাল আ'ইশাল আখিরাত ফাগফির লিল আনসারী ওয়াল মুহাজ্বির' (হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবন ছাড়া কোনো জীবন নেই। সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও)।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, উক্তিটি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহার। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী এবং কবি ছিলেন। রসুলুল্লাহ স. এর পবিত্র মুখ থেকে উক্ত কবিতার আবৃত্তি শোনার পর সাহাবাকেরাম উচ্চস্বরে বললেন, 'নাহনুল্ লাজীনা বাইয়া'না মুহাম্মাদান আ'লাজ্ব জ্বিহাদি মা বাক্বী'না আবাদা' (আমরা তো ওই সকল লোক যাঁরা মোহাম্মদের হাতে জেহাদের বায়াত গ্রহণ করেছি। আমরা যতোদিন বেঁচে থাকবো, ততোদিন জেহাদ করেই যাবো)। কোনো কোনো বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখ হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— 'ওয়াল আ'ন আদ্বলাওঁ ওয়া আনসারাহু হুম কাল্লাফূনা ছিক্বলাল হিজ্বারাহ' (আদল ও কারা গোত্র ও তাদের সাহায্যকারীদের উপর লানত বর্ষণ করো। তারা আমাদেরকে পাথর বহন করার কষ্ট দিয়েছে)। সহীহ্ বোখারীতে হজরত বারা ইবনে আজীব

থেকে বর্ণিত হয়েছে, আহ্যাব যুদ্ধের সময় রসুলেপাক স. স্বহস্তে পরিখা খনন করেছেন। লোকেরা দেখতে পেতো, তিনি স. গর্ত খনন ও মাটি বহন করছেন। আর তাঁর উদরদেশের শুভ্রতা পতিত মাটির কারণে ঢাকা পড়ে গেছে। রসুলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র শরীরে অনেক পশম ছিলো। তাও মাটিতে ঢেকে গিয়েছিলো। তিনি স. তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা রচিত এই কবিতাটি আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন—

আল্লাহুম্মা লাও লা আংতা মাহ্‌তাদাইনা ওয়ালা সদ্দাক্বনা ওয়ালা সল্লাইনা
ফাআংযিল সাকীনাতান আ'লাইনা ওয়া ছাব্বিতিল আক্বদামি আল্ লা ক্বীনা
আন্নাল ঊলা বাগাও আ'লাইনা ইন আরাদূ ফিতনাতান আবাইনা।

(হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমাদেরকে হেদায়েত না করতে তাহলে আমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতাম না। আমরা দানও করতাম না; নামাজও পড়তাম না। তুমি আমাদের উপর শান্তি নাযিল করো এবং আমাদের পদসমূহ সুদৃঢ় রেখে দিয়ো, যখন আমরা কাফেরদের মুখোমুখি হই। পূর্ববর্তীরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তারা যদি কোনো ফেতনার ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি)। তিনি স. 'আবাইনা' শব্দটি উচ্চারণ করছিলেন উচ্চস্বরে।

খন্দক যুদ্ধের সময় রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের অসংখ্য আলামত প্রকাশ পেয়েছিলো। তন্মধ্যে একটি ঘটনা এরকম— বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, আমরা পরিখা খনন করে যাচ্ছিলাম। সামনে পড়লো বিরাট একটি পাথর। কোনোক্রমেই পাথরটিকে সরানো যাচ্ছিলো না। উপর্যুপরি শাবল হাতুড়ি মেরেও কিছুই করা যাচ্ছিলো না। সাহাবাকেরাম রসুলেপাক স.কে সমস্যার কথা জানালেন। তিনি স. স্বয়ং শাবল হাতুড়ি নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। অথচ তখন ক্ষুধার তাড়নায় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিলো। প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার আমাদের পেটেও পড়েনি। তিনি স. হাতুড়ি দিয়ে উক্ত বিশাল পাথরের উপর একটি মাত্র আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি বালুকণায় পরিণত হয়ে গেলো। বর্ণনা করেছেন বোখারী। মসনদে আহমদ ও নাসায়ী পুস্তকে উত্তম সূত্রসহযোগে হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে যে বিবরণটি এসেছে, তা এরকম— তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্ যখন আমাদেরকে পরিখা খনন করার নির্দেশ দিলেন, তখন আমরা দেখলাম পাথরের এক প্রকাণ্ড চটান, যার উপর হাতুড়ি শাবল কিছুই কার্যকর হচ্ছে না। আমরা রসুল স.কে সমস্যার কথা জানালাম। তিনি এলেন। হাতুড়ি হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে ওই পাথরের উপর একটি আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার এক তৃতীয়াংশ ভেঙে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, আল্লাহু আকবার। আমাকে শাম দেশের চাবি দান করা হলো। আল্লাহর কসম! আমার এ আঘাতের ঝলকে শাম দেশের লাল রঙের বালাখানাগুলো দেখতে

পেলাম। আরেকটি আঘাত করলেন তিনি। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ বিচূর্ণ হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, আল্লাহু আকবার। আমাকে পারস্যের চাবি দান করা হলো। আল্লাহ্র কসম! আমি এ মুহূর্তে মাদায়েনের শাদা শাদা গম্বুজগুলো দেখতে পাচ্ছি। তিনি স. মাদায়েনের অট্টালিকার গম্বুজসমূহের বিবরণ দিলেন। হজরত সালমান ফারসী বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি যেরূপ বর্ণনা করলেন, মাদায়েনের গম্বুজসমূহের প্রকার-প্রকৃতি সে রকমই। মাদায়েন পারস্যের একটি শহরের নাম। ওই শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলো বাদশাহ নওশেরোয়াঁ। রসুলেপাক স. আরেকটি আঘাত করলেন। এবার পুরো পাথরটি গুঁড়ো হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, আল্লাহু আকবার! আমাকে দান করা হলো ইয়ামনের কুঞ্জিকা। আল্লাহ্র কসম! আমি এখানে দাঁড়িয়ে সানআর দরজা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।

খন্দক যুদ্ধের আর একটি মোজেযা এরকম— একটি মেয়ে কিছু খেজুর হাতে নিয়ে রসুলেপাক স. এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। রসুলে আকরম স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হাতে কী? মেয়েটি বললো, কিছুসংখ্যক খেজুর, আমার মা আমার পিতার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি স. বললেন, খেজুরগুলো আমাকে দাও। মেয়েটি তাই করলো। রসুলে আকরম স. একটি বস্ত্রখণ্ড বিছিয়ে তার উপর খেজুরগুলো রাখলেন। একজনকে ডেকে বললেন, সকল খননকারীকে ডেকে আনো। সকলেই এলেন। খেজুর আহার করে পরিতৃপ্ত হলেন।

জীবনীলেখকগণ বলেন, পরিখাখননের কাজ বিশদিন পর্যন্ত চলেছিলো। ওয়াকেদী বলেছেন, চব্বিশ দিন। ইমাম নববী 'রওজা' পুস্তকে লিখেছেন পনেরো দিনের কথা। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, পুরা একমাস ধরে খননকার্য চলেছিলো। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে বলা হয়েছে, ছ'দিনে খনন কার্য সমাপ্ত হয়েছিলো। পরিখাখনন শেষ হওয়ার পর দুশমনবাহিনী এসেছিলো। তারা ছিলো সর্বমোট দশহাজার। রসুলে আকরম স. মাত্র তিনহাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে সেলা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিয়েছিলেন। বাহিনীদ্বয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধক ছিলো ওই পরিখা। তারপর আল্লাহ্র দুশমন হুয়াই ইবনে আখতাব আবু সুফিয়ানের পরামর্শক্রমে কাআবের নিকট এলো। সে ছিলো বনী কুরায়যার পক্ষ থেকে সন্ধিবদ্ধ। কাআবকে কুরায়েশদের পক্ষ অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করলো হুয়াই। কাআব তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। হুয়াইকে গালি দিয়ে বললো, হতভাগা! তুমি কি জানো না, আমরা মোহাম্মদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ? সন্ধিভঙ্গ অনুচিত? হুয়াই দরজা খোলার জন্য বার বার অনুরোধ করলো। ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কথা বলতে লাগলো। খোঁচা দিয়ে বললো, মনে হয় তুমি মেহমানদারী করার ভয়ে এভাবে দরজা বন্ধ করে দিলে। আরববাসীদের কাছে কৃপণতার দুর্নাম ছিলো খুবই পীড়াদায়ক। কাআবের নিকটেও কথাটা বড়

সাংঘাতিক পীড়াদায়ক মনে হলো। তাই সে দরজা খুলতে বাধ্য হলো। হুয়াইকে নিয়ে খেতে বসলো। হুয়াই বার বার তাকে রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে প্ররোচিত করলো। কাআব বার বার অস্বীকার করে গেলো। হুয়াইও ধোকাবাজীর দিক দিয়ে ছিলো আধা শয়তান। কাআবকে ধোকার জালে আবদ্ধ করে সে শেষ পর্যন্ত তার দাবী আদায় করে নিলো।

রসুলে আকরম স. হজরত যুবায়েরকে বনী কুরায়যার খবর নেওয়ার জন্য তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বনী কুরায়যার কাছে পাঠিয়ে দিলেন হজরত সাআদ ইবনে মুআয, হজরত সাআদ ইবনে উবাদা এবং আরও কতিপয় সাহাবীকে। তিনি স. তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন বনী কুরায়যার লোকদেরকে উপদেশ দিতে, যেনো তারা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে কৃত সন্ধি ভঙ্গ না করে। কিন্তু তাঁরা বনী কুরায়যার বসতিতে গিয়ে দেখলেন, তারা আর পূর্বের অবস্থায় নেই। কুরায়েশ এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা যখন রসুলে আকরম স. এবং তাঁর অনুসারীগণকে উৎখাত করার জন্য চরম ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে, তখন বনী কুরায়যাদের সন্ধিভঙ্গের সংবাদ মুসলমানদেরকে বিচলিত করে দিলো। তাঁরা দেখলেন, সম্মুখে সমূহ বিপদ। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা চিন্তা কোরো না। 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' (আল্লাহ্‌তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি আমাদের কতই না উত্তম নির্বাহক)। কিন্তু দুর্বল ইমানের অধিকারীরা কাফেরদের ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়লেন। সীমাহীন ভয়ে তাঁরা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদের তখনকার অবস্থা ব্যক্ত করেছেন এভাবে— 'ইজ জ্বাউকুম মিন ফাউক্বিকুম ওয়া মিন আসফালা মিনকুম ওয়া ইজ যাগাতিল আবসারু ওয়া বালাগাতিল ক্বলূবুল হানাজ্বিরা ওয়া তাযুন্নুনা বিল্লাহিয যুনূনা হুনালিকাব তুলিইয়াল মু'মিনূনা ওয়া যুলযিলূ যিলযালান শাদীদা' (যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হইতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে; তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল) (৩৩ঃ১০-১১)। সে সময় মুনাফিক ও দুর্বল ইমানদাররা বলতে লাগলো, মোহাম্মদ বলেছেন কায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডারসমূহ নাকি আমাদের হস্তগত হবে। কিন্তু আমরা তো দেখছি এখন জীবন বাঁচানোই দায়। চতুর্দিক থেকে আমরা আক্রান্ত। তখন অবতীর্ণ হলো— 'ওয়া ইজ ইয়াক্বুলুল মুনাফিক্বূনা ওয়াল লাজীনা ফী ক্বলূবিহিম মারাদ্বুম মা ওয়াআ'দানাল্লাহু ওয়া রসূলুহু ইল্লা গুরূরা' (আর স্মরণ কর, মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, আল্লাহ্ এবং তাহার রসুল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে)(৩৩ঃ১২)। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা

আরো এরশাদ করলেন— ‘ওয়া ইজ ক্বালাত ত্বাইফাতুম মিনহুম ইয়া আহলা ইয়াছরিবা লা মুক্বামা লাকুম ফারজ্বিঊ ওয়া ইয়াস্‌তা’জিনু ফারীক্বুম মিনহুমুন্‌ নাবিয়্যা ইয়াক্বুলূনা ইন্না বুইউতানা আ’ওরাতুন ওয়া মা হিয়া বিআ’রাতিন ইইঁইউরীদূনা ইল্লা ফারারা’ (আর উহাদের একদল বলিয়াছিল, ‘হে ইয়াছরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল, এবং উহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত; অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদের উদ্দেশ্য) (৩৩ঃ১৩)।

এরপর রসুলে আকরম স. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে তিনশ’লোক সহকারে মদীনার ঘর-বাড়ি ও কেল্লাসমূহ হেফাযত করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বিভিন্ন মতানুসারে কুরায়েশরা বিশ, চব্বিশ বা সাতাইশ দিন পর্যন্ত মুসলমানদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলো। রাত্রিবেলা উব্বাদ ইবনে বিশর একদল যোদ্ধা নিয়ে রসুলেপাক স. এর তাঁবু পাহারা দিতেন। মুশরিকরা আসতো এবং রসুলেপাক স. এর তাঁবুর দিকে লক্ষ্যস্থির করতো। কিন্তু পরিখা অতিক্রম করার সাহস পেতো না।

এক পর্যায়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। উভয় পক্ষের সৈন্যরা প্রাণপণ লড়াই শুরু করে দিলো। হজরত আলী এ যুদ্ধে এমন বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, যা বর্ণনার বাইরে। তাঁর সম্পর্কে হাদিস শরীফে এসেছে— ‘লামুবারাযাতু আ’লী ইবনে আবী ত্বালীবিন ইয়াওমাল খানদাক্ব আফদ্বালু মিন আ’মালি উম্মাতী ইলা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্‌’ (রসুলেপাক স. বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধে আলী যেভাবে যুদ্ধ করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত আমার সমস্ত উম্মতের আমলসমূহ থেকে উত্তম)। রসুলেপাক স. হজরত আলীর জন্য তখন বিশেষভাবে দোয়া করেছিলেন এবং তিনি তাঁর যুলফিকার নামক তরবারীখানা তাঁকে দান করেছিলেন। এ যুদ্ধে রসুলেপাক স. এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে যে রকম কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করতে হয়েছিলো, সেরকম অন্য কোনো যুদ্ধে করতে হয়নি। অবশ্য উহুদ যুদ্ধের দিনও মুসলমানদেরকে অনেক দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয়েছিলো। কিন্তু তা ছিলো মাত্র একদিনের জন্য। আর তখন কুরায়েশরা ছিলো একা। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে আরবের সমস্ত গোত্র একত্রিত হয়ে মুসলমানদের উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো।

খন্দক যুদ্ধের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

এ যুদ্ধের একটি বিশেষ ঘটনা হচ্ছে, হজরত সাআদ ইবনে মুআযের জখম হওয়া। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, খন্দক যুদ্ধের কোনো একদিন

কাফেরেরা রসুলে আকরম স. এর তাঁবু আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। তিনি তখন বর্ম পরিহিত অবস্থায় মাটির উপর অথবা কোনো আরোহীর উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি ওই সময় সাআদ ইবনে মুআযের মায়ের সঙ্গে মদীনার এক দুর্গে অবস্থান করছিলাম। সাআদ ইবনে মুআয ছোটো আকারের একটি বর্ম পরিধান করে যুদ্ধে রওয়ানা দিলেন। বর্মটিতে তাঁর হাত পা পুরা ঢাকা ছিলো না। আর তিনিও ছিলেন দীর্ঘাকৃতির। তাঁর মা তাঁকে বললেন, বৎস! তাড়াতাড়ি যাও। রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হও। হজরত আয়েশা বলেন, আমি বললাম, হে উম্মে সাআদ! সে যদি এর থেকে বড় বর্ম পরিধান করতো, তাহলে ভালো হতো। ভাবছি, তার হাতে তীর বিদ্ধ হয় কি না। সাআদের মা বললেন, যা হবে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হবে। সাআদ যখন পরিখার কিনারায় পৌঁছলেন, তখন হেববান ইবনে আরাক নামক এক কাফের তাদের সারি থেকে বেরিয়ে এসে সাআদের দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। বললো, লও, তীর গ্রহণ করো। আমি আরাকের পুত্র। নিক্ষিপ্ত তীরটি সাআদের আকহালের উপর লাগলো। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্ তোর মুখমণ্ডল দোযখের আগুনে পুড়িয়ে দিন। কনুইয়ের সন্ধিস্থলের একটি রগকে বলে আকহাল। ওই রগ কেটে গেলে সারা শরীরের রক্ত ঝরে যায়। রগটিকে এরকুল হায়াত ও হাফতে আন্দামও বলা হয়। শরীরের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে এর শাখা মিলিত আছে। হাতের শাখাটিকে বলা হয় আকহাল। পীঠের শাখাকে বলা হয় আবহার। উরুর শাখাকে বলে নাসা। এরকে নাসা নামক ব্যাধির নামকরণ করা হয়েছে ওই 'নাসা' নাম থেকেই।

হজরত সাআদ যখন আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, তখনই বুঝতে পারলেন, এখন জীবন বাঁচানো কঠিন। দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! কুরায়েশদের সঙ্গে তোমার রসুলকে যদি আরও যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না। আমি যেনো ওই যুদ্ধগুলোতেও অংশগ্রহণ করতে পারি। আর এটাই যদি তাদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ হয়, তবে এ তীরকেই আমার শাহাদতের উসিলা বানিয়ে দাও। তবে আমাকে এতোটুকু সময় দাও, যাতে আমি বনী কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম স্বচক্ষে দেখে যেতে পারি। এরকম দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বনী কুরায়যার পরিণাম কী হয়েছিলো, তা পরবর্তীতে জানা যাবে। সহীহ্ বোখারীতে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাআদ ইবনে মুআয দোয়া করেছিলেন এভাবে— হে আল্লাহ্! তুমিতো জানো, যে কওমের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি, আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো কওম নেই। তবুও এরকম করেছি তোমার দ্বীনের জন্যই। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। তারা তোমার রসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাঁকে স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে। হে আল্লাহ্! এখনও কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধ বাকী আছে। তুমি আমাকে তাদের জন্য জীবিত

রাখো। আমি যেনো তাদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করতে পারি। যুদ্ধের প্রয়োজন যদি আর না হয়, তবে আমাকে এ জখম দ্বারাই মৃত্যু দান করো। তারপর জখম খোলা হলো। রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো এবং তাঁর দোয়াও কবুল হয়ে গেলো।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন এভাবে— খন্দক যুদ্ধের দিনগুলির মধ্যে একদিন কাফেররা এক হয়ে প্রবলতরভাবে আক্রমণ করলো। রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চললো। রসুলেপাক স. এবং তাঁর সাহাবীগণ সেদিন জোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ আদায় করতে পারলেন না। তখনও খওফের (যুদ্ধকালীন) নামাজের বিধান জারী হয়নি। এভাবে ওই চরম সঙ্গিন সময়ে তাঁরা সকলে নামাজের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর তিনি স. হজরত বেলালকে আজান ও একামত বলার হুকুম দিলেন। প্রথমে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। তারপরে প্রত্যেক নামাজ ক্রমানুসারে ইকামতসহ কাযা করলেন। কাফেরদের জন্য বদদোয়া করলেন এভাবে— 'মালাআল্লাহু বুয়ূতাহুম ওয়া কুবূরাহুম নারান মা শাগালূনা আ'ন সালাতিল উসত্বা' (আল্লাহ্তায়ালা ওই সকল অবিশ্বাসীর বাড়িঘর ও কবরসমূহ অগ্নিময় করে দিন, যারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামাজ আদায় করতে দেয়নি)। মধ্যবর্তী নামাজ দ্বারা এখানে আসরের নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। আসরের নামাজই যে 'সালাতুল উসতা' (মধ্যবর্তী নামাজ), এই হাদিসই তার প্রমাণ। সাহাবা ও উলামায়ে কেরামের মধ্যে মধ্যবর্তী নামাজ সম্পর্কে যে মতভেদ রয়েছে, তার ভিত্তি ইজতেহাদ। হাদিস জানার পূর্বে তাঁরা উক্তরূপ ইজতেহাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, মতভেদের সুযোগ আর নেই। হাদিসে বলা হয়েছে 'হাত্তা গাইয়াতিশ্ শামসু' অর্থাৎ নামাজ পড়তে পারেননি সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। মুসলিম শরীফে এসেছে 'হাত্তা আহ্মার্রতিশ শামসু আউস্ফার্রত' অর্থাৎ সূর্য রক্তিম অথবা হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত। বোখারী শরীফে এসেছে ' 'বা'দা মা কাদাশ শামসু ইয়াগরিব' অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে রসুলেপাক স. ওই অপপ্রার্থনা করেছিলেন। বিষয়টি এমনও হতে পারে যে, যুদ্ধে মশগুল থাকা অবস্থায় নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিলো এবং তিনি স. তা আদায় করেছিলেন মাগরিবের পর। শায়েখ তকিউদ্দীন এরকম বলেছেন। 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে জোহরের নামাজের কথাও আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, মুশরিকরা সেদিন তাঁদেরকে চারটি নামাজ আদায় করা থেকে বিরত রেখেছিলো। আর আসরের নামাজের কথা সেখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম করা হয়েছে এ নামাজের ফযীলত অধিক হওয়ার কারণেই। আল্লাহ্ই অধিক অবহিত।

খন্দক যুদ্ধের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, অকস্মাৎ কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি। আর এ ঘটনার মূল হোতা হচ্ছে নাঈম ইবনে

মাসউদ আশজায়ী গাতফানী নামক এক ব্যক্তি। তিনি রসুলেপাক স. এর নিকট এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি মুসলমান হয়েই আপনার নিকট হাযির হয়েছি। এখনও এ বিষয়ে কেউ কিছু জানে না। সত্য দ্বীনের খেদমত করাই এখন আমার মনের একান্ত বাসনা। আপনার সাহাবী ও গোলামদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমিও কিছু অবদান রাখতে চাই। যে সকল গোত্র একজোট হয়ে আপনার বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে, আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাই। আপনার অনুমতি পেলে আমি তাদের সঙ্গে যা মনে চায় তাই বলবো। তিনি তখন শত্রুদলকে গুজবের ফাঁদে ফেলতে চাইলেন। রসুলেপাক স. বললেন, ঠিক আছে। অনুমতি দেওয়া হলো। 'ফাইন্নাল হারবু খুজআ'তুন' (যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণা)। তারপর হজরত নাঈম ইবনে মাসউদ কুরায়েশ এবং অন্যান্য দলগুলোর কাছে গেলেন। তাদের কাছে তিনি এমনসব কথা বললেন, যাতে তারা বিভ্রান্ত না হয়ে পারলো না। তারা একে অপরকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে লাগলো। শুরু হলো ঘোর মতানৈক্য। হজরত নাঈম সর্বপ্রথম বনী কুরায়যার লোকদের কাছে গেলেন। বললেন, তোমরাতো জানোই তোমাদের প্রতি আমার কী গভীর ভালোবাসা। তাই তোমাদেরকে সাবধান না করে পারছি না। কুরায়েশ এবং গাতফান গোত্রদ্বয় মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। তোমরাও তাদের কথায় নাচছো। কিন্তু জেনে রেখো, ওরা কিছুই করতে পারবে না। পালাতে তাদেরকে হবেই। তখন তোমোদেরকে পড়তে হবে মোহাম্মদের এবং তার অনুসারীদের কোপানলে। আর তোমরা তাদের সঙ্গে পেরে তো উঠবেই না। তারা তখন তোমাদেরকে পিশে মারবে। এরপর হজরত নাঈম ইবনে মাসউদ গাতফান গেলেন কুরায়েশ এবং গাতফান গোত্রদ্বয়ের কাছে। তাদের কাছেও বললেন নানারকম হতাশাব্যঞ্জক কথা। তাদের পারস্পরিক ঐক্য চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেলো। প্রকৃতপক্ষে এ ছিলো রসুলে আকরম স. এর দোয়ার ফল, যা তিনি করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে। বলেছিলেন, 'আল্লাহুমাং যিলাল কিতাবি ওয়া সারীআ'ল হিসাবি ইহ্‌যামিল আহযাবা আল্লাহুম্মাহ্ যিহুম ওয়া যালযিলুহুম ওয়াংসুরনা আ'লাইহিম' (হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! শত্রুদলসমূহকে তুমি পরাজিত করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে পরাস্ত করো। প্রকম্পিত করো। তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো)। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. খন্দক যুদ্ধের শেষের তিন দিন (সোম, মঙ্গল ও বুধবার) জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ফাতাহ মসজিদে অনবরত দোয়া করে যাচ্ছিলেন। তাঁর দোয়া কবুলও হয়েছিলো। হজরত জাবের বলেন, খন্দক যুদ্ধের ওই মুহূর্তের অন্যান্য ঘটনা আমার স্মরণ নেই। স্মরণে আছে কেবল একটি বিষয়। তা হলো ওই সময় আমার দোয়া কবুল হয়েছিলো। কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, তিনি বুধবার জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া

করেছিলেন। সময়টি দোয়া কবুল হওয়ার একটি বিশেষ সময়। এ সময়ে সকলেরই আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করা উচিত। রসুলেপাক স. এর উপরোক্ত আমল থেকেই সম্ভবতঃ মাশায়েখগণ এরকম মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি খন্দক যুদ্ধের দিন বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এমন কোনো দোয়া আছে কি, যা আমি এখন পাঠ করতে পারি? তিনি স. বললেন, পাঠ করো 'আল্লাহুম্মাস তুরঊ'রা তানাদা মিন রাওআ'তানা'। ইবনে জুফারের 'ইয়াম্বুউল হায়াত' নামক পুস্তকে এসেছে, রসুলেপাক স. তখন পড়েছিলেন 'ইয়া সারীহাল মাকরূবীনা ওয়া ইয়া মুজ্বীবাল মুদ্বত্বারীনা ইকশিফ হাম্মী ওয়া গাম্মী ওয়া কুরবাতী তারা মা নাযালা ওয়াবি আসহাবী'। রসুলেপাক স. এর দোয়া কবুল হলো। আল্লাহ্‌তায়ালা তুফান ও ভূমিকম্প সৃষ্টি করে দিলেন। ওই তুফানে কাফেরবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। তাদের রান্নার ডেকচি উল্টে গেলো। তাঁবুগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। আল্লাহ্‌তায়ালা একদল ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। তাঁরা তাদের তাঁবুগুলোর টানা কেটে দিলেন। তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। তারা এসব দেখে এতো ভীত হলো যে, পলায়ন ছাড়া তাদের আর কোনো উপায়ই রইলো না। কোরআনুল করীমে তাদের তখনকার দুরবস্থার বিবরণ এসেছে এভাবে— 'ইয়া আইয়ুহাল লাজীনা আমানুজ্‌কুরু নি'মাতাল্লাহি আ'লাইকুম ইজ জ্বাআতকুম জুনূদুন ফাআরসালনা আ'লাইহিম রীহাওঁ ওয়া জুনূদাল্ লাম তারাওহা ওয়া কানাল্লাহু বিমা তা'মালূনা বাসীরা ওয়া কাফাল্লাহুল মু'মিনীনাল ক্বিতালা ওয়া কানাল্লাহু ক্বাবিয়্যান আ'যীযা' (হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান,পরাক্রমশালী) (৩৩ঃ ৯ও২৫)।

শেষে প্রচণ্ড ঝড় এসে তাদের তাঁবুর পেরেকসমূহ উপড়ে ফেললো। তাঁবুগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। বালুকারাশির স্তুপ সৃষ্টি হলো যেখানে সেখানে। তাদের চেহারাও হয়ে গেলো ধুলিধুসরিত। উড়ন্ত প্রস্তরকণা এসে আঘাত করতে লাগলো তাদের মুখে ও শরীরে। তদুপরি তারা শুনতে পেলো, চতুর্দিক থেকে উচ্চারিত হচ্ছে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে দ্রুত পালিয়ে গেলো তারা। যাওয়ার সময় ভারী সামগ্রীগুলো ফেলে যেতে হলো তাদেরকে।

শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তাঁর হাবীবকে রহমাতুল্লিল আলামীন না বানাতেন, তাহলে তখন তাদের উপর প্রবাহিত তুফান আদ জাতির উপর প্রবাহিত ঘনঘটার চেয়েও প্রকটতর হতো। ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস

থেকে একটি বিস্ময়কর সুক্ষ্মতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের রাতে পূবালী বাতাস উত্তরের বাতাসকে বললো, এসো। আমরা উভয়ে মিলে আল্লাহ্র রসুলের খেদমত করি। উত্তরের বাতাস বললো, এই স্বাধীনা রাতে ভ্রমণ করতে পারে না। পূবালী বাতাস বললো, আল্লাহ্তায়ালা তোমার উপর গযব নাযিল করুন। সে জন্য উত্তরের বাতাস তখন থেকেই বন্ধ্যা। অর্থাৎ তার দ্বারা কারো কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। রসুলুল্লাহ্ স.কে তখন সাহায্য করেছিলো পূবালী বাতাস। সে জন্যই রসুলেপাক স. বলতেন 'নুসিরতু বিস সাবা ওয়া উহলিকাত আ'দুন বিদ্দাবূর' (আমাকে পূবালী বাতাস দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আর উত্তরের বাতাস দিয়ে আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে)। বাদে সাবা বা পূবালী বাতাস ওই বাতাসকে বলা হয়, যা সুরাইয়া নক্ষত্রের উদয়স্থলের দিক হতে ওঠে এবং বানাতুন নাআশ পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকে। আর তার বিপরীতে হচ্ছে দাবুর বা উত্তরা বাতাস। দাবুর বা উত্তরা বাতাস পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ানো ব্যক্তির সামনে এবং ডান দিকে থাকে। তবে প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই বাতাস সূর্যোদয়ের স্থান এবং বানাতুন নাআশের মধ্যবর্তী, অথবা সূর্য উদয়ের স্থান থেকে নাসরে তায়েবের পতিত স্থল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। আর বিশুদ্ধতার নিকটবর্তী কথা হচ্ছে, যে বাতাস রাত্রি বেলা প্রবাহিত হয়। আর বাদে সাবা বা পূবালী বাতাস প্রবাহিত হয় প্রভাতকালে। অভিধান গ্রন্থে এরকমই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর নির্দেশ পেয়ে হজরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান শত্রুদলের পলায়নের রাত্রে তাদের কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, একটি তুফান ধেয়ে আসছে। তুফান এসে কাফেরদের ডেকচি পাতিলের ঢাকনা উড়িয়ে নিয়ে গেলো এবং ডেকচিগুলো উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। তাঁবুসমূহ উৎপাটিত হলো। দেখলাম, আগুনের একটি হলকা তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের অশ্বগুলো ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো। প্রস্তরবর্ষণের আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। আবু সুফিয়ান তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো। আগুনের তাপে তপ্ত হতে লাগলো। হজরত হুযায়ফা তীর বের করে ধনুকে রাখলেন। কিন্তু তীর নিক্ষেপ করলেন না। কারণ রসুলেপাক স. এর নির্দেশ ছিলো, কারও উপর আগে আক্রমণ চালিয়ো না। ধনুক থেকে তীর উঠিয়ে নিলেন। রসুলুল্লাহ্ স. এর এ কথাও তাঁর মনে পড়লো, কাফেররা এখন থেকে আর আমাদের উপর আক্রমণ করতে আসবে না। আমরাই এখন থেকে হবো আক্রমণকারী। তাই হয়েছিলো। এ যুদ্ধের পর থেকে মুসলমানদের উপর হামলা করার শক্তি ও সাহস কোনোটিই তাদের আর অবশিষ্ট রইলো না। পরবর্তী বৎসরে রসুলেপাক স. ওমরার উদ্দেশ্যে হুদায়বিয়া পর্যন্ত গেলেন, যা ছিলো মক্কাবিজয়ের পূর্বাভাস। আর তখন থেকেই বিজয়ের সকল দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। 'ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্হাম মুবীনা' এই আয়াত দ্বারা সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। হজরত হুযায়ফা বলেন,

কাফেরবাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার পথে শাদা পাগড়ি পরিহিত বিশজন অচেনা লোককে দেখলাম। তাঁরা আমাকে বললেন, তোমার প্রভুকে যেয়ে বলো, হক তায়ালা তাঁকে কাফেরবাহিনীর আক্রমণ থেকে মুক্তি দান করেছেন। আমি রসুলে আকরম স. সকাশে পৌঁছে দেখলাম, তিনি নামাজ পাঠ করছেন। চরম মুহূর্তে নামাজ পাঠ করাই ছিলো তাঁর পবিত্র স্বভাব। নামাজ শেষে তিনি আমাকে ইঙ্গিতে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে সুসংবাদ জানালেন এবং মৃদু হাসলেন। আমি তাঁর পবিত্র দন্তরাজিতে নুরের ঝলক দেখতে পেলাম। আলহামদু লিল্লাহ! কুরায়েশদের পরাজয় হলো। আবু সুফিয়ান তার অপরিণামদর্শিতার ফলও পেলো। কুরায়েশবাহিনীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেলো।

জীবনীলেখকগণ বলেন, খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর একদিন আবু সুফিয়ান আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছো, যে মদীনায় যেয়ে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে পারবে? মোহাম্মদের উপর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। সে তো হাট-বাজারে যাওয়া আসা করে। কখনো কখনো একাই এক মনে তার ধর্মপ্রচারের কাজ করে যায়। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললো, আমাকে যদি সাহায্য করেন, তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমার একটি অতি ধারালো খঞ্জর আছে। সামান্য সুযোগ পেলেই আমি কাজ সমাধা করে ফেলতে পারবো। আবু সুফিয়ান তাকে একটি উট দিলো এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করলো। বিষয়টিকে গোপন রাখার নির্দেশও দিলো। বেদুঈন মদীনার দিকে চলে গেলো। রসুল স. তখন কোনো এক মহল্লার মসজিদে ধর্মসম্পর্কিত উপদেশ প্রদানে মগ্ন ছিলেন। বেদুঈন সেখানে পৌঁছে গেলো। বললো, তুমিই কি ইবনে আবদুল মুত্তালিব? তিনি স. বললেন, হাঁ। আমি ইবনে আবদুল মুত্তালিব। বেদুঈন তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তিনি স. বললেন, লোকটি আমাকে হত্যা করার জন্য মক্কা থেকে এসেছে। আরো বললেন, সত্য কথা বলো। সত্যই তোমাকে কেবল নিস্তার দিতে পারে। সে তার মদীনায় আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিলো। রসুলেপাক স. তাকে নিরাপত্তা দিয়ে বললেন, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পারো। বেদুঈন বললো, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রসূলাল্লাহ্'। তারপর বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকে দেখার সাথে সাথে আমি জ্ঞানহারা হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। আমি যে আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে এসেছি, তা জানে কেবল আবু সুফিয়ান ও আমি (আপনি এ সংবাদ কী করে পেলেন?)। এখন আমি বুঝতে পেরেছি আবু সুফিয়ানের যুদ্ধ এবং শয়তানের যুদ্ধ থেকে আপনাকে রক্ষা করেন একমাত্র আল্লাহ্। রসুলেপাক স. মৃদু হাসি মুখে ধরে তার দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনতে লাগলেন।

বনী কুরায়যার যুদ্ধ

এ বৎসরেই খন্দক যুদ্ধের পরপর বনী কুরায়যার যুদ্ধ সংঘাটিত হয়। বনী কুরায়যা বনী নাযীরের মতোই ইহুদীদের একটি বড় জনপদ ছিলো। তারা নবীকরীম স. এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো এবং কুরায়েশদেরকে সাহায্য করতে সচেষ্ট হয়েছিলো। হুয়াই ইবনে আখতাবই তাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এ ব্যাপারে সে শুরু থেকেই ছিলো তৎপর। প্রকাশ্যত বনী কুরায়যার সঙ্গে যুদ্ধের শেষ কারণ ছিলো এটাই। প্রকৃত কারণ ছিলো এরকম— খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পরই হজরত জিবরাইলের আগমন ঘটলো। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিয়ে রসুলে আকরম স.কে বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ— এখনই অতি দ্রুত বনী কুরায়যার জনপদে পৌঁছতে হবে। তাদেরকে কোনোরকম অবকাশ দেওয়া যাবে না। আমি নিজে এবং আমার সঙ্গী ফেরেশতারা এখনো রণসজ্জা পরিত্যাগ করিনি। সুতরাং আপনাদেরকে এখনই যাত্রা করতে হবে।

ঘটনার সবিস্তার বিবরণ এরকম— রসুলেপাক স. যেদিন খন্দক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে এলেন, সেদিনই বনী কুরায়যার সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, রসুলুল্লাহ্ স. তখন আমার প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছিলেন। মাথা ও শরীর থেকে ধুলিবালি পরিষ্কার করে তিনি গোছল করছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, মাথার একাংশ ধৌত করেছিলেন। অপর অংশ এখনও ধৌত করেননি। আবার আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি তখন ছিলেন তাঁর প্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমার ঘরে। তার পবিত্র স্বভাব এরকমই ছিলো। যুদ্ধ বা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে তিনি যেতেন হজরত ফাতেমার গৃহে। তাঁর কপালে চুমু খেতেন। সেদিনও এরকম হয়েছিলো। এমন সময় বাহির থেকে এক লোক সালাম দিলেন। তিনি স. বাইরে বেরিয়ে গেলেন। হজরত ফাতেমা বলেন, পিছনে পিছনে আমিও ঘরের দরজা পর্যন্ত গেলাম। দেখলাম, দাহিয়াতুল কালবী দাঁড়িয়ে আছেন। তার চেহারা ও সামনের দাঁতের উপর ধূলারাশি লেগে আছে। তিনি একটি শাদা উটের উপরে বসে আছেন। রসুলুল্লাহ্ নিজের চাদর দিয়ে তাঁর ধুলাবালি ঝেড়ে দিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে কিছু কথা বললেন। কথা শেষ করে রসুলুল্লাহ্ ঘরে এসে আমাকে বললেন, উনি জিবরাইল। আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম জানিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, আমি যেনো এই মুহূর্তে বনী কুরায়যার দিকে যাত্রা করি। এক বর্ণনায় আছে, হজরত জিবরাইলের মাথায় তখন ছিলো রেশমের পাগড়ি এবং চাদর পরিহিত অবস্থায় খচ্চরের উপর আরোহণ করেছিলেন তিনি। বোখারীর বিবরণে এসেছে, রসুলেপাক স. যখন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং দেহ থেকে হাতিয়ার খুলে গোছল করতে লাগলেন, তখন জিবরাইল এসে

বললেন, আপনি তো হাতিয়ার খুলে ফেলেছেন, কিন্তু আমি এখনও খুলিনি। আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করেছেন, বনী কুরায়যার দিকে যেতে হবে। চলুন, আল্লাহ্র কসম, আমি বনী কুরায়যার বসতিতে গিয়ে তাদের দুর্গগুলো ধ্বংস করে দিবো। তাদেরকে পদদলিত করবো। সেখানে ভূমিকম্প সৃষ্টি করবো। মুরগীর ডিম পাথরে নিক্ষেপ করলে যে অবস্থা হয়, আমি তাদেরকে সেরকম করে ফেলবো। এরপর জিবরাইল তাঁর সঙ্গী ফেরেশতাদেরকে নিয়ে প্রস্থান করলেন। হজরত আনাস বলেছেন, আমি যেনো সে সময় বনী গনমের গলিতে জিবরাইলের অশ্বপদবিক্ষেপের ধুলা উড়তে দেখেছি। তারপর রসুলেপাক স. হজরত বেলালকে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে বললেন। তিনি ডেকে ডেকে বললেন, হে আল্লাহ্র পথের অশ্বারোহীগণ! প্রস্তুত হও। বনী কুরায়যার মহল্লায় পৌঁছার পূর্বে আজকের আসরের নামাজ আদায় কোরো না। হজরত আলীকে এ বাহিনীর অগ্রনায়ক নির্ধারণ করে তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করা হলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে কুলছুমকে করা হলো মদীনার প্রশাসক। রসুলেপাক স. তাঁর লাহীফ নামক অশ্বে আরোহণ করে যাত্রা করলেন। সাথে চললো আরও দুটি আরোহীবিহীন সুসজ্জিত অশ্ব। মুসলিমবাহিনী রসুলুল্লাহ্র অনুসরণ করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত ওমর ফারুক চললেন যথাক্রমে তাঁর ডানে ও বামে। সম্মুখভাগে চললেন মুহাজির ও আনসারগণের অগ্রণী সাহাবীগণ। সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো তিন হাজারে। ঘোড়া ছত্রিশটি। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন বনী নাজ্জার গোত্রের লোকেরা আরোহী অবস্থায় অপেক্ষা করছে। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, পথিমধ্যে এভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করতে তোমাদেরকে কে বলেছে? তারা বললো, দাহিয়াতুল কালবী। তিনি স. বললেন, তিনি জিবরাইল। তিনিই সর্বাগ্রগামী। আসরের নামাজের সময় হলো। কোনো কোনো সাহাবী নামাজ আদায় করে নিলেন। আসরের নামাজ বনী কুরায়যায় পৌঁছেই পড়তে হবে— একথার অর্থ তাঁরা বুঝলেন, গন্তব্যস্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছার জন্যই এভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো কোনো সাহাবী আসরের নামাজ আদায় করলেন বনী কুরায়যায় পৌঁছানোর পর এশার ওয়াক্তে এশার নামাজ আদায়ের পর। কথিত নির্দেশনার প্রকাশ্য অর্থকেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. উভয় পক্ষের আমলকেই সমর্থন করেছেন। কাউকে তিরস্কার করেননি। ঘটনাটি ইজতেহাদকারীদের পক্ষের একটি প্রমাণ। আবার যারা হাদিসের জাহেরী অর্থের উপর আমল করে, তাদের পক্ষেরও প্রমাণ।

আসরের নামাজের কথা বোখারী গ্রন্থে উল্লেখ আছে। মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হয়েছে জোহরের নামাজের কথা। বোখারী ও মুসলিম একই শায়েখ ও একই সূত্রপরম্পরার আশ্রয় নিয়েছেন। মুসলিমের সমর্থন করেছেন আবু ইয়ালা, ইবনে সা'দ এবং ইবনে হেববান। অবশ্য বিষয়টির সামাধান সাধন করা যেতে

পারে বিভিন্নভাবে। যেমন জোহরের হুকুম তাঁদের জন্য দিয়েছিলেন, যাঁরা তখনও জোহরের নামাজ আদায় করেননি। অর্থাৎ তাঁরা যেনো জোহরের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে যান। আর যারা জোহরের নামাজ আদায় করে নিয়েছিলেন, তাঁদের বলেছিলেন, তাঁরা যেনো বনী কুরায়যায় না পৌঁছে আসরের নামাজ আদায় না করেন। তাই তাঁরা সেখানে পৌঁছার পরই আসরের নামাজ আদায় করেছেন। সামঞ্জস্য সাধন করতে গিয়ে কেউ কেউ আবার বলেছেন, জোহরের হুকুম ছিলো সামর্থ্যবান বনী কুরায়যার নিকটবর্তী এলাকার লোকদের জন্য। আর দুর্বল ও দূরবর্তী লোকদের প্রতি ছিলো গন্তব্যস্থানে গিয়ে আসর পড়ার নির্দেশ। ইমাম কাসতালানী এরকম বলেছেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

সন্ধ্যার পর এবং শয়নকালের মধ্যবর্তী সময়ে রসুলেপাক স. বনী কুরায়যার বসতিতে পৌঁছিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে পঁচিশদিন তাদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলেন তিনি স.। আর ইবনে সাআদের বর্ণনানুসারে পনেরো দিন। হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, অবরোধের দিনগুলোতে মুসলমানদের খাদ্য ছিলো কেবল খেজুর। রসুলেপাক স. তখন খেজুরের ফযীলত সম্পর্কে বলতেন, খেজুর কতইনা উৎকৃষ্ট আহার্য। অবরোধ যখন দীর্ঘায়িত হলো, তখন আল্লাহ্তায়ালা বনী কুরায়যার লোকদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তারা তখন বলতে লাগলো, আমরা বনী নাযীর গোত্রের মতো দেশান্তরিত হয়ে যাবো। আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। আমরা যেনো আমাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারি। উটের উপর যে পরিমাণ সামান ও হাতিয়ার বহন করে নেওয়া যায়, আমরা তাই নিয়ে এখান থেকে চলে যাবো। রসুলেপাক স. তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তারা বললো, আসবাপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রও ছেড়ে যাবো আমরা। চলে যাবো কেবল পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে। রসুলেপাক স. বললেন, না। তোমরা আমার কাছে উপস্থিত হবে। তারা হয়রান-পেরেশান হয়ে গেলো। ইহুদীদের সরদার এবং হুয়াই ইবনে আখতাব, যে কাআবের দেওয়া নিরাপত্তার কারণে বনী নাযীরদের দুর্গে প্রবেশ করেছিলো এবং সেখানে উপস্থিত ছিলো, সে এবং কাআব ইবনে আসাদ দু'জনেই তাদের লোকদেরকে বললো, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা মোহাম্মদের উপর ইমান আনো। তিনিই শেষ নবী। তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ তওরাতেও উল্লেখ করা হয়েছে। তোমরাও তো জানো যে, তিনিই সর্বশেষ নবী। আমরা তো কেবল হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই তাঁকে অস্বীকার করে চলেছি। তোমরা তাঁর উপর ইমান আনলে তোমাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। ইহুদী জনতা তাদের কথা মানলো না। বললো, আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। তওরাত কিতাবের উপর অন্য কোনো কিতাবকে প্রাধান্য দিতে পারি না।

সুবহানাল্লাহ্! কতো বড় মুর্খতা, ধৃষ্টতা এবং হতভাগ্যতা। জেনে-শুনেও তারা সর্বশেষ নবীকে স্বীকার করলো না। দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তাকে গ্রহণ করলো না। আল্লাহ্পাক তাই এরশাদ করেছেন— 'ইয়া'রিফূনাহু কামা ইয়া'রিফূনা আবনাআহুম ওয়া ইন্না ফারীক্বাম মিনহুম লা ইয়াক্তুমূনাল হাক্বক্বা ওয়া হুম ইয়া'লামূন' (আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ জানে যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাহাদের একদল জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে) (২ঃ১৪৬)।

তওরাত কিতাবও তাদেরকে শেষ নবীর উপর ইমান আনার হুকুম করেছে। কিন্তু তারা সে কথা মানেনি। এভাবেই তারা সকলে হয়েছে জাহান্নামের পথের যাত্রী। তাদের এমতো অপআচরণের পক্ষে একটি খোঁড়া যুক্তিও প্রদর্শন করলো তারা। এখন ইমান আনলে লোকে বলবে, ওরা জীবনের ভয়ে ইমান এনেছে। লোকেরা মন্দ বলবে। কাআব ইবনে আসাদ তার লোকদেরকে বললো, আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে বলি—১. আমি যেভাবে বললাম, সেভাবে ইমান আনয়ন করো, ২. এসো আমরা আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে নিজ হাতে হত্যা করে এখান থেকে বের হয়ে যাই এবং মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। তারপর দেখি আল্লাহ্ কী ফয়সালা করেন। আমরা তখন মরে গেলেও পিছুটান নিয়ে মরবো না। আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরক অপদস্থ হতে হবে না। আর যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে কোনো অসুবিধাও হবে না। আবার আমরা স্ত্রী পাবো, তাদের থেকে সন্তান-সন্ততি পাবো। ইহুদীরা বললো, আমরা আপনজনদেরকে নিজ হাতে হত্যা করবো কেমন করে। স্ত্রী-পুত্র-প্রিয়জনবিহীন জীবন কি কোনো জীবন? কাআব এবার বললো, বেশ। তা যদি না করতে চাও তাহলে এসো, আজ হচ্ছে শনিবারের রাত। এই রাতেই আমরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আজ তোমাদের ব্যাপারে অসতর্ক থাকবে। তারা বললো, আজকের রাত মহাসম্মানিত। পূর্ববর্তীদের মতো আমরা এ রাতের অসম্মান করতে পারবো না। তাহলে আমাদের উপর খসফ ও মসখ এর শাস্তি নেমে আসবে।

এ যুদ্ধের বিস্ময়কর ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আবু লুবাবা রেকাআ ইবনে আবদুল মুনযির আউসীর ঘটনা। তিনি বনী কুরায়যা গোত্রের মিত্র ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকেই দূত নির্বাচন করলেন। বনী কুরায়যার লোকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য পাঠালেন। হজরত আবু লুবাবা তাদের দুর্গে প্রবেশ করলেন। তারা সকলে তাকে স্বাগতম জানালো। নারী ও শিশুরা তাঁর সামনে এসে কান্নাকাটি শুরু করলো। তাদের দুঃখ-কষ্টের বিবরণ দিলো। হজরত আবু লুবাবার মনে দয়ার উদ্রেক হলো। তারা জানতে চাইলো, আপনি কী বলেন? আমরা কি এখান থেকে

নেমে যাবো? তিনি বললেন, হাঁ, তোমরা এখান থেকে নেমে যাও। একথা বলে তিনি তাঁর কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন। এভাবে ইঙ্গিতে বুঝালেন, এখান থেকে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের কণ্ঠছেদন করা হবে। এরকম করার পরক্ষণেই তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং মনে মনে ইন্নালিল্লাহ্ পড়তে লাগলেন। বললেন, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি রসুলুল্লাহ্র ব্যাপারে খেয়ানত করে ফেলেছি। তিনি কাঁদতে কাঁদতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু রসুলেপাক স. বা তাঁর সাহাবীগণের কারো সঙ্গে দেখা করলেন না। মসজিদে নববীতে পৌঁছে তিনি মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললেন। বললেন, এই স্বেচ্ছাবন্দিত্ব থেকে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ্তায়ালা আমাকে ক্ষমা করেন। তিনি ঘোষণা করলেন, নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়ার সময় ছাড়া কেউ যেনো আমার বাঁধন না খোলে। রসুলেপাক স. এ সংবাদ শুনে বললেন, আমি কী করবো? সে তো আমার কাছে আসেনি। এলে আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতাম। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন—'ওয়া লাও আন্নাহুম ইজ জলামু আনফুসাহুম জ্বাউকা ফাস্তাগফারুল্লাহা ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রসুলু লাওজ্বাদুল্লাহা তাওওয়াবার রহীমা' (তাহারা যখন নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমার নিকট আগমন করে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্র রসুলও তাহাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তখন তাহারা আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে) (৪ঃ৬৪)।

রসুলেপাক স. বললেন, এখন সে যেহেতু আল্লাহ্তায়ালার দরবারে হাজির হয়ে নিজেকে বেঁধে ফেলেছে, সেহেতু আল্লাহ্তায়ালা তাকে ক্ষমা করে না দেওয়া পর্যন্ত আমি তাকে মুক্ত করতে পারবো না। হজরত আবু লুবাবার কন্যা তাঁর কাছে এসে তাঁর মুখে খেজুর তুলে দিয়ে যেতেন এবং দু' এক ঢোক পানি পান করাতেন। নামাজের সময় এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় তাঁকে খুলে দেওয়া হতো। বাকি সময় তিনি বন্দী অবস্থায় থাকতেন। জীবনীলেখকগণ বলেন, তিনি ভারী শিকল দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। পনেরো দিন পর্যন্ত তিনি এভাবেই ছিলেন। তাঁর শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিলো। দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। অতঃপর তাঁর ক্ষমাঘোষণা সংক্রান্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়।

রসুলেপাক স. হজরত উম্মে সালমার প্রকোষ্ঠে ছিলেন। তখন সেহরীর সময়। হজরত উম্মে সালমা দেখলেন, রসুলেপাক স. মৃদু হাসছেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হাসছেন যে? আল্লাহ্তায়ালা সব সময় আপনাকে এভাবেই হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। তিনি স. বললেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল করা হয়েছে এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। উম্মতজননী উম্মে সালমা বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! অনুমতি দিন। তাকে এই সুসংবাদটি জানাই।

তিনি স. বললেন, হাঁ। ইচ্ছে করলে জানাতে পারো। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটেছিলো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। হজরত উম্মে সালমা তাঁর প্রকোষ্ঠের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবু লুবাবা! তোমার জন্য খুশির সংবাদ আছে। তোমার তওবা কবুল করা হয়েছে। মসজিদে উপস্থিত সকল সাহাবী দৌড়ে তাঁকে মুক্ত করতে গেলেন। হজরত আবু লুবাবা বললেন, থামো। রসুলুল্লাহ্ স্বহস্তে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমি মুক্ত হবো না। ফজরের সময় রসুলেপাক স. মসজিদে যাওয়ার আগে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকের রচয়িতা বলেন, বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন নবুওয়াত' কিতাবে মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন 'ফা'তারাফূ বিজামবিহিম' (অতঃপর তারা তাদের গোনাহর কথা স্বীকার করলো) আয়াতখানি হজরত আবু লুবাবার শানে নাযিল হয়েছে। ইমাম বায়হাকী এরকম বলেছেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, হজরত আবু লুবাবার এ ঘটনা বনী কুরায়যার যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়। তবে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে আমি (গ্রন্থকার) জানতে পেরেছি হজরত আবু লুবাবা মসজিদে নববীর স্তম্ভের সঙ্গে নিজেকে বেঁধেছিলেন তবুকের যুদ্ধ থেকে পশ্চাৎপদতার কারণে। ইবনুল মুসাইয়াবও এরকম বলেছেন। উপরোক্ত আয়াতও ওই সময়ে নাযিল হয়। তবে প্রথম মতটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। তবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে যাঁরা পিছিয়ে ছিলেন, তাঁরা ছিলেন তিনজন। কোরআনুল করীমে তিনজনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে— 'ওয়া আ'লাছ ছালাছাতিল লাজীনা খুল্লিফূ'। কিন্তু দ্বিতীয় মত পোষণকারীগণ মনে করেন, ওই তিনজনের সঙ্গে হজরত আবু লুবাবাও ছিলেন। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্বের পরিজ্ঞাতা।

হজরত আবু লুবাবা নিজেকে বেঁধেছিলেন অতি আবেগের বশবর্তী হয়ে। এভাবে নিজেকে কষ্ট দেওয়া তওবার কোনো শর্ত নয়। তওবার সম্পর্ক কেবল আন্তরিক অনুশোচনা ও অনুতাপের সঙ্গে। অবশ্য সাহাবীগণের এমতো আবেগ ছিলো রসুলুল্লাহ্ স. এর সমর্থনধন্য। সুফী-মাশায়েখগণের মধ্যেও এরকম আবেগোচ্ছ্বাস পরিদৃষ্ট হয়। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা তাই প্রমাণহীন, যদিও তাঁদের বসবাস চরম বাস্তবতার উপরে।

যাহোক, বনী কুরায়যার লোকেরা অবরোধের কারণে যখন উপায়হীন হয়ে গেলো, তখন আনুগত্য স্বীকার করে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো। সাব্যস্ত হলো, তাদের বিষয়ে হজরত সাআদ ইবনে মুআয যা সিদ্ধান্ত দিবেন, তাই হবে। রসুলেপাক স. হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে নির্দেশ দিলেন, পুরুষদের হাত তাদের কাঁধের সঙ্গে বেঁধে দাও। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামকে বললেন, নারী, শিশু ও আসবাব-সামগ্রী একত্র করো। জীবনীলেখকগণ বলেন, দুর্গ থেকে উদ্ধার করা হলো এক হজার পাঁচশ' তরবারী, তিনশ' বর্ম, দু'হাজার তীর এবং এক হাজার পাঁচশ' ঢাল। মাল-আসবাব, গরু, মহিষ, বকরী

ও অন্যান্য পশু পাওয়া গেলো অসংখ্য। আউস গোত্রের লোকেরা নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! বনী কায়নুকারা ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের মিত্র। আপনি দয়া করে তাদের সাতশ' লোককে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। বনী কুরায়যা আমাদের মিত্র। তারা ওয়াদাভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। কিন্তু এখন তারা অনুতপ্ত। কাজেই তাদেরকেও আপনি দয়া করে ক্ষমা করে দিন। রসুলুল্লাহ্ কিছুই বললেন না। তারপর হজরত সাআদ ইবনে মুআয, যিনি আহত হওয়ার কারণে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাঁকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তাঁকে গাধার উপর আরোহণ করিয়ে আনা হলো। তিনি যখন বনী কুরায়যার লোকদের কাছে গেলেন, তখন আউস গোত্রের লোকেরা তাঁকে ঘিরে নিয়ে বলতে লাগলো, রসুলুল্লাহ্ বনী কুরায়যার বিষয়ে ফয়সালার ভার আপনার উপর ন্যস্ত করেছেন। আর বনী কুরায়যা তো আপনার মিত্রদের অন্যতম। এরা এখন সকলের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে আপনার দয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে তো আপনি দেখেছেনই। সে তার মিত্র বনী কায়নুকার লোকদের জন্য কতোইনা দয়াপ্রবণ হয়েছিলো। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাদেরকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলো। আউস গোত্রের লোকেরা এভাবে অনেক সুপারিশ করলো, কিন্তু হজরত সাআদ নিশ্চুপ রইলেন। তাদের অনুনয়-বিনয় যখন সীমাতিক্রম করলো, তখন কেবল বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় যারা অপরাধ করেছে, তাদের জন্য সুপারিশ করার সময় এখন নেই। তারা নিরাশ হয়ে গেলো এবং বুঝতে পারলো মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ সুনিশ্চিত। বোখারী শরীফে এসেছে, ঘটনাস্থলে হজরত সাআদের আগমনের পর রসুলে আকরম স. সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও। আউস গোত্রের লোকেরা দাঁড়িয়ে গেলো এবং হজরত সাআদকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে আনলো এবং তাঁর চলার পথে চামড়ার ফরাশ বিছিয়ে দিলো। কেউ কেউ এ ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করেন যে. সম্মানিত ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা যায়। নিয়মটি এখনও প্রচলিত, কিন্তু দলিলটি অপূর্ণ। কেননা তাঁরা দণ্ডায়মান হয়েছিলেন তাঁদের নেতাকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে আনার জন্য। আর তিনি ছিলেন আঘাতপ্রাপ্ত। তাছাড়া ছিলেন স্থূলদেহবিশিষ্ট। তাঁকে সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আর সে জন্যই রসুলে আকরম স. বলেছিলেন, 'কুমূ ইলা সায়্যিদিকুম' বোখারীতে এরকম বর্ণিত হয়েছে। 'তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও' এরকম বলা হয়নি। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার যে, 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে 'লিসায়্যিদিকুম' বর্ণনা করা হয়েছে। হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, সেই সময় সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ যদি দেওয়া হয়েই থাকে, তবে তা যথার্থ হবে। একারণে যে, তিনি তখন আগমন করেছিলেন বিচারক হিসেবে। তাঁর গমন পথে ফরাশ বিছানোর কারণও ছিলো এটাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মসজিদ বলতে এখানে কোন্ মসজিদের কথা বলা

হয়েছে? বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মসজিদ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে বনী কুরায়যা এলাকায় নামাজ পড়ার জায়গাকে, যা রসুলেপাক স. দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। বনী কুরায়যার এলাকায় অবস্থানকালে তিনি স. সেখানেই নামাজ আদায় করতেন।

হজরত সাআদ ইবনে মুআয যখন রসুলেপাক স. এর মজলিসে বসলেন, তখনই তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলো। পুনরায় আউস গোত্রের লোকেরা হজরত সাআদের সঙ্গে সবিনয় কথোপকথন শুরু করে দিলো। হজরত সাআদ বললেন, তোমরা তো এই মর্মে অঙ্গীকার করেছো যে, আমার সিদ্ধান্ত তোমরা মেনে নিবে। তারা বললো, হাঁ। আমরা এতে রাজী। জীবনীলেখকগণ বলেন, সেদিন হজরত সাআদ রসুলেপাক স. এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান বজায় রেখে পরোক্ষ সম্বোধনে তাঁর মতামত নিয়েছিলেন একথা বলে, এখানে যিনি উপস্থিত আছেন, তিনিও কি আমার সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন? রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। হজরত সাআদ বললেন, বনী কুরায়যার পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বানানো হোক বাঁদী ও গোলাম। আর তাদের মাল-আসবাব বন্টন করে দেওয়া হোক মুসলমানদের মধ্যে। রসুলে আকরম স. বললেন, হে সাআদ! তুমি ওই সিদ্ধান্ত দিলে, যা আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারণ করেছেন সপ্তম আসমানের উপর থেকে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বললেন, তুমি নির্দেশ দিয়েছো আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের অনুকুলে। আবার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তুমি ফেরেশতার (জিবরাইলের) হুকুমের মতোই হুকুম দিয়েছো। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুলে আকরম স. বললেন, হে সাআদ! তুমি এদের ব্যাপারে রায় দাও। হজরত সাআদ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের রায়ই চূড়ান্ত। রসুলে আকরম স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালার হুকুম, ফয়সালা তোমার। এরপর রসুলেপাক স. নির্দেশ দিলেন, কাঁধের উপর হাত বেঁধে এদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া হোক। সেখানেও তাদেরকে এভাবে বেঁধে রাখা হোক। জীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, মদীনায় নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে খেজুর ঢেলে দেওয়া হলো। তারা দাঁত দিয়ে উঠিয়ে খেজুর ভক্ষণ করতো। রসুলেপাক স. মদীনায় পৌঁছার পর গভীর করে গর্ত খননের নির্দেশ দিলেন। তাঁরই নির্দেশে তরবারী ধারণ করলেন হজরত আলী এবং হজরত যুবায়ের। একজন একজন করে তাদের মস্তক উড়িয়ে দেওয়া হলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরে পড়লো গর্তগুলোর অভ্যন্তরে। হুয়াই ইবনে আখতাবকে হাত বাঁধা অবস্থায় রসুলুল্লাহ্ স. এর সামনে আনা হলো। তিনি স. বললেন, এসো আল্লাহ্র দুশমন। দেখলে তো আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে আমার হাতে বন্দী করে দিয়েছেন। তোমাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন। আর আমাকে তোমার উপর করেছেন বিজয়ী। কিন্তু এহেন অবস্থায়ও সে বললো, আমি আপনার সঙ্গে দুশমনি

করার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করি না। কিন্তু একথা ঠিক যে, আল্লাহ্ যাঁকে লাঞ্ছিত করেন, সে তার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে না। আমি আমার মর্যাদাবৃদ্ধির অভিলাষী ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ আপনাকেই বিজয়ী করলেন। হুয়াই ইবনে আখতাবের একথায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে রসুলে আকরম স. এর প্রতি তার সীমাহীন বিদ্বেষ ও শত্রুতা। রসুলুল্লাহ্ স. মদীনায় হিজরত করে আসার পর থেকেই সে প্রতিদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তাঁর পবিত্র দরবারে হাজির থাকতো এবং মুনাফিকী তৎপরতা চালিয়ে যেতো। সন্ধ্যায় স্বগৃহে ফিরে গেলে তার ভাই ইয়াসের ইবনে আখতাব জিজ্ঞেস করতো, ইনিই কি ওই মহান ব্যক্তি, যাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের তওরাত কিতাবে বলা হয়েছে? সে বলতো, হাঁ। কিন্তু আমার অন্তরে তার প্রতি শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই নেই। উম্মতজননী হজরত সুফিয়া তারই কন্যা। তিনি খায়বরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। পরে রসুলে আকরম স. তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁকে বিবাহবন্ধ করেন।

জীবনীলেখকগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী তরবারী উত্তোলন করতেই হুয়াই ইবনে আখতাব তার মস্তক পেতে দিলো। তিনি সজোরে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। এরপর আনা হলো কাআব ইবনে আসাদকে। রসুলে আকরম স. বললেন, হে কাআব! ইমান গ্রহণ করো। তুমি তো ভালো করেই জানো, আমি সত্য রসুল। কাআব বললো, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনার কথাও মানি। কিন্তু আমি এখন এই ভেবে লজ্জা পাচ্ছি যে, যদি এখন ইমান গ্রহণ করি, তবে মানুষ বলবে মৃত্যুর ভয়ে আমি ইমান গ্রহণ করেছি। কাজেই আমি ইহুদী ধর্মমতের উপরই মৃত্যু বরণ করতে চাই। রসুলে আকরম স. বললেন, একেও নিয়ে যাও। সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত হজরত আলী এবং হজরত যুবায়ের বনী কুরায়যার লোকদেরকে কতল করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। রাতেও মশালের আলোয় ইহুদীনিধন চললো।

জীবনীরচয়িতাগণ বলেছেন, বনী কুরায়যার বন্দীর সংখ্যা ছিলো চারশ'। একদল বলেছেন, দু'শ'। কেউ কেউ বলেছেন, সাতশ'। আবার কেউ কেউ বলেছেন নয়শ'। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। ঐকমত্যের ভিত্তিতে উলামাকেরাম বলেছেন, হতে পারে তাদের মূল ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিলো চারশ'। বাকীরা ছিলো তাদের খাদেম, খুদ্দাম ইত্যাদি। তাদের সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হলো। কিছু কিছু বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো। আবার কাউকে কাউকে বানানো হলো গোলাম। রায়হানা বিনতে আমরকে রসুলেপাক স. নিজের জন্য গ্রহণ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে আযাদ করে দিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি নিজেই ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে চাইলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার এবং আপনার মধ্যে এই ব্যবস্থাই চলতে থাকুক। মনে হয় এটাই সহজ পন্থা। প্রকৃত তত্ত্বের পরিজ্ঞাতা কেবল আল্লাহ্ই। এখানে রয়েছে

দু'টি বিস্ময়কর ঘটনা। একটি এরকম— বনী কুরায়যার এক বৃদ্ধের নাম ছিলো যুবায়ের ইবনে বাতা। হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শামাহ'র সঙ্গে উক্ত বৃদ্ধের কোনো একটি সম্প্রীতিমূলক বিষয় ছিলো। তাই তিনি সুপারিশ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এই বৃদ্ধকে আমার কাছে দিন। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। একে নিয়ে যাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এর স্ত্রী ও সন্তানদেরকেও দয়া করে মুক্তি দিন। রসুলে আকরম স. তাঁর এই আবদারটিও মঞ্জুর করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তার ধন-সম্পদও তাকে ফিরিয়ে দিলে ভালো হয়। তিনি স. এ প্রস্তাবেও সম্মত হলেন। বৃদ্ধ যুবায়ের ইবনে বাতা জিজ্ঞেস করলো, যুবায়ের ইবনে আসাদ এখন কোথায়? বলা হলো, তারা সকলেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে। বৃদ্ধ বললো, ওই সকল সাথীদের বিচ্ছেদ আমার নিকট মৃত্যুর চেয়েও অধিকতর তিক্ত। সে হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শামাসকে লক্ষ্য করে বললো, তোমার সাথে পুর্বের সুসম্পর্কের দাবীতেই আমি তোমার কাছে আবেদন করছি, আমাকেও তাদের সাথী করে দাও। হজরত ছাবেত তরবারী উত্তোলন করলেন এবং তাকেও তাদের কাছে পৌঁছে দিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত ছাবেত তাকে বললেন, তুমিই তোমার জীবনের সমাপ্তি ঘটাও। স্বহস্তে নিজ মস্তককে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাও।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এরকম— হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, বনী কুরায়যার এক বন্দিনী তার স্বামীর শোকে উন্মাদ প্রায় হয়ে গেলো। ক্রমাগত কেঁদেই চললো। অকস্মাৎ তাকে একজন ডাক দিতেই সে হাসতে হাসতে তার সামনে গিয়ে বললো, তুমি কি আমাকে কতল করার জন্য ডেকেছো? লোকটি বললো, নারী হত্যা ইসলামের বিধান নয়। সে বললো, আমি বনী কুরায়যার এক যুবকের স্ত্রী। আমরা একে অপরকে খুব ভালোবাসি। অবরোধ কঠিন আকার ধারণ করলে আমার স্বামী আমাকে বললো, মোহাম্মদ আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে গেলে আমাদের পুরুষদেরকে কতল করে দিবেন এবং নারীদেরকে করবেন ক্রীতদাসী। আমি বললাম, হায় আক্ষেপ! আমাদের দাম্পত্যজীবন যে শেষ হতে চলেছে। আমি তো তোমাকে ছাড়া থাকতেই পারি না। সে বললো, তোমার অবস্থা যদি এরূপই হয়, তাহলে তোমার মৃত্যুর একটি উপায় আছে। ওই দ্যাখো। ওই যে লোকগুলো যুবায়ের ইবনে বারার গৃহচ্ছায়ায় বসে আছে, আটাপেষা পাথরের যাঁতা উঠিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারো। তাহলে তাদের কেউ না কেউ মারা যাবে এবং তার কেসাস স্বরূপ তোমাকে হত্যা করা হবে। সে তাই করলো। নিক্ষিপ্ত পাথরের যাঁতার আঘাত খেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন হজরত খাল্লাদ ইবনে সুওয়ায়েদ। অবশেষে এই অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখনও তার মৃত্যুর পূর্বক্ষণের হাসিখুশি চেহারা আমার চোখে ভাসে।

বনী কুরায়যার নিধনপর্ব শেষ হলো। হজরত সাআদ ইবনে মুআযের জখম থেকে পুনরায় রক্ত ঝরতে লাগলো। তিনি শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। রসুলে আকরম স. তাঁর শিয়রের কাছে বসে তাঁর মাথাটি নিজের উরুদেশের উপর তুলে নিলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! সাআদকে তুমি তোমার রহমত দ্বারা পরিবেষ্টন করে নাও। সে তোমার রসুলকে বিশ্বাস করেছে এবং ইসলামের যে দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছিলো, তা-ও যথাযথভাবে পালন করেছে। তার আত্মাকে কবজ করো তোমার প্রিয় বান্দাদের মতো করে। হজরত সাআদ চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র রসুল! আপনি সত্যধর্ম প্রচারের কাজ যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি মাথা ওঠাতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। অল্পক্ষণের মধ্যে পাড়ি জমালেন অনন্ত জীবনের দিকে। সুক্ষ্ম রেশমী পাগড়ি পরিধান করে হজরত জিবরাইল উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র হাবীব! আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। রসুলেপাক স. হজরত সাআদ ইবনে মুআযের বাড়িতে গেলেন। তাঁর কাফন ও দাফনের কাজ সম্পন্ন করলেন। তারপর বললেন, সত্তুর হাজার ফেরেশতা সাআদের জানাযায় উপস্থিত হয়েছে। হজরত সাআদ ছিলেন লম্বা এবং মোটাসোটা। কিন্তু তাঁর লাশ বহন করার খাঁটিয়াটি হয়ে গেলো খুবই হালকা। খাটিয়া বহনকারীরা বিস্মিত হলেন। রসুলেপাক স. বললেন, তার খাটিয়াতো ফেরেশতারা বহন করে নিয়ে চলেছে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কবরের চাপ থেকে কেউ যদি রক্ষা পেতো, তাহলে সাআদ ইবনে মুআযই পেতো। কিন্তু কবরের চাপ থেকে তিনিও রেহাই পাননি। পরে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কবরকে অতি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। হাদিস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ প্রকম্পিত হয়েছিলো। বোখারী ও মুসলিম। উলামা কেরাম ওই হাদিসের ভাবার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন একদল বলেছেন, এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থই ধর্তব্য। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ধর্তব্য হবে রূপকার্থ। আরশ প্রকম্পিত হয়েছিলো তাঁর আত্মার আগমনের খুশীতে। অথবা তাঁর মৃত্যুর শোকে। আল্লাহ্তায়ালা তখন আরশের মধ্যে বোধ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাই আরশে আজীম সেদিন হয়েছিলো আনন্দিত অথবা ব্যথিত। যেমন পাথর সম্বন্ধে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে—‘ওয়া ইন্না মিনহা লামা ইয়াহবিত্বু মিন খাসইয়াতিল্লাহ্’ (আবার কতক এমন যাহা আল্লাহ্র ভয়ে ধ্বসিয়া পড়ে) (২:৭৪)। হাদিসের বাহ্যিক অর্থ এরকমই হবে। এই মতটিই পছন্দনীয় মত। তাঁরা বলেছেন, বাহ্যিকভাবে আরশ প্রকম্পিত হতেই পারে। জ্ঞানগত ভাবেও তা

সুদূরপরাহত নয়। কেননা আরশও একটি জিসিম, যা হরকত (নড়াচড়া) ও সকুনত (স্থিরতা)কে কবুল করতে পারে। কেউ কেউ এর রূপক অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, প্রকম্পিত হওয়া মানে সুসংবাদ ও প্রফুল্লতা লাভ করা। বাহ্যিকভাবে প্রকম্পিত হওয়া নয়। আরবদের একটি প্রবচন এরকম— ওমুক ব্যক্তি সদাচরণে নেচে ওঠে। এর অর্থ এরূপ নয়, আসলেই ওই লোক নৃত্য করে। বরং অর্থ হবে, ওই ব্যক্তি তখন খুশি হয়, আনন্দিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত সাআদ ইবনে মুআযের ওফাতকে সম্মানিত করার জন্যই ওরকম করে বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রকম্পিত হওয়ার অর্থ জানাযা ও লাশ। একথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এর দ্বারা উল্লেখিত সুস্পষ্ট বিবরণটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। বিবরণটিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, তাঁর মৃত্যুতে আরশে এলাহী কেঁপে উঠেছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, কেঁপে উঠেছে মানে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা কেঁপে উঠেছে। হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলেপাক স. এর জন্য রেশমের রুমাল পেশ করা হলো। সাহাবীগণ ওটিকে স্পর্শ করতেন এবং তার কোমলতা অনুভব করে বিস্মিত হয়ে যেতেন। বেদুঈনরা বলতো, রসুলুল্লাহ্‌র জন্য এটা আসমান থেকে পাঠানো হয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, সাআদ ইবনে মুআযকে জান্নাতে যে রুমাল দেওয়া হবে, তা হবে এর চেয়েও উত্তম ও মোলায়েম। মোহাম্মদ ইবনে মুনফারিদের মাধ্যমে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, একবার এক ব্যক্তি সাআদ ইবনে মুআযের কবর থেকে এক মুঠো মাটি উঠিয়ে নিলেন। সে মাটি থেকে তিনি সুঘ্রাণ পেলেন মেশক আম্বরের। রসুলেপাক স. একথা শুনে 'সুবহানাল্লাহ্‌' 'সুবহানাল্লাহ্‌' বলে উঠলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলেও ফুটে উঠলো বিস্ময় ও আনন্দ। ইবনে সাআদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি ছিলাম সাআদের কবরখননকারীদের একজন। তাঁর কবর থেকে মেশকের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছিলো। বলা বাহুল্য, তিনি এই কারামত ও বুযুর্গী লাভ হয়েছিলো আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর রসুলের সন্তুষ্টি প্রাপ্তির বদৌলতে। আর এহেন বুযুর্গীর কারণেই তিনি ওই ফয়সালা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা ছিলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই ফয়সালা। সে জন্যই রসুলেপাক স. বলেছিলেন, তুমি তো ওই ফয়সালাই দিয়েছো, যা সাত আসমানের উপর থেকে এসেছে। তিনি আউস গোত্রের উপকার ও সহমর্মিতার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। বরং বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, বিশেষ অবস্থায় বনী কুরায়যাকে অপমান ও অপদস্থতার সাথে কতল করা হয়েছিলো। সেদিন তাদের এতো লোককে হত্যা করা হয়েছিলো যে, তাদের রক্ত দ্বারা গর্তগুলো ভরে গিয়েছিলো। এহেন ঘটনার মধ্যে সুক্ষ্ম কোনো কারণের অবকাশ থাকতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান হচ্ছে, সকল কাফের ওয়াজিবুল কতল। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং এরশাদ করেছেন

'উক্বতুলুল মুশরিকীনা হাইছু ওয়া জ্বাদতুমূহুম' (মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে) (৯ঃ৫)। কাফের-মুশরিকদেরকে অপমান-অপদস্থ করার মাধ্যমে ইসলামের শান-শওকত এবং মুসলমানদের সম্মান বৃদ্ধি পায়। ভীরু-কাপুরুষ লোকেরা এরকম ধারণা করতো যে, এরূপ হত্যাকাণ্ড দয়া-মমতার পরিপন্থী। তাদের এমতো ধারণা তাদের বক্রস্বভাবজাত। যেহেতু ইমান-আকীদার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র রসুল যা হুকুম করবেন, তা বাস্তবায়ন করা। আর তাঁর হুকুম প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌রই হুকুম। সুতরাং এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অনর্থক। তাই বনী নাযীরদের জন্য দেশান্তরিত হওয়ার বিধান, আর বনী কুরায়যার জন্য যদি কতলের বিধান হয়ে থাকে, তাহলে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। কেউ যদি এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে, তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যা ইচ্ছা তাই করেন। ঔচিত্য ও বাধ্যতা থেকে তিনি পবিত্র। আল্লাহ্‌তায়ালার কথা ও কাজের মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার কারোই নেই। তবে কেউ যদি এতদুভয়ের মধ্যে হেকমত অন্বেষণ করে, তবে তার কথা স্বতন্ত্র। বনী কুরায়যারা সন্ধিভঙ্গ করে আল্লাহ্ ও ইসলামের দুশমন কুরায়েশদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রসুলুল্লাহ্ স.কে উৎখাত করতে চেয়েছিলো। তদুপরি তারা হাত মিলিয়েছিলো দ্বীনের দুশমন হুয়াই ইবনে আখতাবের সঙ্গে। তাই তারা হত্যার চেয়ে আরো বড় শাস্তির উপযোগী। সুতরাং হেকমত এবং যৌক্তিকতা অনুসন্ধান করার অবকাশই বা এখানে কোথায়? এসবকিছুর প্রয়োজনই বা কী? হেকমতকে তো মহান হাকীমের কাছেই সোপর্দ করা উচিত। কেননা হকপন্থীদের মাযহাব হচ্ছে, হকতাআলার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে হবে। হেকমতের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব নয়। তিনি অভিপ্রায়ময়, যদিও তাঁর কাছে অসংখ্য হেকমত বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও তিনি যদি হেকমতের প্রতি গুরুত্ব না দেন, তবে অসুবিধার কিছুতো নেই। এরকম প্রশ্নের অবকাশই নেই যে, তিনি কেনো এরকম করলেন, বা কেনো এরকম করলেন না? 'ইয়াফআ'লুল্লাহু মা ইয়াশাউ ওয়া ইয়াহ্‌কুমু মা ইউরীদ' এর তাৎপর্য এটাই। আর এরকম আকীদা-বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

প্রকাশ থাকে যে, হজরত সাআদ ইবনে মুআয যে এরকম হুকুম দিবেন, তা রসুলেপাক স. জানতেন। আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালা যে এরকমই। তাই তিনি নিজেও হজরত সাআদের ফয়সালার প্রতি সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। হজরত সাআদের অন্তরে সঠিক এলহাম হয়েছিলো। কিন্তু এ বিষয়ে আউস গোত্রের লোকদের দৃষ্টি ছিলো সংকীর্ণ। তারা মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন সময়ে এহ্সান করেছিলো। পূর্ববর্তী ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করার প্রতিও তারা ছিলো সচেষ্ট। কিন্তু তারা সত্যকে কৌণিক দৃষ্টিতে বিচার করেছে। লৌকিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই বনী কুরায়যারা ক্ষমার ব্যাপারে আবেদন জানাতে পেরেছে। কিন্তু রসুলেপাক

স. সে আবেদনের জবাব দেননি। নিরুত্তর থেকেছেন। আউস গোত্রের লোকজন ছাড়া অন্য কোনো সাহাবী বনী কুরায়যার পক্ষে সুপারিশ পেশ করেননি। তবে পরিপূর্ণ ইমান ও খাঁটি ইসলাম হচ্ছে তাই, যা করেছিলেন হজরত আলী এবং হজরত যুবায়ের। সারা দিন ব্যাপী ও রাতের কিছু অংশ পর্যন্ত তাঁরা কাফেরদেরকে কতল করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু আউস গোত্রের কিছু লোক এ ধরনের রক্তপাতকে অপছন্দ করেছিলেন। তাঁরা অবশ্য ইমানদারই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের এমতো মনোভাব ছিলো নিতান্তই মুর্খতা। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, বনী কুরায়যার সকল লোককে হত্যা করাই যদি আল্লাহ্তায়ালার হুকুম হয়ে থাকে, তাহলে যুবায়ের ইবনে বাতাকে হজরত ছাবেত ইবনে কায়েমের আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্ষমা করা হয়েছিলো কেনো? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, যুবায়ের ইবনে বাতাকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো একারণে যে, তার বিষয়টি ছিলো ব্যতিক্রম। এভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমা করা, অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিধানও ইসলামে রয়েছে। এটা ইসলামবহির্ভুত কিছু নয়।

শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে রসুলেপাক স. এর স্বাধীনতা

বিশুদ্ধ মাযহাব এই যে, শরীয়তের বিধান প্রয়োগের দায়িত্ব রসুলেপাক স. এর উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করতে পারেন। কোনো বিষয় কারও উপর হারাম করতে পারেন। আবার সে কাজকে কারও জন্য সাব্যস্ত করতে পারেন মোবাহ বলে। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক, যা সত্যপন্থীদের কাছে অবিদিত নয়। আল্লাহ্তায়ালা সকলকে সৃষ্টি করেই তাদের জন্য একটি শরীয়ত (ধর্মীয় আইন) অপরিহার্য করে দিয়েছেন। আর সে সবকিছুকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন তাঁর হাবীব মোহাম্মদ স. এর নিকট।

মুযায়না গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

হিজরী পঞ্চম সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, হজরত বেলাল ইবনে হারেছের ইসলাম গ্রহণ। তিনি মুযায়না গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রের চারশ' লোককে নিয়ে রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হন এবং সকলে একযোগে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসুলেপাক স. তাদেরকে তাদের বস্তিতে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তোমাদেরকে মুহাজির বলে গণ্য করা হবে। এ নির্দেশ পেয়ে তারা তাদের জনপদে ফিরে যান। হজরত বেলাল ইবনে হারেছ মদীনা থেকে পাঁচ দিনের পথের দূরত্বে ফরা নামক অঞ্চলে কাজ করতেন। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি মুযায়না গোত্রের পক্ষ থেকে পতাকা বহন

করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁর পুত্র হারেছ এবং আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বোখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্য ইমামগণও বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিলো হাস্সান। তিনি বসরার একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। একশ' ষাট হিজরী সনেও তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো আশি বৎসর।

চন্দ্রগ্রহণ

হিজরী পঞ্চম সালে চন্দ্র গ্রহণ হয়। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে বলা হয়েছে, এ বৎসরই চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিলো। ওই পুস্তকে আরও বলা হয়েছে, তখন মদীনার ইহুদীরা নিজেদের বাড়িতে বাসন-কোসন বাজিয়েছিলো। বলেছিলো, আমাদের উপর জাদু করা হয়েছে। রসুলেপাক স. তখন চন্দ্রগ্রহণের নামাজ পড়েছিলেন। গ্রহণ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি নামাজে রত ছিলেন। সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো দশম হিজরীতে। যথাস্থানে তার বর্ণনা আসবে ইসশাআল্লাহ্।

দাওমাতুল জন্দলের যুদ্ধ

এ বৎসরই দাওমাতুল জন্দলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি একটি পাহাড়ের নাম। সেখান থেকে কুফা যেমন দশ মনজিল দূরত্বে, তেমনি দামেশকও। জীবনীকারগণ বলেছেন, দাওমাতুল জন্দল একটি দুর্গের নাম, যা পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিলো। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটি একটি শহরের নাম। সেখান থেকে দামেশকের দূরত্ব পাঁচ রাত। আর মদীনা শরীফ পনের বা ষোল রাত। স্থানটির নামকরণ করা হয়েছিলো রুমী ইবনে ইসমাঈলের নামানুসারে। 'কামুস' অভিধানে বলা হয়েছে, স্থানটিকে দাওমাতুল জন্দলও বলা হয়। রুমী সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

এ যুদ্ধের পটভূমি এরকম— রসুলেপাক স. এর নিকট সংবাদ পৌঁছলো, ওই এলাকায় বেশ কিছু দুষ্কৃতকারী জমা হয়েছে। তারা মুসাফিরদের পথরোধ করে এবং তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার চালায়। সেখানকার খৃস্টান শাসকের নাম ছিলো আকীদার। সে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। এ সংবাদ পেয়ে তিনি স. হজরত সেবা ইবনে আরতুফাকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। তারপর পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করলেন এবং এক হাজার সাহাবীকে নিয়ে অবাধ্যদের মূলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রাতের বেলায় রাস্তা অতিক্রম করতেন। আর দিনের বেলায় প্রচলিত পথ ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান গ্রহণ করতেন। শহরের কাছাকাছি যখন পৌঁছে

গেলেন, তখন পথপ্রদর্শক বললো, দুশমনদের চতুষ্পদ প্রাণীগুলো কাছাকাছি রয়েছে। ওগুলো ধরে আনা যায়। তাই করা হলো। তাদের পশুগুলোকে আটক করা হলো। রাখালগুলো গেলো পালিয়ে। রসুলেপাক স. দুশমনদের ময়দানে অবস্থান নিলেন। কিন্তু দুশমনরা কেউ সেখানে ছিলো না। তিনি সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন এবং চতুর্দিকে ছোটো ছোটো সৈন্যদল পাঠিয়ে দিলেন। তারা সব দিকেই ছড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথাও কাউকে পাওয়া গেলো না। অবশ্য হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা এক ব্যক্তিকে ধরতে সক্ষম হলেন। তাকে হাজির করলেন রসুলুল্লাহ্‌র সামনে। তিনি স. তার কাছে তাদের কওমের খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, এখানে মুসলিমবাহিনী আগমন করছে শুনেই অতিদ্রুত তারা পালিয়ে গিয়েছে। লোকটি ইমান আনলো। রসুলেপাক স. সহী-সালামতের সাথে গনিমতের মাল নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন। এ অভিযানে সময় লেগে ছিলো এক মাসের অধিক।

'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, এ অভিযান চলাকালে হজরত সাআদ ইবনে উবাদার মাতার ইনতেকাল হয়। রসুলেপাক স. এ অভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁর কবরে জানাযার নামাজ পড়েন। হজরত সাআদ বলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমার মাতার মৃত্যু হয়েছে আকস্মিকভাবে। আমার ধারণা, তিনি সুযোগ পেলে তাঁর কিছু সম্পদ দান করতেন। এখন আমি যদি দান করি, তাহলে তিনি কি এর সওয়াব পাবেন? রসুলেপাক স. বললেন, নিশ্চয়। তার কাছে সওয়াব অবশ্যই পৌঁছবে। হজরত সাআদ জিজ্ঞেস করলেন, কোন দান উত্তম? তিনি স. বললেন, পানি। হজরত সাআদ পানির জন্য একটি কূপ খনন করে তা তাঁর মায়ের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিলেন এবং বললেন এ কূপটি সাআদের মায়ের।

দানের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে

শারীরিক ইবাদতের সওয়াব মৃতব্যক্তির কাছে পৌঁছার ব্যাপারে উলামা কেরামের মতভেদ আছে। তবে মালের ইবাদতের বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। উলামা কেরাম বলেছেন, শায়েখ ইযদুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পর লোকেরা স্বপ্নে তাঁর কাছে প্রশ্ন করলো, আমরা মৃতদের নিকট সওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে কোরআন পড়ে থাকি। আপনি কী বলেন? আপনার কাছে কি এর সওয়াব পৌঁছে? তিনি উত্তরে বললেন, দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আমি এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতাম। এখন বুঝতে পারছি এর সওয়াব আমার কাছে আসে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সাইফুল বাহরের দিকে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্'র অভিযান

এ বৎসর জিলহজ্জ মাসে হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্'র অভিযান প্রেরিত হয়। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ'র নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে সাইফুল বাহরের দিকে প্রেরণ করেন। খাদ্যসামগ্রী হিসেবে তাদের সঙ্গে ছিলো কেবল খেজুর। এক বর্ণনায় এসেছে, এ অভিযানকালে সৈন্যরা প্রত্যেকে দিনে একটি করে খেজুর খেতেন। শেষের দিকে তাঁদেরকে অর্ধেক খেজুর খেয়ে দিন গুজরান করতে হতো। বেশ কিছু দিন এভাবেই চলেছে। অবস্থা যখন চরমে, তখন আল্লাহ্তায়ালা সাগর থেকে এক বৃহৎ মাছকে তীরে এনে দেন। তিনশ' লোক একমাস পর্যন্ত সেই মাছ আহার করেছিলেন। 'মুস্তাসকা' নামক পুস্তকে হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, মাছটি এতো বড় ছিলো যে, আমি উঠের পিঠে সওয়ার হয়ে ওই মাছের হাড়ের নীচে দিয়ে চলে যেতে পারতাম। মেশকাত শরীফে হজরত জাবের থেকেও অনুরূপ হাদিস এসেছে। তিনি বলেন, আমরা জায়শুল খাবাত নামক অভিযানে যুদ্ধরত ছিলাম। আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিলো হজরত আবু উবায়দাকে। অতঃপর আমরা ক্ষুধায় আক্রান্ত হলাম। আল্লাহ্তায়ালা সাগর থেকে এমন মৎস্য দান করলেন, যেরূপ মৎস্য আমরা আর কখনও দেখিনি।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আমরা সাগরের তীরে একটি জলজ প্রাণী পেলাম। সে প্রাণীটিকে আমরা মাছ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারলাম না। আর এক বর্ণনায় এসেছে, ওই দাববাতুল বাহার (জলজ প্রাণী)কে আম্বর বলা হয়। সেটি ছিলো একটি বিশাল মৎস্য। যার পিঠের হাড় দিয়ে ঢাল বানানো হয়। আর সে ঢালকেও আম্বর বলা হয়। দাববাতুল আম্বর প্রাণীর নাম থেকে ঢালের নাম হয়েছে আম্বর। আবার ওই নাম থেকে এক প্রকার পবিত্র খুশবুরও নামকরণ হয়েছে। 'কামুস' অভিধানে এসেছে, আম্বর হলো এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর বর্জ্য। অথবা সাগরের এমন এক ঝরণা, যার নাম মামসাকায়ে বাহরিয়া। সেখানকার মাছ— যার পিঠের হাড় দ্বারা ঢাল বানানো হয়, বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সে মাছ আহার করেছিলাম অর্ধমাস ধরে। হজরত আবু উবায়দা তার একটি হাড় সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাইয়েবী বলেছেন, সে হাড় হচ্ছে তার পাঁজরের হাড়। সে হাড়ের তলদেশ দিয়ে একজন আরোহী বিনা আয়াসে চলে যেতে পারতো। সে পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু উবায়দা ওই হাড় হাতে নিয়ে খাড়া করে রাখলেন। দেখলেন, তার নীচ দিয়ে একটি উট অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন ওই অভিযান সম্পর্কে রসুলেপাক স.কে সবকিছু খুলে বললাম, তিনি স. বললেন, এটা ওই রিযিক, যা আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং

তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। তোমরা তা খাও এবং তোমাদের কাছে যদি তার কিয়দংশ অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে তা আমাকেও খাওয়াও। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে খুশি করার জন্যই একথা বলেছিলেন এবং এভাবে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, মাছটি হালাল। অথবা তাঁর কথার উদ্দেশ্যে ছিলো এই যে, ওই রিযিক সাহাবীগণকে দেওয়া হয়েছে কারামত হিসেবে। হজরত জাবের বলেন, আমরা ওই মাছের কিছু অংশ রসুলুল্লাহ্‌কে দিয়েছিলাম। তিনি তা আহার করেছিলেন। বোখারী ও মুসলিম।

গাছের পাতা টুকরীতে তুলে ঝাড়াকে খাবাত বলা হয়। উল্লেখ্য, এ অভিযানের আর এক নাম জায়শে খাবাত। এই নামকরণের কারণ এই যে, তখন সাহাবীগণ ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাতাগুলো খসখসে ছিলো বলে তাদের মুখগহ্বরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো। ঠোঁট ফুলে গিয়ে উটের ঠোঁটের মতো হয়েছিলো। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে অবশ্য এ অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায় না। সেখানে ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের উল্লেখ করে কেবল এতোটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম স. হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে চল্লিশজন যোদ্ধাসহ প্রতিশোধ গ্রহণার্থে দৃষ্কৃতকারীদের বধ্যভূমির দিকে প্রেরণ করেছিলেন। ঘটনাটির সবিস্তার বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

মাদারেজুন্ নবুওয়াত

ISBN 984-70240-0017-0